১১শ সংখ্যা ॥ জানুয়ারি – জুন ২০২৩

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫ বছর
জুম্ম জনগোষ্ঠীর জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই।
র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা
সফল হোক
২ ডিসেম্বর ২০২২
চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫ বছর উদযাপন কমিটি, চট্টগ্রাম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫ বছর
চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে বৃহত্তর সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলি
সম্মিলিত গণমিছিল
২০ ডিসেম্বর, ২০২২, মঙ্গলবার, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা।
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪

প্রবন্ধ ০৫-৩০

জাতিসংঘের আদিবাসী ফোরামে সরকারি প্রতিনিধিদের আবারো মিথ্যাচার ● মিতুল চাকমা বিশাল ০৫

জুম্ম জাতির মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই ● বাচ্চু চাকমা ০৯

জুম্ম জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি আহ্বান ● অন্তিক চাকমা ১৪

পার্বত্য চুক্তি করে জনসংহতি সমিতি কি ভুল করেছে? ● অনুরাগ চাকমা ১৭

লামার দগ্ধ পাহাড়ে স্বপ্নের স্কুল ● পাভেল পার্থ ১৯

রাবার কোম্পানির আগুনে পুড়ে ছাই লামার ম্রো বসতি ● দীপায়ন খীসা ২১

বান্দরবানের ম্রো জনগোষ্ঠী কি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মানুষ নয়? ● ইমতিয়াজ মাহমুদ ২৪

কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার বিচারহীনতার ২৭ বছর ● শ্রীদেবী তঞ্চঙ্গ্যা ২৬

আগামীর পাহাড় হোক তরুণদের হাতে গড়া ● রিমেন তালুকদার ২৯

বিশেষ প্রতিবেদন ৩১-৬৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৭ম বৈঠক এবং চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ৩১

উন্নয়ন আগ্রাসন: পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক ৩৫

জাতিসংঘের আদিবাসী ফোরামের আহ্বানে কি সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে? ৪৩

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ ৪৫

পাহাড়ে পর্যটন: জুম্মদের উচ্ছেদ ও ভূমি বেদখলের হাতিয়ার ৫৫

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ২০২৩ সালের (জানুয়ারি-জুন) অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন ৬২

সংবাদ প্রবাহ ৬৭-৯২

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ৬৭

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা ৮১

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল ৮৬

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৮৯

সংগঠন সংবাদ ৯২

আন্তর্জাতিক সংবাদ ১১১

১১শ সংখ্যা ॥ জানুয়ারি – জুন ২০২৩

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

প্রকাশকাল:
জুলাই ২০২৩

প্রচ্ছদ ডিজাইন
শ্রী প্রমাণ

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ১০০ টাকা

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

সম্পাদকীয়

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এক বিশেষ নাজুক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সরকার একদিকে ২০১৪ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রেখেছে, অন্যদিকে একের পর এক চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারও ব্যাপক সামরিকায়ন করে দমন-পীড়নের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী কায়দায় সমাধানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

সরকার সামরিকায়নের নীতিকে বৈধতা দিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জুম্ম জনগণকে 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত', 'চাঁদাবাজ' ইত্যাদি তকমা দিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে জুম্মদের মধ্য থেকে সুবিধাবাদী, তাঁবেদার ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের দিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাদেরকে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত অধিকারকর্মী ও জনগণকে সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে অবৈধ গ্রেফতার, বিচার-বহির্ভূত হত্যা, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে আটক, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণ, ওয়ারেন্ট ছাড়া ঘরবাড়ি তল্লাশি ও ঘরবাড়ির জিনিসপত্র তছনছ, মারধর, হয়রানি ইত্যাদি ফ্যাসিবাদী কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

বস্তুত সরকারের মদদে এভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশেষ মহল একদিকে এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে লালন-পালন ও মদদ দিয়ে এলাকায় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে, অপরদিকে সন্ত্রাসী দমনের নামে জনসংহতি সমিতিসহ জুম্ম জনগণের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে এবং সন্ত্রাসী তৎপরতার দায়ভার জনসংহতি সমিতির উপর চাপিয়ে দিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগসহ জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোতে যুক্ত জুম্মদের সুবিধাবাদী, ক্ষমতালিপ্সু ও তাঁবেদার লোকদেরকে মদদ দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। অধিকন্তু সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ নামক একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনে সংগঠিত করে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম, ভূমি বেদখল, রোহিঙ্গাসহ বহিরাগত অনুপ্রবেশ ও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, সাম্প্রদায়িক হামলা ইত্যাদি তৎপরতায় লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বস্তুত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে সরকার সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্র কাজে লাগিয়ে সর্বাত্মকভাবে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের নীলনক্সা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে উন্নয়ন কার্যক্রমকেও জাতিগত নির্মূলীকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জুম্মদেরকে তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদকরণ, অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া, এলাকার জীব-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। জুম্ম জনগণের সংস্কৃতি-বিধ্বংসী ও পরিবেশ-পরিপন্থী এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, অস্থানীয়দের নিকট জুম্মদের প্রথাগত জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি ইজারা দেওয়া, জুম্মদের প্রথাগত ভূমি বেদখল করে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, জুম্মদের বাগান-বাগিচা ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করে সীমান্ত সড়ক, সংযোগ সড়ক ও রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস-তেল অনুসন্ধান ইত্যাদি অন্যতম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো দেশের এক-দশমাংশ এলাকাকে অগণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে রেখে দেশে কখনোই গণতান্ত্রিক শাসন বিকশিত হতে পারে না। সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ কখনোই গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে না, যদি পার্বত্য অধিবাসীদেরকে প্রতিনিয়ত ফ্যাসিবাদী দমন-পীড়নের মধ্যে রাখা হয়। বস্তুত পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের, দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও বিভেদ অবসানের, সর্বোপরি পার্বত্যাঞ্চলের শান্তি ও উন্নয়নের যে রাজনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক সুযোগকে ধুলিস্যাতকরণের মধ্য দিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই শুভ ফল বয়ে আনা সম্ভব হতে পারে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সময়সূচি-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা করে সরকারকে এগিয়ে আসতে জনসংহতি সমিতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলন চালিয়ে যেতে জনসংহতি সমিতি বদ্ধপরিকর। শত প্রতিকূলতা ও শাসকগোষ্ঠীর নারকীয় দমন-পীড়নের মুখেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলন থেকে জনসংহতি সমিতি কখনোই পিছপা হবে না। তাই মুক্তিপাগল বীর জুম্ম জনগণের প্রতি জনসংহতি সমিতি আহ্বান জানাচ্ছে যে, আসুন– পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হই, বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী তথা জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াই।

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

প্র • ব • ন্ধ

জাতিসংঘের আদিবাসী ফোরামে সরকারি প্রতিনিধিদের আবারো মিথ্যাচার

মিতুল চাকমা বিশাল

প্রবাদ আছে, একটি মিথ্যাকে যদি আপনি বার বার হাজার বার বলেন, তাহলে সেটিও একসময় সত্যে পরিণত হয়। জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনে অনেকটা সেটিই মনে হলো। মিথ্যাকে সত্য বানানোর এক মহাযজ্ঞ যেন সরকার শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্যতম পক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের চুক্তি সম্পর্কিত জগাখিচুরি বক্তব্য ও অপপ্রচার নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক ও ষড়যন্ত্রমূলক।

অতি সম্প্রতি গত ১৭-২৮ এপ্রিল ২০২৩ থেকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২২তম অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা বাংলাদেশের আদিবাসী, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে যে বক্তব্য প্রদান করেছে, তা আমাদেরকে হতবাক না করে পারেনি।

> চুক্তি স্বাক্ষরকারী এই আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত ৫ বছর ও তৎপরবর্তী ২০০৯ সাল থেকে টানা ১৪ বছরসহ সর্বমোট ১৯ বছর ক্ষমতায় রয়েছে এবং ২০১৪ সাল থেকে সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দেশের ক্ষমতায় রয়েছে। তথাপি এই সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ বা রোডম্যাপ ঘোষণা করতে পারেনি। এমনকি পার্বত্য চুক্তিকে এবং চুক্তি প্রণীত আইনগুলোকে সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের জন্য সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

এই অধিবেশনে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মাৎ হামিদা বেগম বলেন যে, 'বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন নং ১০৭' -কে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বাংলাদেশের ৯৯ ভাগ জনগণ বাঙালি এবং এই বাঙালিরাই বাংলাদেশের বৃহত্তম নৃ-গোষ্ঠী ও বাংলাদোশের আদিবাসী।' এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, ইংরেজি Indigenous, যার বাংলা আভিধানিক অর্থ 'দেশীয় বা স্বদেশজাত'। তবে এখানে (বাংলাদেশে) 'আদিবাসী' বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কেবল শব্দগত অর্থই মূল নয়, এখানে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি একটি রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা। 'বাঙালিরাই এদেশের আদিবাসী'-এর পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রাহমান নাসির উদ্দিন বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় রাষ্ট্র মূলত 'আদিবাসী' আর 'আদি বাসিন্দা'- এ দুয়ের মধ্যকার তফাৎ কোথায়, সেটা অনুধাবন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। আদিবাসী আর আদি বাসিন্দা যে এক নয়, এটা নিয়ে এতো কোনো সিরিয়াস রাজনৈতিক বিতর্ক আমরা এ পর্যন্ত লক্ষ্য করিনি।

এখানে মনে রাখা জরুরি যে, 'ইন্ডিজেনাস' শব্দের অর্থ আদিবাসী, যেটা একটা সাংস্কৃতিক ক্যাটাগরি আর 'আরলিয়েস্ট মাইগ্রেন্টস' অর্থ হচ্ছে 'আদি বাসিন্দা' যা একটি ডেমোগ্রাফিক ক্যাটাগরি, যা বসতিস্থাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। হাজার বছরের বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস বলে এতদঞ্চলের আদি বাসিন্দারা কোনো কালেই বাঙালি ছিলেন না। এমনকি বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাও বাঙালি ছিলেন না। তথাপি যদিও ধরেও নিই যে, আদিবাসীদের এদেশে আগমনের পূর্বেই বাঙালিদের এদেশে বসতি ছিল অর্থাৎ বাঙালিরাই এতদঞ্চলের আদি বাসিন্দা। তাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, বাঙালিরা এতদঞ্চলের আদি বাসিন্দা, কিন্তু আদিবাসী নয়।'

এছাড়াও আদিবাসীদের সংজ্ঞা নির্ধারণে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রভৃতি সংগঠন বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেসব সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে, 'তারাই আদিবাসী,

যারা রাষ্ট্রের মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে পিছিয়ে পড়া, যাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য দেশের মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক, যারা যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিকভাবে শোষিত এবং নিপীড়িত, যারা রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের চেয়ে তাদের প্রথাগত আইন, রীতি-নীতি ও পদ্ধতির উপরেই তাদের জীবনচর্চা করে, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় তারা প্রান্তিক এবং প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতায় পৌঁছে যাচ্ছে তারাই আদিবাসী।

এখানে বাঙালিরা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রান্তিক নয়, বরং তারা শাসনব্যবস্থার শাসক ও রাষ্ট্রের মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠী। বাঙালি তাদের সামাজিক ও পারিবারিক বিরোধগুলো প্রথাগত আইন দিয়ে নিরসন করে না, করে রাষ্ট্রীয় আইন দিয়ে। অতএব, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা অর্থাৎ মোসাম্মাৎ হামিদা বেগম-রা কোনোভাবেই বাংলাদেশের আদিবাসী নয়। বরং রাষ্ট্রীয় শাসন-শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালি ভিন্ন আলাদা সংস্কৃতি ও ভিন্ন অর্থনৈতিক জীবনধারার বৈচিত্র্যপূর্ণ সংখ্যালঘিষ্ট জাতি ও সম্প্রদায়রাই বাংলাদেশের আদিবাসী।

অপরদিকে বাংলাদেশ ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের আইএলও কনভেনশন নং-১০৭-এ অনুস্বাক্ষর এবং স্বীকৃতি দিলেও কার্যত এই কনভেনশনের কোনো কিছুই বাস্তবায়ন করেনি। আইএলও কনভেনশন নং-১০৭-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, 'স্বাধীন দেশের আদিবাসী এবং ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের বেলায়, যাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জাতীয় জনসমষ্টির অন্যান্য অংশের চেয়ে কম অগ্রসর এবং যাদের মর্যাদা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রথা কিংবা রীতি-নীতি অথবা বিশেষ আইন বা প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।' তাহলে কনভেনশন অনুসারে স্বভাবতই বাংলাদেশের বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলোই কম অগ্রসর, পিছিয়ে পড়া এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের উপরই বেশি নির্ভরশীল। অর্থাৎ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণ কোনোভাবেই আদিবাসী নয়।

একইসঙ্গে এই কনভেনশনের দ্বিতীয় অংশের ১১, ১২ ও ১৩ নং অনুচ্ছেদে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির উপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে এবং আদিবাসীদের পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে নিজেদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না মর্মেও উল্লেখ আছে (পার্বত্য চুক্তিতেও এরূপ আইন ও বিধান করা আছে), যা এখনো সরকার বাস্তবায়ন করেনি। যদি বিশেষ বাস্তবতায় তাদেরকে সরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে তাদের পূর্ব অধিকৃত ভূমির সমান ভালো মানের জমি প্রদান করতে হবে, যা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের উপযোগী। এছাড়া সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের যে কোনো ক্ষতি বা জখমের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মর্মে উল্লেখ হয়েছে।

একইভাবে এই কনভেনশনের ২৩নং অনুচ্ছেদে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে (পার্বত্য চুক্তিতেও এ বিষয়ে উল্লেখ আছে) এবং যদি স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর মধ্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ভাষাতে শিক্ষা প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি এই কনভেনশনের মাধ্যমে আদিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করা এবং তাদের জীবনধারাকে উন্নত করার বিধান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই যে, বাংলাদেশ সরকার আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ অনুস্বাক্ষর এবং স্বীকৃতি দিলেও কার্যত এই কনভেনশনের কোনো কিছুই তারা বাস্তবায়ন করেনি এবং সে সম্পর্কিত কোনো উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমতলে প্রতিনিয়তই পর্যটন, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প সম্প্রসারণ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তার কারণ দেখিয়ে আদিবাসীদেরকে স্ব-ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

মোসাম্মৎ হামিদা বেগম দাবি করেন, চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসীদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত। এটি মাত্র আংশিকভাবে সঠিক। কেননা সরকার ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে আদিবাসী কোটাসহ সমস্ত কোটা বাতিল করেছে। আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখনও কোটার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সচিব মহোদয় সেই বিষয়টি অনুল্লেখ রেখে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৬টি ভাষাতে বই ছাপানো হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে, সেটিও কার্যত অকার্যকর অবস্থায় পড়ে রয়েছে। উপরন্তু অবশিষ্ট ৪৪টি আদিবাসী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন বা পাঠ্য-পুস্তক ছাপানোর বিষয়টি এখনো সুদূর পরাহত অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে দেশের ৫০টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে ১৪টি ভাষা বিলুপ্তির পথে বলে চিহ্নিত করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। দেশের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ আদিবাসীদের ভাষাই রয়েছে হুমকির মুখে, বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। আদিবাসীদের ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি প্রকল্প নিয়েছে। কিন্তু জনবল, তহবিল ও পারিসম্পদের অভাবে এ প্রকল্প চলছে ধুঁকে ধুঁকে। এভাবেই আজ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এবং বাংলাভাষার আধিপত্যের শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দেশের আদিবাসীদের ভাষা।

হামিদা বেগম আরো বলেছেন যে, 'আমাদের আরো স্মল এথনিক মাইনরিটি গ্রুপ আছে, যারা আমাদের সংবিধানে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ও সুযোগ নিয়ে যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়েছে।'

হামিদা বেগমের এই বক্তব্যও সঠিক নয়। বাংলাদেশের সংবিধানে বাঙালি ভিন্ন বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির অপরাপর জাতিগোষ্ঠীগুলোকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সংবিধানের ৬(১)-তে 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে' এবং ৬(২)-তে 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া গণ্য হইবেন' মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে বসবাসকারী সকলকেই এক কলমের খোঁচাতে জাতিগতভাবে বাঙালি বানানো হয়েছে।

একইভাবে সংবিধানের ২৩(ক)-তে কেবলমাত্র উপজাতি, নৃ-গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জাতিগতভাবে তাদের ভূমি, ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের প্রথাগত অধিকার, শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, উন্নয়ন কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা, স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির অধিকারের কথা সংবিধানে উল্লেখ নেই। তাহলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে কেমন করে সমান অধিকার ও সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশের অপরাপর আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে সেকথা আমার বোধগম্যতার বাইরে।

একইভাবে, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কেও হামিদা বেগম উদ্ভট ও অগ্রহণযোগ্য বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পার্বত্য চুক্তির ৬৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে'। ১৮ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমাও একই বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। এই বক্তব্য শুনে যে কারোরই 'আক্কেল গুড়ুম' হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতোদিন সরকারের পক্ষ থেকে, এমনকি গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বলা হতো চুক্তির ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯টি ধারা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কিন্তু এই ৪ মাসের ভেতরেই রাতারাতি ১৭টি ধারা আরো বাস্তবায়ন হয়ে গেল, অথচ আমরা টেরই পেলাম না!

জনসংহতি সমিতির সমীক্ষা অনুসারে পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ ধারা, বিশেষ করে চুক্তি মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে, যার চিত্র বিভিন্ন স্বাধীন গবেষক, শিক্ষাবিদ ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণায়ও উঠে এসেছে। কাজেই এটা সরকারের প্রতিনিধি পার্বত্য সচিবের জলজ্যান্ত মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়। চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষের এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সমাধানের জন্য দুই পক্ষেরই এগিয়ে আসা দরকার। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে যাচাই ও পরীক্ষা করে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী এই আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত ৫ বছর ও তৎপরবর্তী ২০০৯ সাল থেকে টানা ১৪ বছরসহ সর্বমোট ১৯ বছর ক্ষমতায় রয়েছে এবং ২০১৪ সাল থেকে সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দেশের ক্ষমতায় রয়েছে। তথাপি এই সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ বা রোডম্যাপ ঘোষণা করতে পারেনি। এমনকি পার্বত্য চুক্তিকে এবং চুক্তির আলোকে আইনগুলোকে সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের জন্য সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য স্থায়ী অধিবাসী নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন; সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা; ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি ফেরত প্রদান; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ নিরাপত্তা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত-প্রত্যাগত শরণার্থীদের স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসন; অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত লিজ বাতিলকরণ; মুসলিম সেটেলারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসনের মতো মৌলিক বিষয়গুলো সম্পূর্ণরূপে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে। তা ছাড়াও চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য সকল আইন, বিধি ও প্রবিধান সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করার বিধান থাকলেও সরকারের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কিত কোনো উদ্যোগ আমরা দেখতে পাই না।

অপরদিকে নিখিল কুমার চাকমা বলেছেন যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে চলতি বছরে ৬০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি ১,৫৫৫টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।' কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে যে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে জুম্ম জনগণ নির্বিচারে নির্যাতিত ও অপরাধী হচ্ছে, তাতে কোনো উন্নয়নই টেকসই হতে পারে

না। আদিবাসীদের যত উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হোক না কেন, যদি আদিবাসীরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে, তাদের ভূমি হাতছাড়া হয়ে পড়ে, তাদের বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলের উৎস ধ্বংস করা হলে সেই উন্নয়ন কখনো উপকারে আসবে না। বরং চরম ক্ষতি সাধিত করবে। লামা সরই ইউনিয়নে লামা রাবার কোম্পানি কর্তৃক ম্রো ও ত্রিপুরাদের ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ও জুম ভূমিতে অগ্নিসংযোগ ও হামলা তার মধ্যে অন্যতম উদাহরণ। ম্রোদের ভূমি জবরদখল ও জীবন-জীবিকাকে বিপন্ন করে চিম্বুকে সেনাবাহিনী কর্তৃক পাঁচ তারকা হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ তার মধ্যে আরেকটি জাজ্জ্বল্য উদাহরণ।

নিখিল কুমার চাকমা পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা বাস্তবায়নের কথা বলেছিলেন, কিন্তু চুক্তিতে উন্নয়ন বোর্ড সংক্রান্ত যে ধারা রয়েছে সেই ধারা তিনি নিজেই পালন করছেন কিনা বলুক। পার্বত্য চুক্তিতে বিধান করা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু তিনি কি উন্নয়ন বোর্ডকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বোর্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন? নিঃসন্দেহে উত্তরটা হবে 'না'।

আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ন করে চলেছে এবং প্রশাসন ও উন্নয়নে জটিলতা সৃষ্টি করছে। পার্বত্য চুক্তি ও চুক্তি মোতাবেক প্রণীত আইনে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার বিধান করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যা পার্বত্য জেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী অধিকার তথা স্বশাসনের এখতিয়ারকে খর্ব করছে।

পার্বত্য সচিব বলেছেন, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসীদের উন্নয়ন কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে চলমান ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত সরকার কেবল প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে, সরকার আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করবে এবং আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে। কিন্তু এগুলো মাত্র এভাবে আন্তর্জাতিক ফোরামে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার জন্য, বাস্তবায়নের জন্য নয়। কারণ সত্যিকার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার আন্তরিকতা থাকলে আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর না করে এবং আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন না করে পড়ে থাকতো না।

পার্বত্য সচিব আরো বলেছেন, পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে দশকব্যাপী সংঘাত শেষ হয়েছে। পার্বত্য সচিবের এটাও চরম মিথ্যার বেসাতি। চুক্তি মোতাবেক অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প ও 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন প্রত্যাহারের পরিবর্তে সরকার একের পর এক ক্যাম্প স্থাপন করে চলেছে, যা সংঘাতকে আবারো নতুন করে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে ইউপিডিএফ, সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত জেএসএস (এমএন লারমা), ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগপার্টি, বমপার্টি নামে খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট প্রভৃতি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি খ্যাত সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন গঠন করে দিয়ে, আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে লিপ্ত জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাত দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

জাতিসংঘের মতো একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে সরকারের প্রতিনিধিদের এহেন বক্তব্য কার্যত বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা এবং আদিবাসীদের প্রতি সরকারের বৈরিতার মনোভাবকেই প্রমাণ করে। এসবের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কতটা আন্তরিক এবং দেশের আদিবাসীদের বিষয়ে কতটা সংবেদনশীল। সত্যি বলতে সরকারের উচিত এই পার্বত্য চুক্তি নিয়ে এবং আদিবাসীদের নিয়ে আরো দায়িত্বশীল ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের বক্তব্য পেশ করা এবং সমন্বয় করা। কিন্তু সরকার সেটি করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

অতএব, আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে পার্বত্য চুক্তি নিয়ে তথা দেশের আদিবাসীদের নিয়ে সরকার নিজেদের বিপরীত অবস্থানকে সরিয়ে আনুক। বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যমণ্ডিত বহু জাতির, বহু সংস্কৃতির দেশ। কাউকে দূরে ঠেলে দিয়ে নয়, বরং বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতির যুগ চলছে। অতএব, আমাদের প্রত্যাশা এই রাষ্ট্র তথা সরকার আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসুক। অপরদিকে দেশের এক দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামকে সংঘাতের মধ্যে রেখে দিয়ে যদি এই রাষ্ট্র বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে, সেটাও ভুল হবে। ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তিকে নিয়ে সরকারের বর্তমান অবস্থান কোনোভাবেই কাম্য নয়। এই অবস্থান সরকারের ভাবমূর্তিকে কোনোভাবেই উজ্জ্বল করবে না, বরং ক্ষুণ্ন করবে।

জুম্ম জাতির মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই

বাচ্চু চাকমা

জুম্ম তরুণদের বৈপ্লবিক রাজনীতির কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য সাধারণ আহ্বান থেকে বিশেষ আহ্বানে আমাদের চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জুম্ম সমাজ ব্যবস্থা আগের মতো সহজ-সরল ও স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আর আটকে নেই। বিশেষ করে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে বেস স্ট্রাকচার হচ্ছে অর্থনীতি। জুম্ম সমাজের মধ্যে অতীতের চাইতে তুলনামূলকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অর্থনীতির বিকাশ হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ অন্যান্য উপরি কাঠামোগুলো জুম্ম সমাজের মধ্যে বিকাশ হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে জুম্ম জনগণের হাতে হাতে এন্ড্রয়েড ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ঘরে ঘরে এসে গেছে। জীবনযাত্রার মান দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজ অত্যন্ত জটিল একটা ব্যবস্থার মধ্যে এসে গেছে। বস্তু যেহেতু গতিশীল ও পরিবর্তনশীল সেহেতু আমাদের জুম্ম সমাজও গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল হবে তা স্বাভাবিক। আমরা গতিশীল ও পরিবর্তনশীলতাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমাদের জুম্ম সমাজ দিন দিন বিকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা নৈরাশ্যবাদী নয়, আমরা আশাবাদী হতে চাই।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি, প্রতিদিন স্বপ্ন বুনে চলেছি। আমরা অবশ্যই আশাবাদী, জুম্ম সমাজ একদিন নিজের আত্মমর্যাদা ও আত্মপরিচয়ের অধিকার ফিরে পাবে। আজ যে যুব সমাজের কতিপয় ব্যক্তি সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত এবং বিশেষ করে মদ-জুয়া-হিরোইন-গাজা-ইয়াবার আসরে মত্ত রয়েছে, একদিন সে যুবরা নিজেরাই পরিবর্তিত হবে। প্রগতিমনা ও সংগ্রামী সেই যুব সমাজের হাত ধরে গড়ে উঠবে জুম্ম জাতির আন্দোলন সংগ্রাম তথা জাতি গঠনের ভবিষ্যৎ। শাসকগোষ্ঠীর নগ্ন চেহারা সেই মরণ নেশায় মত্ত থাকা প্রত্যেকটি যুবক একদিন বুঝবে এবং জানবে- সেই অনুযায়ী শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দূর্গ গড়ে তুলবে। একদিন আমাদের জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজ তাদের সমস্ত মরণ নেশা ছেড়ে দিয়ে জুম্ম জাতির সামগ্রিক মুক্তির জন্যে মানুষের মতো মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই সংগ্রামে এগিয়ে আসবে। যে যুবকটি আজ জুম্ম সমাজের পেটি বুর্জোয়া চিন্তাধারার দোদুল্যমানতার খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে আছে, সে যুবকটি একদিন বন্দী খাঁচা ভেঙে বেড়িয়ে আসবে বিপ্লবের রণাঙ্গনে।

আমরা এখনও আশাবাদী, যে পাহাড়ি যুবকটি আমার একটু সময় লাগবে বলে দোটানায় পড়ে আছে, সে যুবকটিই একদিন হবে আমাদের সংগ্রামের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। যে যুবকটিকে 'আই হেইট পলিটিক্স' এবং 'পলিটিক্স একদম খারাপ' বলে সমাজের অধিকাংশ মানুষ রাজনীতি ও সংগ্রাম বিমুখ করতে চাইছে, সে যুবকটিও একদিন বুঝবে এবং জানবে- রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া জুম্ম জাতির সামগ্রিক মুক্তি সম্ভব নয়। যে পাহাড়ি যুবকটিকে বুঝানো হয়- জুম্মরা ৩/৪ ভাগ হয়ে গেছে, পাহাড়িরা ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে বলে সংগ্রামে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে, আন্দোলন করলেও আমরা পারবো না বলে হতাশা ও নিরাশার বাণী শোনায় সেই যুবকটি একদিন নিশ্চয়ই বলবে 'সংগ্রাম ছাড়া জুম্ম জাতির মুক্তি আসবে না এবং আসতেই পারে না। জুম্ম জাতির ক্রান্তিলগ্নে সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জুম্ম জাতির বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে সামিল হতে হবে।'

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ মানুষের মতো মানুষ হয়ে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে ইচ্ছুক বিধায় অত্যাচারী যেকোনো শাসকগোষ্ঠীর হীন ষড়যন্ত্রকে ঘৃণার চোখে দেখে আসছি। এজন্য জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করা প্রয়োজন। তার জন্য বেশি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ হল এই, যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনায় নিজেকে শাণিত ও সুসজ্জিত করে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। দূর্বলের উপর সবলের অত্যাচার যুগে যুগে আমরা ইতিহাসে দেখে এসেছি। যেহেতু শাসকগোষ্ঠী আমাদের ন্যায্য অধিকার দিতে চায় না, আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, এবং এই দৈত্য দানবটি হচ্ছে উগ্র ইসলামি ধর্মান্ধ ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী এবং সম্প্রসারণবাদী, সেহেতু আমাদের জুম্ম তরুণ প্রজন্মকে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই সংগ্রামে একাট্টা হয়ে এগিয়ে যেতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমরা পাকিস্তান জমানায় ৫০ দশকের শুরুতেই পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান পরিবারের পুনর্বাসন শুরু করতে দেখেছি। তার মধ্যে সদর মহকুমার নানিয়ারচর থানা এলাকায়, লংগদু থানা এলাকায়, বান্দরবান মহকুমার

নাইক্ষ্যংছড়ি থানা এলাকায় ও লামা থানা এলাকায় উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে ষাট দশকে এই মুসলমান পরিবারের পুনর্বাসন আরও জোরদার করা হয়েছিল বলে অতীতের ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ আমাদের জুম্ম জনগণকে চিরতরে জন্মভূমি হারা করে দেওয়ার চেষ্টা করে। জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা এবং অবর্ণনীয় দুঃখ আর কষ্টের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। সেদিনগুলোর কথা মনে পড়লে শরীরের মধ্যে কম্পন এসে যায় এবং চোখ দিয়ে ঝরঝরে পানি আসে। অথচ কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ না দিয়ে অন্যত্র বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করতে পারতেন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু তা করা হয়নি, কী আশ্চর্যের বিষয় কর্ণফুলী নদীতে তার বাঁধ নির্মাণ করতেই হবে। অন্যত্র যদি বাঁধ নির্মাণ করা হত হয়তোবা তেমন লোকজন ক্ষতিগ্রস্তও হতো না। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর এটাই সত্যিকার অর্থে আমাদের বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই নয় বলে আমি মনে করি।

> শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিকরণ নীতি প্রয়োগ করে আসছে। এক সময় রাশিয়ার বুকে জার শাসনামলে অরুশীয় জাতিসমূহকে বলপূর্বক রুশীকরণের নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও অবাধে বহিরাগত মুসলমান বাঙালি অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন স্থানের জুম্ম নাম মুছে দিয়ে ইসলামি নামকরণ, মসজিদ-মাদ্রাসা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ইত্যাদি ঘটছে। ইসলামি সম্প্রসারণবাদ কায়েম করে জুম্ম জাতির নাম নিশানা মুছে দেওয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পাহাড়ের বুকে জুম্ম তরুণদের প্রতিরোধের দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে।

এরপরে আঘাত আসে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি এলাকার মর্যাদা খর্ব করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চিরতরে কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে। তখন বলা হয়েছিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম আর পৃথক শাসিত এলাকা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন হতে পাকিস্তানের অন্যান্য দশটি এলাকার মতোই শাসিত হবে। এভাবেই পাকিস্তানের জমানায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ধীরে ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যায়। মুসলমান অনুপ্রবেশ, কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ এবং পাকিস্তান আমলে সংবিধান সংশোধন এসব ত্রিমুখী ষড়যন্ত্র ছিল সবচেয়ে মারাত্মক যা তখনকার সময়ে বাধাহীনভাবে কার্যকর হয়ে যায়। সবচেয়ে দুঃখজনক হল এই, জুম্ম জাতীয় জীবনে চরম সংকট জেনেও সেই সময়ের আপোষপন্থী সামন্তবাদী নেতৃত্ব প্রতিরোধ তো দূরে থাক, প্রতিবাদ করতেও এগিয়ে আসেনি। ঘুঁণেধরা পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্তীয় সমাজের প্রাচীর ভেঙে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একমাত্র সেই সময়ের জুম্ম তরুণ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন। যার চূড়ান্ত পরিণতিতে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তাঁর গ্রেফতার ও কারাবরণ।

আত্মপরিচয়ের অধিকার না পাওয়ার বেদনা ও যন্ত্রণা থেকে জন্ম হয় মানুষের সংগ্রাম। তবে না পাওয়ার অসংখ্য বেদনা ও যন্ত্রণা মানুষকে আরও বস্তুর গভীর হতে গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। সে সমস্যার গভীরতাই মানুষকে দেখিয়ে দেয় সঠিক দিশা। পার্বত্য চট্টগ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষের বেদনা আর যন্ত্রণাকে সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শুরু করেছিলেন অসম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম। লক্ষ লক্ষ পাহাড়ি মানুষের হারানো জীবনকে ফিরে না পাওয়ার যন্ত্রণাকে নিজেই গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। অধিকারহীন মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণাকে যখন আপন করে নিয়েছিলেন তখন মানুষের ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি জানতেন, রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া জুম্ম জাতির সামগ্রিক মুক্তি সম্ভব নয়। সেজন্যে রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পাওয়ার আশা নিয়ে অসম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এগিয়ে এসেছিলেন। জুম্ম সমাজ আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে টিকে থাকবে, কি থাকবে না-এমন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। শাসকগোষ্ঠী চায় জুম্ম জনগণের বিলুপ্তি, শাসকগোষ্ঠী আমাদের জুম্ম জাতিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে চায়- বিপরীতে আমরা চাই জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই দুয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হেতু লড়াই সংগ্রাম আজ অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবিত অবস্থায় তরুণ বয়স থেকে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, এখনও সে লড়াই সংগ্রাম থেমে নেই। চলছে অবিরাম, চলছে নিরন্তর গতিতে। প্রয়াত নেতার যোগ্য উত্তরসূরী জুম্ম জনগণের জীবন্ত

কিংবদন্তী প্রিয়নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার নেতৃত্বে এখনও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলন চলছে। পরিস্থিতি ও বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে সংগ্রামের গতি বাড়ে বা কমে। নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জোয়ার-ভাটা অবশ্যই থাকে। নীতিগত দিক ঠিক রেখে কৌশলগত দিক প্রতিটি মুহূর্তে পরিবর্তন হবে। এটাই আমাদের পার্টির আন্দোলন সংগ্রামেরও অন্যতম কৌশল। সংগ্রামের ইতিহাস বলে দেয় পৃথিবীর বুকে অধিকারের জন্য যত লড়াই সংগ্রাম হয়েছে, সে লড়াইয়ের সময় সেই জাতির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল, বিভেদপন্থী ও উপদলীয় চক্রান্তকারীরা যুগে যুগে ছিল এবং বিপ্লব সফল না হওয়া পর্যন্ত আগামীতেও থাকবে।

বিশেষ করে জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি আহ্বান থাকবে, আমাদের মধ্যেকার ভুল চিন্তাধারাগুলো, যে ভুল চিন্তাধারা সংগ্রাম বিরোধী, প্রগতি বিরোধী তথা বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলো আমাদের পরিহার করতে হবে। জুম্ম জাতির একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে কি আমরা এভাবে থাকবো? নাকি সংগ্রামে সক্রিয় থেকে প্রতিকূল পরিস্থিতি ও বাস্তবতাকে অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবো। শাসকগোষ্ঠী যে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল প্রতিনিয়ত রচনা করে চলেছে, সেটা তো আমাদেরকে ভাঙ্গার উপায় খুঁজতে হবে। কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের জুম্ম তরুণদের করণীয় কী হবে? শাসকগোষ্ঠী যা করছে সেটা যদি আমরা চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে পারি তাহলে গা ভাসিয়ে থাকলেই চলবে। আমরা চুপ করে বসে থাকলে শাসকগোষ্ঠী তার আসল কার্যক্রম অবাধে চালিয়ে যেতে পারবে। আর যদি শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত অন্যায় মেনে নিতে না পারি তাহলে আপনাকে প্রতিরোধ সংগ্রামে চলে যেতে হবে। গা ভাসিয়ে চুপ করে থাকলে শাসকগোষ্ঠী তার দমন-পীড়নের স্টিমরোলার থেকে কাউকে মুক্তি দেবে না। চূড়ান্তভাবে দালাল হোক কিংবা সুবিধাবাদী হোক কাউকে শাসকগোষ্ঠী রেহাই দেবে না। এটাই ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য।

শাসকগোষ্ঠী যেহেতু গণতান্ত্রিক নয়, সেহেতু একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার দাবি করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে অধিকতর আন্দোলনে চলে যেতে হবে। তার জন্য বেশি প্রয়োজন সেই ছাত্র-যুব সমাজকে যাদের মধ্যে রয়েছে 'মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন'। যে ছাত্র-যুব সমাজ এখনও দোদুল্যমানতার মধ্যে টাল-মাটাল হয়ে পড়ে আছে, মা-বাবা ও সকল পিছুটানকে প্রাধান্য দিয়ে চলেছে, সে ছাত্র ও যুব সমাজকে অবশ্যই সংগ্রামে সামিল হতে হবে। যে চিন্তাধারাগুলো আমাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের মধ্যেকার নানা হতাশা, নিরাশা যাতে বাসা বাঁধতে না পারে তারজন্য নিজেকে সব সময় জাগ্রত রাখতে হবে। নিজেকে সঠিক চিন্তায় শাণিত করতে হবে। নিজেকে আরও অধিকতর বা উচ্চ মাপের আন্দোলনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। আমাদের দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত অধিকতর আন্দোলন থেকে আমরা বিচ্যুত হবো না।

যারা অধিকতর সংগ্রামী, ত্যাগী ও বিপ্লবী একমাত্র তারাই নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে সংকল্প ও প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে পারে। কিন্তু সামন্তশ্রেণি ও বুর্জোয়াশ্রেণি চিন্তাধারার মানুষগুলো মুখে সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করলেও বাস্তবে তারা রক্ষা করতে পারে না। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সামন্ত ও বুর্জোয়া চিন্তাধারার প্রাধান্য রয়েছে, এই চিন্তাধারাদ্বয় লালনকারী ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে মানুষের পায়ে ধরতেও যেমন বাঁধে না, তেমনি নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে মানুষের মাথায় লাথি মারতেও দেরি করে না। এধরনের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ফাঁকিবাজি, ধোকাবাজি ও বেঈমানির মানসিকতা থাকতে পারে। কিন্তু অধিকারকামী, মুক্তিকামী ও সংগ্রামী মানুষের মধ্যে তা নেই। আমাদের জুম্ম সমাজের মধ্যে যুবকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, জুম্ম ছাত্র-তরুণ অবস্থায় বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, বর্তমান বিপ্লবী নেতা সন্তু লারমা ও প্রিয় অগ্রজ যারা- তারা এক সময় জুম্ম জাতির মুক্তির আন্দোলনে ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আন্দোলনকে এমনিতেই ফেলে রাখা যায় না, নিষ্ক্রিয় করেও রাখা যায় না এবং আন্দোলন থেকে সরে যাওয়া দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিকের কখনো সঠিক কার্য নয়। ঐতিহাসিক দায়িত্ব থেকে জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজ কখনো পিছু হটতে পারে না। আমাদের আন্দোলনে নবীন আর প্রবীণের সমাবেশ হবে, নবীনদের অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের সংগ্রামে মান-অভিমানের কোনো স্থান নেই। কাজেই আন্দোলন সংগ্রামের নীতিগত দিক থেকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে থাকতে হবে। সবচেয়ে অগ্রগামী ব্যাপক জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে আন্দোলন সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখবেন, এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তার।

জুম্ম জনগণের শাসকগোষ্ঠীর সহিংস চেহারা দেখার আর তেমন বাকি নেই। শাসকগোষ্ঠীর কালাকানুন, বহিরাগত মুসলমান সেটেলার, সেনাবাহিনী, সামরিক বেসামরিক আমলাদের সশস্ত্র রূপ কিভাবে মোকাবেলা করবেন? এই প্রশ্ন থেকে যায় জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে। পদানত জীবন, শোষণ,

নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত জীবন একজন সত্যিকার মানুষ কখনো কামনা করে না। পদানত জীবন মেনে নিতে না পারার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই পদানত জীবন থেকে মুক্তির জন্য ব্যাপক জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সামগ্রিক জীবনধারা ও জুম্ম জাতির অনাগত দিনগুলো কেমন হবে-সবকিছু জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজের হাতে রয়েছে। কেননা আমাদের জুম্ম জাতীয় জীবনধারা, জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির উপর অধিকার শাসকগোষ্ঠী কখনো আমাদের ফিরিয়ে দেবে না। জন্মভূমির উপর অধিকার, নিজের আত্মপরিচয়ের অধিকার এবং সর্বোপরি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করে নিতে হবে এবং কেড়ে নিতে হবে। আজ একটু স্মরণ করুন এবং ভাবুন, হাজার হাজার জুম্ম জনগণ আন্দোলন থেকে সরে গেছে, শুধুমাত্র সরে যায়নি, দালালীপনার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। আজ তারা পেছন থেকে জুম্ম জাতিকে ছুরি মারছে। কী করবেন? তারপরও চুপ করে বসে থাকবেন, নাকি শুধুমাত্র ঘন্টা বাজিয়ে যাবেন?

শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিকরণ নীতি প্রয়োগ করে আসছে। এক সময় রাশিয়ার বুকে জার শাসনামলে অরুশীয় জাতিসমূহকে বলপূর্বক রুশীকরণের নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও অবাধে বহিরাগত মুসলমান বাঙালি অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন স্থানের জুম্ম নাম মুছে দিয়ে ইসলামি নামকরণ, মসজিদ-মাদ্রাসা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ইত্যাদি ঘটছে। ইসলামি সম্প্রসারণবাদ কায়েম করে জুম্ম জাতির নাম নিশানা মুছে দেওয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পাহাড়ের বুকে জুম্ম তরুণদের প্রতিরোধের দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে।

আমাদের অগ্রজরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে অধিকার ছিনিয়ে আনা সম্ভব। বৃহৎ শক্তির সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমাদের প্রয়োজন শুধু সাহস, মেধা, যোগ্যতা, নীতি ও কৌশল। নীতি ও আদর্শগতভাবে সুসংগঠিত কোনো জাতিকে যতই শক্তিশালী হোক না কেন পৃথিবীর কোনো শাসকগোষ্ঠীই পরাজিত করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস মানেই হলো নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে অধিকারকামী জুম্ম জনগণের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস। জুম্ম জাতির ইতিহাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছিলো পার্বত্য চট্টগ্রামের নানান প্রান্তে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি ও প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের একাকার হয়ে বেড়ে উঠা। রক্তাক্ত লাশ এবং নৃশংস গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক হামলার নীরব সাক্ষী আমাদের এই জুম পাহাড়। পাহাড়ের বর্তমান শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি আমাদের প্রতিরোধে যাওয়ার চূড়ান্ত ইঙ্গিত দিচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের দোদুল্যমান জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে নতুন করে মুক্তির সংগ্রামের জাগরণের গান শুনতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চারিদিকে আজ শ্বাসরুদ্ধকর এক পরিস্থিতি আমাদের জুম্ম জনগণের বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। সেনাশাসন ও নির্যাতন চলছে নির্বিচারে। অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের কালো থাবায় জর্জরিত পাহাড়ের অসহায় নিপীড়িত জুম্ম জনগণ। আমাদের চোখের সামনে বোনকে গণধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে, ভাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আমাদের পূর্ব পুরুষদের আবাদ করা সমস্ত জায়গা-জমি ও বসতভিটা। সেনাবাহিনী ও বহিরাগত মুসলমান সেটেলার বাঙালিদের দিয়ে শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যবসা বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অফিস-আদালত সমস্ত কিছু তাদের দখলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে নির্মম ও নিষ্ঠুর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। অন্যায়ভাবে আমাদের পাহাড়ের সাধারণ মানুষ ও সংগঠনের অধিকার কর্মীদের জেলে আটকানো হচ্ছে। বন্দী কারাগারে অমানুষিক জীবন কাটাতে হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। শাসকগোষ্ঠীর নগ্ন থাবায় পৈশাচিক অত্যাচারে আমাদের জুম্ম জনগণের জীবনগুলো আজ ক্ষতবিক্ষত ও বিলুপ্তপ্রায় আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব।

শাসকগোষ্ঠীর জেল-জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়নের ভয়ে ছাত্র ও যুব সমাজ মুখ লুকিয়ে থাকতে জানে না। পৃথিবীর দেশে-দেশে ইতিহাসের বাঁকে অসংখ্য বিপ্লবী আন্দোলনের সাক্ষী রয়েছে সমাজের অগ্রগামী তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজ। অত্যাচারী স্বৈরশাসকের পৈশাচিক নির্যাতনের ভয়কে জয় করেছিলেন বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অতীতের অসংখ্য জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজ। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি ও বাস্তবতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে চার দেওয়ালের মধ্যে আজ চুপ করে বসে থাকার সময় নেই, এখনই সময় নিজেকে এবং অন্যকে জুম্ম জাতীয় চেতনায় জাগ্রত করে অধিকতর আন্দোলনে সামিল করা। কেননা, আমরা তো পাহাড়ের অধিবাসী, পাহাড় যেমন তার সমস্ত জল বইয়ে দেয়, নিজের জন্য সে কিছুই রাখে না, আমরাও ৯৭-এর চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ঠিক তাই করেছি। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা রেখে সমস্ত অস্ত্র জমা দিয়েছি এবং নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য জঙ্গলে একটা সূঁচ পর্যন্ত ফেলে রেখে আসিনি। তারপরও সমস্ত অস্ত্র জমা দেওয়া হয়নি বলে শাসকগোষ্ঠী আমাদেরকে বারবার মিথ্যা ও

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দোষারোপ করে এসেছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তি কালো মেঘের মতো ছায়া ফেলে যতই বাধা সৃষ্টি করুক না কেন পৃথিবীর বুকে প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তি কোনোদিনই চিরস্থায়ী হতে পারেনি। সূর্যকে মেঘ কখনই চিরদিনের জন্য ঢেকে রাখতে পারে না। সূর্য তার নিজস্ব পথ ধরে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আলো ছড়িয়ে থাকে। পাহাড়ের জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজই হলো উদীয়মান সূর্যের মতো। প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তির কালো মেঘের ছায়াকে দূর করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুক চিড়ে বেড়িয়ে আসবে জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজ। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬০-৭০ দশকের জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজ মৃত্যুকে কখনো পরোয়া করেনি। দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংগ্রামে শত-শত বীরযোদ্ধা মৃত্যুর যন্ত্রণাকে আপন করে নিয়ে সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী এম এন লারমার রক্ত ব্যাপক জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে আপোষহীন ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলে। আমি আজ অতীতের ন্যায় জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে আবারও অপ্রতিরোধ্য ভূমিকায় জেগে উঠার আহ্বান জানাই।

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

জুম্ম জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি আহ্বান

অন্তিক চাকমা

বাংলাদেশের এক দশমাংশ জায়গা জুড়ে ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহের আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। স্মরণাতীতকাল থেকে এই ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহ নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে পার্বত্যঞ্চলে বসবাস করে আসছে। বলাবাহুল্য যে, বাংলাদেশের বৃহত্তর বাঙালি জাতি হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ সম্পূর্ণ আলাদা। স্বাধীন রাজার আমল হতে জুম্ম জনগণ নিজস্ব রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকারের বিশেষ সত্তা নিয়ে জুম্ম জাতির জাতীয় জীবনধারা বিকশিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই মর্ম কথা অনুধাবন করতে পেরে বাস্তবতার আলোকে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারও জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ভাগের পর পাকিস্তান শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের চিত্রটা উল্টো দিকে মোড় নেয়। সে সময় সমতল এবং পার্বত্যবাসী ব্রিটিশের একই শাসকের ধারা শাসিত হলেও শাসকগোষ্ঠীর হাতে ছিল ভিন্ন দমন-পীড়নের কৌশল। যার উৎকৃষ্ট উদাহারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ১৭৭৭-১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বারবার আমাদের উপর আক্রমণের পর আক্রমণ। বহুবার আক্রমণের পরেও সফল হতে পারেনি, বরঞ্চ ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীকে ফিরে যেতে হয়েছে। তৎকালীন চাকমা রাজা জান বকস খানের রাংগুনিয়া ভূখণ্ডের দেওয়ান রনু খান ব্রিটিশদের আক্রমণ রুখে দিতে সমর্থ হন।

ব্রিটিশ আমল পেরিয়ে পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে জুম্ম জাতিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার কৌশল গ্রহণ করে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। মানব সৃষ্ট দূর্যোগ কাপ্তাই বাঁধের কারণে ৫৪ হাজার একর ধান্য জমি পানির নিচে তলিয়ে যায় এবং প্রায় এক লক্ষাধিক জুম্ম জনগণ দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়। হতভাগা জুম্ম জাতি সেই দূর্দিনে পেয়েছিল একটি সাহসী হাতিয়ার সবেমাত্র তরুণ বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা)-কে। যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে গতিপ্রাপ্ত হয়েছিল পাহাড়ী ছাত্র সমিতি নামে একটি প্রতিবাদী রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন। সেই ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদের ধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ঘুম হারাম হয়ে যায়। যার দরুন শাসকগোষ্ঠী ভয়ে তরুণ এম এন লারমাকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ করে। তারপরও শত-হাজারো প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও জুম্ম জনগণ তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি ও কঠিন বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসতে ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে জুম্ম জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং অংশগ্রহণ ছিল আশা জাগানিয়া। যদিও সেখানে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের অন্ত ছিল না। তারপরেও জুম্ম জনগণ শত্রু বাহিনীকে

> অর্থনৈতিক মোড়কে কিংবা সামরিক উপায়ে সমাধানের কোনো পথ নেই। বরঞ্চ রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করতে হবে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও চুক্তি বাস্তবায়ন আজো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫ বছর পেরিয়ে গেলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সহজ সমাধান নিহিত রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করার কথা দূরে থাক, বাংলাদেশ সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি পর্যন্ত ঠিক করতে পারেনি। উপরন্তু বাংলাদেশ সরকার বরাবরই নানা ভিত্তিহীন ও মনগড়া যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল এবং উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

শত্রুর মতো দেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নতুন সূর্যোদয়ের আশায়। যুদ্ধে অবদানের ফলে বীর বিক্রম উপাধিও জুটেছিল পাহাড়ের জুম্ম জনগণের কৃতি সন্তানের। কিন্তু স্বাধীনতার পরে দেখা গেল এতোদিন যারা জুম্ম জনগণের মতো শাসিত ছিল তারা আজ শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ, বৃহৎ জাতির জাত্যভিমান এবং অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব এবং রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক আলাদা সত্তাকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যার পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে।

এমতাবস্থায় তরুণ বিপ্লবী এম এন লারমা জুম্ম জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি আদর্শিক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে একঝাঁক তরুণ-যুবদের সমাবেশ ঘটেছিল। সদ্য গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে যাওয়া সকল প্রকার অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ করতে থাকে। বিপ্লবী এম এন লারমার নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর নিকট ৪ (চার) দফা দাবি পেশ করা হলে তিনি নানা অজুহাতে তা নাকচ করে দেন। এক সময় রাঙ্গামাটিতে এসে এক জনসভায় জুম্ম জনগণকে বাঙালি হয়ে যেতে বলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে বাঙালি হিসেবে প্রমোশন দিয়ে বলেছেন যে, তোমরা আজ থেকে বাঙালি হয়ে যাও, উপজাতি থেকে জাতিতে প্রমোশন দিয়ে দিলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গণতান্ত্রিক পন্থায় জুম্ম জনগণের পক্ষে এর তীব্র প্রতিবাদ করে। দেশের টালমাটাল অবস্থার এক পর্যায়ে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে চলে যায়। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়লে জনসংহতি সমিতিও বিকল্প পন্থায় আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়। যেখানে শত শত ছাত্র-যুবক ঝাঁক বেঁধে আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে তীব্র আন্দোলন করতে থাকে। এমনিতরো পরিস্থিতিতে পার্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা কিছু ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র শাসকগোষ্ঠীর পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে বিপ্লবী এম এন লারমাকে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর নির্মমভাবে হত্যা করে। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের জনস্রোতের পক্ষে এগিয়ে চলা দূর্বার গণআন্দোলনকে শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। তারপরও প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদপন্থী চক্র খুব বেশি সফল হতে পারেনি। বর্তমান জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)-এর দূরদর্শী ও আদর্শিক নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি সংগঠিত হয়ে আবারও শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় ও অপশাসনের বিরুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। একটা পর্যায়ে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী নমনীয় হয়ে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, এরই মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য সমতল থেকে চার লক্ষাধিক বাঙালি এনে জুম্ম জনগণের ভূমি উপর বসতি প্রদান করা হয় এবং তাদের দিয়ে জুম্ম জনগণের উপর একের পর এক গণহত্যা সংগঠিত করতে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদুতে ১৯৮৯ সাল ৪ মে এক বিভীষিকাময় গণহত্যা সংগঠিত হয়। লংগদু গণহত্যার মধ্য দিয়ে জুম্ম ছাত্র সমাজ আরও নতুন করে সংগঠিত হয়। সেই সংগঠিত শক্তি সমাবেশ করে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ২০ মে লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথ কাঁপিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ নামে জুম্ম ছাত্র সমাজের আদর্শিক রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে জনসংহতি সমিতির গণআন্দোলন আরও অধিকতর বেগবান হয়ে উঠে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কিছু বিপদগামী ও শিশুসুলভ রাজনৈতিককর্মী শাসকগোষ্ঠীর কৌশলের কাছে হার মেনে জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ের মূলধারার আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তবে এটাও সত্য যে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সে সময়ের ক্ষুরধার নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকজন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এখনও সামনে সারিতে রয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এহেন আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সামরিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা।

অর্থনৈতিক মোড়কে কিংবা সামরিক উপায়ে সমাধানের কোনো পথ নেই। বরঞ্চ রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করতে হবে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও চুক্তি বাস্তবায়ন আজো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫ বছর পেরিয়ে গেলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সহজ সমাধান নিহিত রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করার কথা দূরে থাক,

বাংলাদেশ সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি পর্যন্ত ঠিক করতে পারেনি। উপরন্তু বাংলাদেশ সরকার বরাবরই নানা ভিত্তিহীন ও মনগড়া যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল এবং উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২২তম অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা বাংলাদেশ সরকার বাস্তবায়ন করেছে বলে যে মিথ্যাচার করেছেন তাতে বোঝা যায় সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা কতটুকু রয়েছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাধান করতে হবে। ইতিহাসের পাতা ঘেটে দেখলে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে যেকোন শাসকশ্রেণি কোনোদিন শাসিতের আপন হয়ে উঠেনি, যতক্ষণ তাকে আঘাত করে বোঝানো না যায় ততক্ষণই শোষিতের পক্ষে শাসকশ্রেণি কোনোদিনই আন্তরিক হয়ে উঠেনি। তাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হলে শাসকগোষ্ঠীকে তার অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিরোধ করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতে কোনো শাসকই তা পারবে না।

ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সেটা হলো ছাত্র-যুব সমাজ হচ্ছে যেকোন অধিকার আদায়ের আন্দোলনের অন্যতম মূলশক্তি। কারণ ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে কোনো পিছুটান থাকে না, তাদের তারুণের উদ্যোগ, সাহসিকতা, সংকল্প ও নৈতিকতার প্রশ্নে অটল থাকে। তারা কোনো বাধাকে তোয়াক্কা না করে প্রগতির পক্ষে অবিচল হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আমরা দেখি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের দেশ ভাগের সময় অনেক ছাত্র যুবক জুম্ম জাতীয় অধিকারের স্বার্থে সংগঠিত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। যদিও তাদের আন্দোলন সংগ্রাম বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের সময় বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একঝাঁক তরুণ ও ছাত্র সমাজ এগিয়ে এসে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির পতাকা তলে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করে। জনসংহতি সমিতি প্রগতিশীল জুম্ম জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিরোধ সংগ্রাম এখনও অব্যাহত রেখেছে। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের তুমুল আন্দোলন ৬০ দশকের পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সংগ্রামের গতিধারাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-যুবদের আজ নতুন করে ভাববার সময় এসেছে, শাসকগোষ্ঠীর দাসত্ব মেনে নিয়ে পরাধীন জীবন গ্রহণ করবেন নাকি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অধিকার আদায় করে অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবেন?

বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যকালাপ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো সদিচ্ছা আপাতত নেই। বরঞ্চ শাসকগোষ্ঠী চুক্তি পক্ষের কর্মীসহ সাধারণ জনগণের উপর দমন-পীড়ন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতি ও বাস্তবতায় জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ যদি ব্যক্তি স্বার্থের মোহে নিমজ্জিত হয়ে কালক্ষেপণ করেন তাহলে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের আন্দোলন যাতে বিকশিত হতে না পারে তার জন্য শাসকগোষ্ঠী ভাগ কর শাসন কর নীতি প্রয়োগসহ পুঁজিবাদী সমাজের বৈষয়িক আরাম-আয়েশে নিমজ্জিত করার জন্য ছাত্র-যুব সমাজকে বিভিন্ন প্রলোভনে প্রভাবিত করছে। তাতে কিছু অপরিণামদর্শী ব্যক্তি সেই ফাঁদে পা দিয়ে শাসকগোষ্ঠীর লালিত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে এবং জাতীয় জীবনে ক্ষতি করে চলেছে। এমন বাস্তবতায় একজন অধিকার সচেতন মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা নিয়ে চলা অনুচিত হিসেবে প্রতীয়মান হয়। নিপীড়িত-নির্যাতিত অধিকারহারা অসহায় জুম্ম জনগণের ভাগ্যাকাশে আজ কালো মেঘের ছাঁয়ায় পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ-বাতাস ঢেকে গেছে। দিশেহারা জুম্ম জাতি আজ জুম্ম তরুণ সমাজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে এমন পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বিরাজমান যা স্মরণে আসলে বুক কেঁপে উঠে। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায়ান্তর না দেখে অনেকেই যন্ত্রণায় ছটফট করে এবং নিরবে নিভৃতে চোখের জল ফেলে। কিন্তু যেখানে শত শত শিক্ষিত তরুণ ছাত্র-যুব সমাজ রয়েছে সেখানে প্রতিবাদের ভাষা অশ্রু হতে পারে না। শাসকগোষ্ঠী যে ভাষায় দমন-পীড়ন চালাবে, সেই ভাষায় উত্তর দিয়ে অন্যায়কে প্রতিহত করে, প্রতিরোধ করতে হবে। আমার হৃদয়ের গভীর থেকে আহ্বান থাকবে, আসুন জুম্ম তরুণ ছাত্র-যুব সমাজ আরেকবার গর্জে উঠি জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে, জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অধিকতর সংগ্রামে সামিল হই। জুম্ম জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে আরেকবার প্রমাণ করি ইতিহাস থেকে আমরাও বাইরে নই, জাতীয় অস্তিত্বের ক্রান্তিলগ্নে তরুণ ছাত্র-যুব সমাজ আবার জেগে উঠুক।

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

পার্বত্য চুক্তি করে জনসংহতি সমিতি কি ভুল করেছে?

অনুরাগ চাকমা

'১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সরকারের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করে সন্তু লারমা জুম্ম জনতার সঙ্গে বেইমানি করেছে। জুম্ম জনগণের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করেছে।'– এটা কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা? চুক্তির ২৫ বছর পরেও এই প্রশ্নটি জুম্ম সমাজে প্রাসঙ্গিক থেকে গেছে।

জনসংহতি সমিতি কেন শান্তি চুক্তি করল? আপনি এই প্রশ্নটি নিয়ে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ভাবতে পারেন। বিশ্বে কি শুধুমাত্র জনসংহতি সমিতি সরকারের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছে? চুক্তি করার মাধ্যমে জনগণকে প্রতারিত করেছে? আপনার- আমার পারসেপশন অনুসারে প্রতিটি শান্তি চুক্তি যদি প্রতারণার বিষয় হয়, তাহলে UCDP Peace Agreement Dataset Version 22.1 তথ্য মতে ১৯৭৫-২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দেশে দেশে ৩৭৪টি শান্তি চুক্তি কিভাবে হল? জনসংহতি সমিতি না হয় প্রতারণা করল, দালালি করল, ভুল করল, তাহলে দেশে দেশে শত-শত অধিকারকামী সংগঠন কেন একই ভুল করবে? আমার প্রশ্নটা সেখানে।

> পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন প্রত্যাশিতভাবে না হলেও সরকারের পাশাপাশি পাহাড়িদেরও একটা বিশাল অর্জন হয়েছে। সেটা হলো, শান্তি চুক্তি করার মাধ্যমে সরকার পাহাড়িদের অধিকার মেনে নিয়েছে। পাহাড়িরা দীর্ঘ দুই যুগের বেশি যে লড়াই-সংগ্রাম করেছে তা যে যৌক্তিক ছিল অন্তত তার বৈধতা মিলেছে। একথা কমবেশি আমাদের সবাইকে মানতে হবে।

গবেষণা দাবি করে, স্নায়ু যুদ্ধের পরে বিশ্বে শান্তি চুক্তি কয়েকগুণ বেড়েছে। এজন্য আপনাকে বুঝতে হবে, কেন শান্তি চুক্তি হয়? কখন সরকার এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো চুক্তি করে? এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের ডিসিপ্লিনে অনেক গবেষণা হয়েছে। এসব অনেক গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Johns Hopkins University-এর অধ্যাপক I. William Zartman-এর দেওয়া Ripeness Theory ব্যবহৃত হয়েছে। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত গোষ্ঠীগুলো এমন সময়ে চুক্তিতে উপনীত হয় যখন উভয় পক্ষ উপলব্ধি করতে পারে, এক পাক্ষিক (Unilateral means) উপায়ে/কৌশলের মাধ্যমে যুদ্ধের সন্তোষজনক কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে না। বরং, যুদ্ধ চলমান থাকলে উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেটাকে আমরা Negative-Sum Outcome বলে থাকি। উভয় পক্ষ যখন এটা বুঝতে পারে সেই সময় এবং বাস্তবতাকে আমরা 'Ripe Moment?' এবং 'Mutually Hurting Stalemate' হিসেবে অধ্যয়ন করে থাকি। অর্থাৎ, Ripe Moment-এ উভয় পক্ষ যুদ্ধ থেকে বের হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চলমান সমস্যার একটা সমাধান (Way Out/Positive-Sum Outcome) করার চেষ্টা করে। অনেকটা Prisoner Dilemma Game থেকে বের হয়ে Cooperative Game শুরু করে।

তত্ত্ব নিয়ে লেখাটা জটিল করতে চাই না। বরং, Simulation-এ গেলে বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা সবাই জানি, সরকার শান্তি চুক্তি করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পেরেছে। সরকার নানা দিকে থেকে লাভবান হয়েছে। আপাতত সরকারের লাভ-ক্ষতির হিসাবটা বাদই দিন। বরং জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সেটা নিয়ে ফোকাস করা যাক। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে শান্তি চুক্তি না হলে জুম্মরা কি লাভবান হত? লাভবান হলে কিভাবে হত? স্বায়ত্তশাসনের বেশি পেতেন? নাকি বর্তমান শান্তি চুক্তির চেয়ে বেশি রাজনৈতিক অধিকার পেতেন? অনুপ্রবেশ বা অভিবাসন থেমে থাকত? পাহাড়িদেরকে উচ্ছেদ করার কর্মযজ্ঞ বন্ধ থাকত?

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আপনার আফ্রিকায় যাওয়ার দরকার নেই। ল্যাটিন আমেরিকায় যাওয়ার দরকার নেই। দক্ষিণ এশিয়া থেকে একই ধরনের কেস স্টাডি নিতে পারেন। প্রতিবেশী ভারতে মিজোরা কী পেয়েছে? শ্রীলঙ্কায় তামিলরা কী পেয়েছে? ভারতের কাশ্মীরে জনগণ কি পেয়েছে? পাকিস্তানের বেলুচেস্তানে জনগণ কী পেয়েছে? আপনার সমস্যা তো আপনার একার না। দেশে দেশে লড়াই-সংগ্রাম চলছে। এসব কেস স্টাডি বিবেচনায় নিলে আপনার কি মনে হয়, বর্তমান শান্তি চুক্তি আপনার জন্য কম হয়েছে?

বর্তমান চুক্তিতে ভালো কিছু কি একেবারে নেই? তবে হ্যাঁ, চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং রোডম্যাপ নেই। কথা সত্য। বিশ্বে কি একমাত্র জনসংহতি সমিতি এই কাজটি করেছে? আমাদের এটা জানা দরকার। অনেক দেশের শান্তি চুক্তিতে বাস্তবায়নের সময়সীমা নেই। ক্রোয়েশিয়ার ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের এরদুত চুক্তি (Erdut Agreement) এবং ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী সরকারের সঙ্গে নেলসন ম্যান্ডেলার স্বাক্ষরিত Interim Constitution Accord-এ চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সীমা উল্লেখ নেই। Kroc Institute-এর মতে, চুক্তি সম্পাদনের দশ বছরের মধ্যে ক্রোয়েশিয়ার শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের হার ৭৩.৩৩ শতাংশ। অপরদিকে, চুক্তি সম্পাদনের দশ বছরের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের হার ৯২.০০ শতাংশ। চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সীমা উল্লেখ না থাকার পরেও এই দুটো চুক্তির অগ্রগতি কি প্রমাণ করে না, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বরং সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ?

তাই, চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং রোডম্যাপ (যেটা দিয়ে জনসংহতি সমিতিকে খোঁচা মারা হয়) থাকলে যে চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হবে, সেটা সন্দেহাতীতভাবে ভাবা অনেকটা বোকার স্বর্গে বসবাস করা। কেন বলছি জানেন? দুটো উদাহরণ দিয়ে বিষয়টার ব্যাখ্যা করি। Djibouti-তে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে শান্তি চুক্তি হয়েছিল। বাস্তবায়নের সময়সীমা উল্লেখ থাকার পরেও চুক্তি সম্পাদনের দশ বছরের মধ্যে মাত্র ৫১.৮৫ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। ফিলিপাইনের ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে Mindanao Final Agreement হয়েছে। এই চুক্তিটিতেও বাস্তবায়নের সময়সীমা উল্লেখ থাকার পরেও এই চুক্তির মাত্র ৫৯.৭২ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। এই দুটো চুক্তির বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনেকটা আমাদের পার্বত্য চুক্তির মতো বলা যেতে পারে। তাই, আমাদের পার্বত্য চুক্তিতে না হয় বাস্তবায়নের সময়সীমা উল্লেখ নেই। কিন্তু এই দুই দেশের চুক্তিতে তা উল্লেখ আছে। তাহলে কেন এই দুটো চুক্তির বাস্তবায়ন থমকে গেছে? বাস্তবায়নের সময়সীমার সঙ্গে চুক্তির অগ্রগতি হওয়ার সম্পর্ক থাকতে পারে, এটা এই দুটো উদাহরণ তা ভুল প্রমাণিত করে। তবে হ্যাঁ, চুক্তিতে বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং রোডম্যাপ থাকলে ক্ষতি হয় না। তবে, এটা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একমাত্র Explanatory Variable না।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন প্রত্যাশিতভাবে না হলেও সরকারের পাশাপাশি পাহাড়িদেরও একটা বিশাল অর্জন হয়েছে। সেটা হলো, শান্তি চুক্তি করার মাধ্যমে সরকার পাহাড়িদের অধিকার মেনে নিয়েছে। পাহাড়িরা দীর্ঘ দুই যুগের বেশি যে লড়াই-সংগ্রাম করেছে তা যে যৌক্তিক ছিল অন্তত তার বৈধতা মিলেছে। একথা কমবেশি আমাদের সবাইকে মানতে হবে।

শেষ করব এই বলে, নিজের ইতিহাসকে অস্বীকার করে কেউ নিজের ভবিষ্যতকে গড়তে পারে না। ভুলে গেলে চলবে না, ১৯৭২ সাল থেকে জুম্ম জনগণের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে লড়াই-সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, সেটার জন্ম দিয়েছে আজকের দিনের এই জনসংহতি সমিতি। তখন তো আজকের দিনের মতো অনেক সংগঠন ছিল না। মনে রাখবেন, আপনি যদি আপনার সিনিয়র নেতৃবৃন্দদের সম্মান করেন, আপনার জুনিয়ররাও আপনাকে সম্মান করবে। কারণ আপনি সেই শিক্ষা আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়েছেন। জুম্ম জনগণের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসুক। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সঠিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে সমাজে মঙ্গল আসুক- এই প্রত্যাশা রইল।

অনুরাগ চাকমা: সহকারী অধ্যাপক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিএইচডি গবেষক, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

> দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ..এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়। *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

লামার দগ্ধ পাহাড়ে স্বপ্নের স্কুল

পাভেল পার্থ

ভাওয়াল কিংবা মধুপুরের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমিরও আজ করুণ দশা। একের পর এক পাহাড়ে গড়ে উঠছে রাবার বাগান, রিসোর্ট। এসব বাগান মানছে না স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞান; ভাঙছে পাহাড়ের খাদ্যশৃঙ্খল। অসংখ্য বুনো প্রাণ নিজেদের বিচরণ অঞ্চল ও খাদ্যের জোগান হারিয়ে হয়ে উঠছে বিপন্ন। তৈরি হচ্ছে পাহাড়ে নতুন বিবাদ; দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নয়া মেরুকরণ।

'লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ' নামে একটি কোম্পানি সম্প্রতি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে ৩৫০ একর পাহাড়ি বাস্তুতন্ত্র এবং জুম জমিন। লামা উপজেলার নানা পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরে জুমের জমিন এবং পাহাড়ি বাস্তুতন্ত্র জবরদখল করে রাবার বাগান করার জন্য তৎপর নানা কোম্পানি। এমনি এক পাহাড়ের নাম ম্রো সরই হোং (সরই পাহাড়)। সরই হোংয়ের ৩৫০ একর পাহাড়ি বনাঞ্চল ও জুম জমিন দখলের পাঁয়তারা করে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি। পাহাড়ি বন, জুম ও পাড়া সুরক্ষার দাবি জানিয়ে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ মার্চ বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী মানববন্ধন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত জুমিয়া পরিবারের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ বিবৃতিও দেন। আদেশ জারি করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও। কিন্তু বান্দরবান প্রশাসন উল্লিখিত পাহাড় সুরক্ষায় এলাকাবাসীর দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি। ২৬ এপ্রিল এই কোম্পানি সরই পাহাড়ে আগুন লাগায়।

> 'লাংকম, জয়চন্দ্র ও রেংয়েনপাড়ায় ১৬ পরিবার ত্রিপুরা এবং ২৩ পরিবার ম্রো জাতিগোষ্ঠীর বাস। বিস্ময়করভাবে তিনটি পাড়ায় কোনো স্কুল নেই। স্কুলে যেতে হলে শিশুদের বহু দূর পাহাড়ি পথ ডিঙোতে হয়। পাহাড়ে কেউ স্কুল বা হাসপাতাল নিয়ে আসে না। ম্যারিয়ট আসে হোটেল কিংবা রাবার কোম্পানি আসে জুম পুড়িয়ে বাগান বানাতে।'

২৬ এপ্রিল আগুন দেওয়ার পর লাংকম ম্রো পাড়ার কারবারি লাংকম ম্রো লামা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। আসামিদের ভেতর রাবার কোম্পানির ব্যবস্থাপক মো. আরিফ হোসেন ও মাঝি মো: দেলোয়ারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ২৯ এপ্রিল এ ঘটনার নিন্দা ও বিচারের দাবিতে ২৮ নাগরিক বিবৃতি দেন। লামা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৮ মে ২০২২ ত্রাণ নিয়ে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলো ত্রাণ ফিরিয়ে দেয়। কারণ সেখানে অভিযুক্ত রাবার কোম্পানির লোক ছিল।

রাবার কোম্পানির কেবল জুমক্ষেত বা ফলের গাছ নয়; চরম ক্ষতি হয়েছে পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র ও প্রাণবৈচিত্র্যের। ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দ্য ডেইলি স্টার দগ্ধ বাসাসহ নিহত পাখির ছানা ও মৌচাকের বীভৎস ছবি প্রকাশ করে। কোম্পানির আগুনে পাখি, মৌমাছি, বিড়াল গোত্রের প্রাণী এবং ঝিরির কাঁকড়া ও মাছ মরে পানি দূষিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে সংবাদমাধ্যম। রাবার কোম্পানির পরিচালক আগুন দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, কোম্পানি কারও জুমে আগুন দেয়নি; নিজেদের জায়গা পরিষ্কার করেছে। খাদ্য ও খাদ্যের উৎস পুড়ে যাওয়ায় সহসা এক নিদারুণ খাদ্যাভাব তৈরি হয় এই পাহাড়ি গ্রামগুলোতে। যদিও পরে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে সমতল-পাহাড়ের বহু মানুষ।

রাবার কোম্পানির আগুনে কেবল তিনটি গ্রামের মানুষের জুম জমিন আর ফসলই পোড়েনি; পুড়েছে পাহাড়ের প্রাণ-প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র। অসংখ্য বুনো প্রাণ হারিয়েছে সংসার। জুমচাষ নির্ভর পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ। তিনটি পাড়ার মানুষের জুম আবাদ আর ফলদ বৃক্ষ বিবেচনায় এর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়তো হিসাব করা সহজ। হয়তো এ ঘটনায় আতঙ্কিত, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী শিশু-প্রবীণ নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ক্ষতিও কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পরিবেশগত যে ক্ষতি হলো, তা কি পূরণ করা সম্ভব? কেউ চাইলেই কি রাবার বাগানের জন্য দেশের কোনো শস্যভরা জমি ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারে?

সরই পাহাড়ে ম্রো ও ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর বসতি বহু প্রাচীন। কেবল সামাজিক সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য নয়; এখানকার জুমভূমির বিন্যাস ও জুমধানের বিশেষ বৈচিত্র্যও একই প্রমাণ হাজির

করে। রাইচা, রাইরিক, ডেংপ্লি, চেম্মা, রাইসং, স্তুই, কুয়াতুইচা, রাইস্যু এমন সব অবিস্মরণীয় জুমধানে আদি পৃথিবীর টাটকা ঝাঁজ লেগে আছে। সমতলের কৃষি যেমন বহু স্তরে বিভক্ত; জুম আবাদেও ঋতুভিত্তিক কর্মস্তর আছে। জুমচক্রের একটি পর্ব হলো 'তকওয়ামি'; মানে জুমক্ষেতের স্তূপে পরিকল্পিতভাবে আগুন ধরানো। মাটি, আর্দ্রতা, সময়, পানি, বাতাসের গতিবেগ, উচ্চতা, আশপাশে প্রাণের উপস্থিতি নানা বিষয়ে নিরীক্ষা করে তকওয়ামি পর্ব পালিত হয়। তাহলে সরই পাহাড়ে রাবার কোম্পানি জোর করে দখলের উদ্দেশ্যে প্রাণহানির জন্য যেভাবে আগুন লাগাল, তাকে ম্রো ভাষায় কী বলা যেতে পারে? জবরদস্তি করে লাগানো অগ্নিকাণ্ডকে ম্রো ভাষায় বলে 'ওয়াংতকমি'।

ম্রোদের ভেতর অভাবী মানুষকে ঙারাই বলে। একমাত্র জুমে ফসলহানি হলে কারও সাময়িক এ অবস্থা তৈরি হতে পারে। এরা কখনোই খাদ্যের জন্য কারও কাছে হাত পাতে না। অন্যদিকে ভিক্ষুকদের ম্রোরা লু লুক চি বলে। এরা খাদ্যের জন্য অন্যের কাছে হাত পাতে; নিজে কাজ করে না বা করতে পারে না। ভিক্ষুক ম্রোদের ভেতর নেই। ঋতুভিত্তিক অভাব সামলে নেওয়া, বহু টিকে থাকার কৌশল আছে ত্রিপুরা ও ম্রো সমাজে। কিন্তু রাবার কোম্পানির মতো বাইরে থেকে কেউ আগুন দিলে, দখল বা উদ্বাস্তু করলে তা সামলে নেওয়ার কারিগরি উপায় কী হতে পারে?

খাদ্যর অভাব হয়তো সাময়িক সহযোগিতায় কিছুটা কাটল কিন্তু রাবার কোম্পানির দখলিপনা থেকে কি বাঁচবে পাহাড় ও পাহাড়ের গ্রাম- এ প্রশ্নটি ফয়সালার জন্য হয়তো আমাদের বহু নথি আর প্রমাণ নিয়ে বসতে হবে। স্বীকৃতি দিতে হবে পার্বত্য শান্তিচুক্তি, পরিবেশ আইন, জীববৈচিত্র্য আইন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, বন্যপ্রাণী আইন, মানবাধিকার ঘোষণা, আইএলও সনদ, প্রাণবৈচিত্র্য সনদ, স্থানীয় সমাজের প্রথাগত কাঠামো ও আত্মপরিচয়ের দলিল। কিন্তু চলতি আলাপখানি রাবার বাণিজ্য বা এর প্রতিবেশ-রাজনীতি নিয়ে নয়।

চলতি আলাপখানি ঘটনাটির একটা ছোট্ট প্রতিবেশগত বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়ে দগ্ধ ওই পাহাড়ে একটা স্কুলের দাবি তুলছে। লাংকম, জয়চন্দ্র ও রেংয়েনপাড়ায় ১৬ পরিবার ত্রিপুরা এবং ২৩ পরিবার ম্রো জাতিগোষ্ঠীর বাস। বিস্ময়করভাবে তিনটি পাড়ায় কোনো স্কুল নেই। স্কুলে যেতে হলে শিশুদের বহু দূর পাহাড়ি পথ ডিঙোতে হয়। পাহাড়ে কেউ স্কুল বা হাসপাতাল নিয়ে আসে না। ম্যারিয়ট আসে হোটেল কিংবা রাবার কোম্পানি আসে জুম পুড়িয়ে বাগান বানাতে। চলতি আলাপখানি স্বপ্ন দেখে লামার পাহাড়ের ছোট্ট শিশুরা নিজ পাড়ার স্কুলে মাতৃভাষায় পড়বে বই। আমরা পাহাড়ে কতই না রাবার বাগান বা রিসোর্ট দেখেছি! আসুন, লামার দগ্ধ পাহাড়ে একটি স্কুলের জন্য জোরদার করি আমাদের নাগরিক সংহতি।

পাভেল পার্থ: লেখক ও গবেষক, animistbangla@gmail.com

রাবার কোম্পানির আগুনে পুড়ে ছাই লামার ম্রো বসতি

দীপায়ন খীসা

২০২৩ খ্রিষ্টীয় নববর্ষের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি পেরোতে না পোরোতেই গভীর রাতে বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের রেংয়েন ম্রো পাড়ার ম্রো বসতি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে চালানো হয় লুণ্ঠন ও ব্যাপক ভাঙচুর, তচনছ করে লণ্ডভণ্ড করা হয় ঘরবাড়ি। লামার রেংয়েন ম্রো পাড়ার বাসিন্দাদের জন্য ২০২৩ সালটি এক বিরাট ক্ষত সঙ্গে নিয়েই শুরু হলো। মধ্য রাতে ঘুমন্ত মানুষের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাঠ, তাণ্ডব চালানো এই সবই পূর্বপরিকল্পিত তাতে সন্দেহ নেই। গ্রাম প্রধান রেংয়েন কারবারি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, হামলাকারীরা আনুমানিক রাত ১টায় ট্রাকে করে গ্রামে আসে। তারা ঘর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, ভাংচুর ও লুটপাট শুরু করে। পাড়াবাসী জান বাঁচাতে কোনোমতে ঘর থেকে বের হয়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। রেংয়েন কারবারি আরও জানান লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের সন্ত্রাসীরাই এই হামলা চালিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের দোলোয়ার, মহসিন ও নুরু এই হামলার নেতৃত্ব দিয়েছে।

আমরা জানি লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ নামক প্রতিষ্ঠানটির লোকজন এর আগেও বহুবার একের পর এক এই এলাকায় সন্ত্রাসী হামলা পরিচালনা করেছে। রেংয়েন ম্রো পাড়া, জয়চন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া ও লাংকম ম্রো পাড়া এই ৩টি জুমিয়া পাড়া পাশাপাশি অবস্থিত। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল ৩টি পাড়ার জুম ভূমি, বাগান ও প্রাকৃতিক বন পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ৩ গ্রামবাসীর অভিযোগ লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের লোকজনই এই আগুন দেয়। সেই আগুনে ৪০০ একর এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বন্য প্রাণী, প্রাকৃতিক বন, পাড়াবাসীর জুম ফসল, বাগান বাগিচা সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাণ প্রতিবেশের বিপর্যয়সহ এলাকায় ব্যাপক খাদ্য সংকট দেখা দেয়।

১৩ জুলাই বুধবার সরই ইউনিয়নের ভুমি রক্ষা আন্দোলনের সংগঠক রংধজন ত্রিপুরাকে একদল সন্ত্রাসী হামলা করে। মাথায় জখমপ্রাপ্ত হয়ে রংধজন ত্রিপুরা অনেকদিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ৬ সেপ্টেম্বর রেংয়েন ম্রো পাড়ার একমাত্র পানির উৎস পাহাড়ি ঝিরিতে বিষ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এতে কাঁকড়া, চিংড়ী, বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ মরে ভেসে উঠতে থাকে। মরা প্রাণীদের পচনে পনির দূষণ বৃদ্ধি পায়। প্রায় ৭ দিনের অধিক সময় ধরে পাড়ার লোকজন ঝিরির পানি ব্যবহার করতে পারেননি। ২৪

সেপ্টেম্বর শনিবার রেংয়েন পাড়ার এক জুম চাষীর ৩০০টির অধিক কলা গাছের চারা কেটে দেওয়া হয়। এইগুলো সংঘটিত হয় ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হওয়া প্রতিটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য পাড়াবাসী দায়ী করেছেন লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজকে। সেই সকল হামলা চালানো হয়েছিল প্রকাশ্য দিবালোকে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০২৩ এর হামলার চিত্র একটু ভিন্ন। এই হামলার গতিপ্রকৃতি অন্য সব হামলাকে হার মানিয়েছে। ২০২২ এর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল জুমভূমি, প্রাকৃতিক বন, পানির উৎস, কলা বাগান এবং আন্দোলনের সংগঠক। কিন্তু ২০২৩ এর ১ জানুয়ারির মধ্য রাত পেরোনোর পর যে হামলা সেটা সরাসরি বসতভিটা আক্রমণ, ঘরবাড়ি পোড়ানো, লুটপাট চালানো ও ভাঙচুর করা। সুতরাং আমরা বলতেই পারি হামলার ধরণ পরিবর্তন হয়েছে। সন্ত্রাসের ব্যাপকতা বেড়েছে। যাদের বিরুদ্ধে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো এবং অগ্নিসংযোগ করার অভিযোগ সেই লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ খুবই প্রতাপশালী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুর্দান্ত প্রতাপ ও দাপট দেখিয়ে তারা নিত্য নতুন কায়দায় অপরাধ সংঘটন করেই চলেছে। কিন্তু লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কারা? কিইবা তাদের পরিচয়।

এই হামলার গতিপ্রকৃতি অন্য সব হামলাকে হার মানিয়েছে। ২০২২ এর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল জুমভূমি, প্রাকৃতিক বন, পানির উৎস, কলা বাগান এবং আন্দোলনের সংগঠক। কিন্তু ২০২৩ এর ১ জানুয়ারির মধ্য রাত পেরোনোর পর যে হামলা সেটা সরাসরি বসতভিটা আক্রমণ, ঘরবাড়ি পোড়ানো, লুটপাট চালানো ও ভাঙচুর করা। সুতরাং আমরা বলতেই পারি হামলার ধরণ পরিবর্তন হয়েছে। সন্ত্রাসের ব্যাপকতা বেড়েছে। যাদের বিরুদ্ধে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো এবং অগ্নিসংযোগ করার অভিযোগ সেই লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ খুবই প্রতাপশালী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুর্দান্ত প্রতাপ ও দাপট দেখিয়ে তারা নিত্য নতুন কায়দায় অপরাধ সংঘটন করেই চলেছে। কিন্তু লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কারা? কিইবা তাদের পরিচয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে ১৯৯২-৯৩ এর দিকে লামার সরই এলাকায় রাবার সৃজন করার জন্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে জুম ভূমি ও ছোট ছোট টিলা সরকার কর্তৃক লিজ প্রদান করা হয়। লিজ পাওয়া ৫০ জনের অধিক ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে এই লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি গঠন করে। যারা ঐ জুমভুমি লিজ পেয়েছিলেন তারা আবার অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক পদস্থ আমলা। যারা একসময় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন শীর্ষ প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। লিজ গ্রহীতাদের তালিকায় এই আমলাদের আত্মীয়-স্বজনরাও রয়েছেন। পাহাড়ে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনার যে প্রথাগত আইন সেই নিয়মনীতিকে তোয়াক্কা না করেই লিজগুলো প্রদান করা হয়। ফলে লিজের শুরু থেকেই পাহাড়ের ভূমিজ সন্তানদের সঙ্গে লিজ গ্রহীতাদের ভুমি বিরোধ লেগেই ছিল। লিজ গ্রহীতারা সিংহভাগই সামরিক-বেসামরিক পদস্থ আমলা এবং তাদের আত্মীয় স্বজন হওয়ার কারণে অতিদ্রুত তারা লীজের বাইরে গিয়ে ভূমি জবরদখলও শুরু করে। অন্যদিকে প্রান্তিক জুম্ম জনগণ মালিকানা হারাতে থাকে। নিজ ভূমি ও বসত থেকে ক্ষেত্র বিশেষে উচ্ছেদ হয়ে যায়। লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডও সেইসব ঘটনারই ধারাবহিকতা মাত্র।

লামার সরই ইউনিয়নের রেংয়েন ম্রো পাড়ায় সর্বশেষ যে হামলা হয়েছে তার ভয়াবহতা ও মানবিক বিপর্যয় আমরা সংবাদমাধ্যমে কয়েকদিন ধরে পরিলক্ষিত করছি। পাহাড়ের এই তীব্র শীতে ঘর পুড়ে যাওয়া লোকজন খোলা আকাশের নীচে দিনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। রাতের ঠান্ডা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রাতভর আগুন পোহানোর ছবিও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আক্রান্ত এই পরিবারগুলোর শিশু সন্তান ও বয়স্কদের অবস্থা নিশ্চয় আরও অধিক করুন। স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন চক্রেও পাহাড়ের এই অভাবী মানুষগুলোর শীত নিবারণ করা বেশ কঠিনতম বিষয়। আর এখন আগুনে বসতবাড়িহীন খোলা আকাশে শীত যে কিভাবে তাদের উপর ভর করেছে সেটা অনুমান করলেই গা শিউরে উঠতে শুরু করে। ঘটনার ৩ দিন অতিবাহিত হলেও সরকারি প্রশাসনের কোনোপ্রকার সহায়তা সেখানে পৌঁছানো হয়নি। আগুনে পুড়ে যাওয়া সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলোতে খাদ্যাভাবও চলছে। পাড়া পড়শীদের সহায়তায় কোনোমতে দুমুঠো ভাত যোগাড় হচ্ছে। কিন্তু সেই পড়শীরা তো নিজেরাই অভাবী এবং দিনমজুর। আমরা আরও গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা যারা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এখনও মামলাই হয়নি। গ্রেফতার হওয়া সেতো বহু পরের ব্যাপার।

মূলত এই কারণেই লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি দিন দিন সাহসী ও বেপোরোয়া হয়ে উঠছে। আমরা এও জানি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিলের ঘটনার পর বান্দরবান জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কিছু নির্দেশনা দিয়েছিল। লামার সরই ইউনিয়নের ৩ জুমিয়া গ্রামবাসীকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য মানবধিকার কমিশনের সেই নির্দেশনা বার বার লংঘিত হয়েছে। দুঃখজনক হলেও আসল সত্য হচ্ছে ৩ জুমিয়া পাড়ার মানুষের পাশে প্রশাসন নেই। স্থানীয় প্রশাসন সরই ইউনিয়নের ৩ জুমিয়া পাড়াবাসীর সুরক্ষা দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। বরং উল্টো চিত্রই দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও উপজেলা প্রশানের সঙ্গে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির ব্যাপক দহরম মহরম সম্পর্কের খবর আমরা পাচ্ছি।

সর্বশেষ অগ্নিসংযোগ ও লুটপটের ঘটনার দু একদিন আগে লামার থানার দায়িত্বরত পুলিশ প্রশাসনের লোকজন পাড়াবাসীকে ধমক দেওয়ার কথাও আমরা শুনেছি। ঐ রাবার কোম্পানির সংশ্লিষ্টদের সথে লামা প্রশাসনের কর্তাদের নিয়মিত যাতায়াতের বিষয়টিও নাকি 'ওপেন সিক্রেট'। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের এহেন গর্হিত কার্যকলাপ অপরাধীচক্রকেই উৎসাহিত করে। তার বাস্তব প্রতিফলন আমরা লামার সরই ইউনিয়নে প্রত্যক্ষ করছি। ২৬ এপ্রিলের ঘটনার পর পরই বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ একটা তদন্ত দল প্রেরণ করে। জেলা পরিষদের সেই তদন্ত প্রতিবেদনে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির বিরুদ্ধে সরকার প্রদত্ত লীজের শর্তাবলি লংঘনের অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু কি এক অদৃশ্য ক্ষমতার উৎসের কারণে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির লিজ এখনও বহাল তবয়িতেই রয়ে গেছে। সেই ক্ষমতার উৎসের সন্ধান করাটাও জরুরি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি এই সকল সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক যে আইন বলবৎ করা হয়েছে। সেই আইন আনুযায়ী লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের লিজ কার্যত অবৈধ। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর পেরিয়ে গেলেও এই চুক্তির সিংহভাগ অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। তাই লামা রাবার কোম্পানির লিজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত আইনে বাতিলযোগ্য হলেও বাতিল হয়নি। লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির লিজ এখনও টিকে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সুস্পষ্ট লংঘন।

আমাদের প্রত্যাশা সরকার অচিরেই লামা রাবার কোম্পানির অবৈধ লিজ বাতিল করবে। লামার সরই ইউনিয়নের রেংয়েন ম্রো পাড়ায় যে অমানবিক ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সেই লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সময়ের জোর দাবি। আক্রান্ত ও ভুক্তভোগী জুমিয়া পরিবারগুলো অভুক্ত অনাহারে খোলা আকাশের নীচে বিনীদ্র শীতার্ত রাত পার করছে। এই অমানবিক দৃশ্যের অবসান করা হোক অতীব জরুরি ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। সরকারি সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষসমূহ লামার সরই ইউনিয়নের জুমিয়া পরিবারগুলোর সুরক্ষায় এগিয়ে আসুক।

দীপায়ন খীসা: তথ্য ও প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বান্দরবানের ম্রো জনগোষ্ঠী কি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মানুষ নয়?

ইমতিয়াজ মাহমুদ

(১)

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার তিনটি গ্রাম– লাংকম ম্রো পাড়া, জয়চন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া, রেংয়ান ম্রো পাড়া। এই তিনটি গ্রামের মানুষের জুমের ফলন্ত ফসল আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আপনারা খবরের কাগজে দেখেছেন, সেখানে রাবার চাষ করবে বলে একটি কোম্পানি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে পাহাড়ের বন। সঙ্গে পুড়েছে পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষের চাষের ফলন, ওদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। তিনটি গ্রামের চল্লিশটি পরিবারের এখন না আছে খাবার মতো শস্য, না আছে পানীয় জল। আর ওদের হাতে এমন কোনো টাকা পয়সা নেই যে ওরা কিনে খাবে। এখন এই পরিবারগুলি সামান্য কিছু লতাপাতা সিদ্ধ করে প্রাণ ধারণ করছে।

আমরা তো সবাই মোটাদাগে নিয়মিতই বলি যে প্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষা করতে হবে। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাস লিখেছেন বিরষা মুন্ডা বা বিরসা ভগবানকে নিয়ে। সেই উপন্যাস পড়ে অনেক তরুণকে আমি অরণ্যের অধিকার নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। অনেককে আবার মায়াভরা কণ্ঠে 'আহা পাহাড়ের লোকজন কতো ভালো' এইরকম করে মিষ্টি সহানুভূতিও শুনেছি। এইগুলি কথার যে মূল্য নাই সেকথা বলি না। কিন্তু পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের ভূমির অধিকার সেটা আপনাদের সহানুভূতি-নিরপেক্ষ একটা অধিকার। সেইটা যদি আপনারা একটু বুঝতে চেষ্টা করতেন তাহলে পাহাড়ি আদিবাসী মানুষের উপর চলমান নির্যাতন অনেকখানিই কমে যেতো।

পাহাড়ের মানুষ ওদের ভূমির ব্যবহার আর আমাদের সমতলের মানুষের ভূমির ব্যবহার এই দুইটার ধরন ঐতিহাসিকভাবে ভিন্ন ধরনের। সমতলের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরনও ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের এই অঞ্চল যখন চূড়ান্তভাবে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে চলে গেলো- আজকের বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভারত, পাকিস্তান সবাই- তখন ঔপনিবেশিক শাসকরাও ঠিকই উপলব্ধি করেছিল এই ভিন্নতা। ফলে ওরাও আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলির জন্যে সমতলের আইনের বাইরে ভিন্ন এক সেট বিধান তৈরি করলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন নামে সেইসব বিধান এখনো কার্যকর আছে। এইসব বিধান আর সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরণের ভিন্নতা সব কিছু মিলিয়ে পাহাড়ের ভূমি ব্যবস্থা আর ঢাকা দিনাজপুর বা ফরিদপুরের ভূমি ব্যবস্থাপনা কখনোই একরকম ছিল না। সুতরাং পাহাড়ে আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের প্রশ্নটি আপনি যদি সমতলের সঙ্গে একরকম করে মিলিয়ে দেখেন তাইলে সেখানে অন্যায়ই হয়।

(২)

সারা দুনিয়াতেই আদিবাসী মানুষের ভূমির অধিকার নিয়ে এই সংগ্রামটা চলে আসছে। এখন আদিবাসী বললেই একদল লোক আঁতকে ওঠেন, ওদের জন্যে বলি। আদিবাসী কথাটার মানে হচ্ছে সেইসব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যাদের সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং ভূমি ব্যবহার ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরণ সংখ্যাগুরুর চেয়ে ভিন্ন এবং ওরা সেটা বজায় রাখতে চায়। পৃথিবীর নানা দেশে এইরকম জনগোষ্ঠীর অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে, আমরা চাই যে বাংলাদেশেও এই অধিকার স্বীকৃতি লাভ করুক। কেননা এটা একটা ন্যায্য অধিকার। আমাদের এখানে ম্রো জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী একেকটা কমিউনিটি হিসাবে ভূমির ব্যবহার করে আসছে বহুযুগ আগে থেকে। ওদের এই অধিকার থেকে ওদেরকে চট করে বঞ্চিত করা তো ন্যায় নয়।

বান্দরবানের পাহাড়গুলি যে রাবার চাষের জন্যে বরাদ্দ দিয়ে দেয়, আর যেভাবে এইসব বরাদ্দ হয় এটা তো ঠিক না। সংখ্যায় কম হলেও এইসব জনগোষ্ঠীর মানুষদের তো অধিকার আছে নিজেদের মতো করে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। সেই অধিকারের ব্যত্যয় হয় এমন কোনো সিদ্ধান্ত একান্ত যদি নিতেই হয় সেটা তো ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সঙ্গে আলাপ করে, ওদের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা করে, যাতে পরিবেশ ও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধরন নষ্ট না হয় সেগুলি নিশ্চিত করেও নেওয়া যায়। একটা দুইটা বাণিজ্যিক কোম্পানির লাভের জন্যে এইরকম একেকটা রাজনৈতিক ও নীতিগত সিদ্ধান্ত কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা মিলে নিয়ে ফেলবেন সেটার ফল তো ভালো হতে পারে না।

লামা উপজেলায় দেখেন এখন কি অবস্থা হয়েছে। ঐ তিনটা গ্রামের মানুষের জীবন ধারণের উপায় কেড়ে নিলেন আপনারা।

ফলাফল হচ্ছে যে এখন এই গ্রামগুলির মানুষেরা ক্ষুধার্ত দিন কাটাচ্ছে। আমার বন্ধু দীপায়ন খীসা, রুপম চাকমা এবং আরও অনেকে এইসব ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে চেষ্টা করছেন। সেটা একটা জরুরি কাজ। আপাতত ওদের জন্যে খাবার পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা তো জরুরি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও কি আমাদের চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, কেন আমরা এইসব মানুষকে এইরকম বিপন্ন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছি কিছুদিন পর পর? এই রাষ্ট্র কি ওদের নয়? বান্দরবানের ম্রো জনগোষ্ঠী কি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মানুষ নয়? সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদ কি ওদের জন্যে প্রযোজ্য নয়?

(৩)

আমি জানি আদিবাসী শব্দটা শুনলেই অনেকে রেগে যান। কেউ কেউ বলেন যে, সংবিধানে তো আদিবাসী কথাটা নাই। ঠিক আছে, সংবিধানে আদিবাসী কথাটা নাই। কিন্তু সংবিধানে কি বেঁচে থাকার অধিকার সংরক্ষিত নয়? সংবিধানে কি পেশা ও বৃত্তির অধিকার সংরক্ষিত নাই? সংবিধানে কি সম্পদের মালিকানার অধিকার সংরক্ষিত নাই? সংবিধান কি রাষ্ট্রের উপর মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এইসব নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে আরোপ করা হয়নি? সংবিধানের একটা বিশেষ্য সর্বনাম বা বিশেষণ ব্যত্যয় হলে রেগে ওঠেন, তাঁর আগে যে জীবন ধারণের অধিকার রাষ্ট্রের দায়িত্ব এইসব গুরুগম্ভীর অন্যান্য পদ আছে সেগুলি আগে নিশ্চিত করতে হবে না?

আমরা সংখ্যাগুরু হয়েছি বলে এইসব জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের উপায়টুকুও কেড়ে নিব? এইটা কি রকম কথা? আরে অন্যসব কথা বাদ দেন- বাদ দেন আদিবাসী অধিকার বা ঐসব নানা কথা। কিছু লোক একটা পাহাড়ে বাস করে আর সেই পাহাড় ও অরণ্য থেকে ওদের জীবন ধারণ হয়। সেই লোকগুলির জীবন ধারণের ব্যবস্থা না করে আপনি অরণ্যে আগুন লাগিয়ে দিতে অনুমতি দিচ্ছেন বাণিজ্যিক কোম্পানিকে কেবল মুনাফার জন্যে? এটা কি ন্যায় হচ্ছে?

এই অধীন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মত প্রকাশ করছে- এটা অন্যায় হয়েছে। অন্যায় হয়েছে। অন্যায় হয়েছে। এই অন্যায়ের প্রতিকার দাবি করি। দাবি করি সকলের কাছে।

ইমতিয়াজ মাহমুদ: আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্ট। তাঁর ফেসবুক ওয়াল থেকে লেখাটি সংগৃহীত।

> আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার বিচারহীনতার ২৭ বছর

শ্রীদেবী তঞ্চঙ্গ্যা

১২ জুন ২০২৩ কল্পনা চাকমা অপহরণের ২৭ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে দিবাগত রাতে নিজ বাড়ি থেকে অত্যন্ত নির্মমভাবে তাকে অপহরণ করা হয়। কল্পনা চাকমা ছিলেন পাহাড়ের ছাত্রী সমাজের অন্যতম লড়াকু সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। কল্পনা চাকমার বাড়ি রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউ লাল্যাঘোনায়। গ্রামের পার্শ্ববর্তী তথাকথিত নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কজইছড়ি সেনাক্যাম্প। তারা নানা অজুহাতে জুম্ম জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় নিপীড়নের স্টিম রোলার। এ সমস্ত নির্যাতন, নিপীড়নের প্রতিবাদ করতেন কল্পনা চাকমা। তাই কল্পনা চাকমার প্রতিবাদী কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুন দিবাগত রাতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে পার্শ্ববর্তী কজইছড়ি সেনাক্যাম্পের কম্যান্ডার লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে একদল ভিডিপি ও সেনা সদস্য কর্তৃক অপহরণ করা হয়। এ সময় অপহরণকারীরা কল্পনার দুই বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা ও লাল বিহারী চাকমাকেও বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কল্পনার দুই ভাই টর্চের আলোতে স্পষ্টতই অপহরণকারীদের মধ্য থেকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী কজইছড়ি সেনাক্যাম্পের কম্যান্ডার লেঃ ফেরদৌস (মোঃ ফেরদৌস কায়ছার খান) এবং তার পাশে দাঁড়ানো ভিডিপি প্লাটুন কম্যান্ডার মোঃ নুরুল হক ও মোঃ সালেহ আহমদকে চিনতে পারেন।

কল্পনা চাকমা আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ জুম্ম সমাজে নিম্নবিত্ত পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজনীতি সচেতন একজন তরুণী। স্বজাতির অধিকার ও নারী-পরুষের সমধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল আদর্শে বিশ্বাসী এবং নিবেদিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতিতে পদচারণা। অপহৃত হওয়ার সময়কালে তিনি ছিলেন কাচালং কলেজের বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী। তার বয়স বড়জোর ২৩ বছর। পার্বত্য চট্টগ্রামে যখনই কোনো নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ড হতো তখনই তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হতেন। এমনকি এজন্য তিনি শাসক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গেও তর্ক করতেন এবং যুক্তি তুলে ধরতেন। পশ্চাৎপদ সমাজের ও আদিবাসী জুম্ম সমাজের নারী হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের জন্য তার যে লড়াই, সেটাই হয়েছে তার অপরাধ। এজন্যই তৎকালীন জাত্যাভিমানী, উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিভূ লেঃ ফেরদৌসরা মানবতা ও শিক্ষার মর্যাদার চরম পরিহানি ঘটিয়ে ঘুমন্ত কল্পনা চাকমাকে তুলে রাতের অন্ধকারে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

শাসকগোষ্ঠী এক কল্পনা চাকমার জীবন কেড়ে নিলেও এ পাহাড়ে আরও শত কল্পনা জন্ম নেবে। কল্পনা চাকমার জীবন কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য কল্পনার সংগ্রামী কণ্ঠকে রুদ্ধ করা গেলেও হাজার কল্পনার কণ্ঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রকম্পিত হয়েছে। কল্পনার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি সুদূর রাজধানীর রাজপথ কাঁপিয়েছে।

শাসকগোষ্ঠী কল্পনা চাকমাকে ছলে বলে কৌশলে আন্দোলন থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা চালায়। তাকে নানাভাবে হুমকি প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু কল্পনা চাকমা এইসব হুংকারে ভীত হয়ে সংগ্রাম থেকে সরে আসেননি।

কল্পনা চাকমাকে অপহরণের প্রতিবাদে মিছিল, মিটিং ও সমাবেশসহ আন্দোলন শুরু হয়। ২৭ জুন ১৯৯৬ এ নিয়ে বাঘাইছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে শান্তিপূর্ণভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালনকালে মুসলিম সেটেলাররা সাম্প্রদায়িক হামলা চালায় এবং রূপম চাকমাকে হত্যা করা হয় এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক গুলি চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় সুকেশ চাকমা, মনতোষ চাকমা ও সমর বিজয় চাকমাকে। তাদের এই রক্ত বৃথা যেতে পারে না।

কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঘটনার পর দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় ওঠে। ছাত্র থেকে শুরু করে লেখক, মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সবাই কল্পনা চাকমার অপহরণের প্রতিবাদে সোচ্চার হন। ফলে সপ্তম জাতীয় সংসদের মাধ্যমে নির্বাচিত তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল জলিলের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। সাবেক বিচারপতি আব্দুল জলিল একজন সৎ বিচারপতি ছিলেন। এ জন্য তিনি কল্পনা চাকমার অপহরণের প্রকৃত

সত্যতা খুঁজতে ১৯৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন চাপে সত্যটা প্রকাশ করতে পারেননি। তবে জলিল কমিশনের একটা বক্তব্য ছিল, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কল্পনা চাকমা অপহৃত হয়েছেন, তবে কার দ্বারা অপহৃত হয়েছেন সেটি তিনি বলে যাননি।

অপহরণ ঘটনার পরপরই কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমার অভিযোগ স্থানীয় বাঘাইছড়ি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হওয়ার প্রায় ১৪ বছর পর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মে ঘটনার বিষয়ে পুলিশের চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হলেও সেই রিপোর্টে অভিযুক্ত ও প্রকৃত দোষীদের সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে বাদী কালিন্দী কুমার চাকমা আদালতে উক্ত চূড়ান্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদন দাখিল করেন। এরপর বাদীর নারাজী আবেদনের প্রেক্ষিতে ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ শুনানি শেষে মামলার বিষয়ে অধিকতর তদন্তের জন্য আদালত সিআইডি পুলিশকে নির্দেশ দেন। এরপর আদালতের নির্দেশে একে একে চট্টগ্রাম জোন সিআইডির তদন্ত কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কয়েকজন পুলিশ সুপার রাঙ্গামাটির চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একের পর এক 'তদন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন' দাখিল করেন।

> কল্পনা চাকমাকে অপহরণের প্রতিবাদে মিছিল, মিটিং ও সমাবেশসহ আন্দোলন শুরু হয়। ২৭ জুন ১৯৯৬ এ নিয়ে বাঘাইছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে শান্তিপূর্ণভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালনকালে মুসলিম সেটেলাররা সাম্প্রদায়িক হামলা চালায় এবং রূপম চাকমাকে হত্যা করা হয় এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক গুলি চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় সুকেশ চাকমা, মনতোষ চাকমা ও সমর বিজয় চাকমাকে। তাদের এই রক্ত বৃথা যেতে পারে না।

কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনা ও মামলার বিশ বছর ও পাঁচ মাসের অধিক সময় পর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে মামলার ৩৯তম তদন্ত কর্মকর্তা রাঙ্গামাটির তৎকালীন পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদ তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্ট রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কগনিজেন্স আদালতে দাখিল করেন। কল্পনা অপহরণ মামলার বাদী কালিন্দী কুমার চাকমা উক্ত ৩৯তম তদন্তকারী কর্মকর্তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং মামলার কার্যক্রম বন্ধ রাখার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে আদালতে নারাজি আবেদন দাখিল করে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে যথাযথ বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান। এবিষয়ে আদালত ৮ জুন ২০১৭ প্রথম শুনানির আয়োজন করেন এবং নারাজির উপর পুলিশের প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। এরপর থেকে আদালত একের পর এক শুনানির দিন ধার্য করলেও পুলিশ এ বিষয়ে বার বার প্রতিবেদন দাখিলে অপারগতা প্রকাশ করে ক্রমাগত সময় চাইতে থাকেন। এ বিষয়ে আদালত সর্বশেষ আগামী ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে শুনানির দিন ধার্য করেছেন বলে বাদীর সূত্রে জানা গেছে।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যেতে পারে, এবারের শুনানিতেও অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি বিচারের ব্যবস্থা নেওয়া না হতেও পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং রাষ্ট্রের মালিক। সংবিধানে (২৭) এ বলা হয়েছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। আবার ২৮ এর (১) ধারায় বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। কিন্তু, আজ ২৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও কল্পনা চাকমা অপহরণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশে রাষ্ট্র ও সরকার দুইই উদাসীন ও নীরব।

শুধু কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান এবং পার্বত্যবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও তা যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় মুসলিম সেটেলার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যদের দ্বারা বহু জুম্ম নারী যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। কল্পনা চাকমা অপহরণের দীর্ঘ ২৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ২৭ বছরেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র কল্পনা চাকমার হদিশ দিতে পারেনি। যথাযথ বিচার করতে পারেনি মানবতা বিরোধী এই জঘন্য ঘটনার। এটাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের বিচারহীনতার একটি হীন দৃষ্টান্ত। দেশের নারী সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের চরম অবহেলা ও বঞ্চনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের ঘোষিত 'জিরো টলারেন্স' নীতির এটি একটি জঘন্য পরিহাস!

এটাই আঙুল দিয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দেয় যে, সামরিক যাঁতাকলে চরমভাবে পিষ্ট জুম্ম অধ্যুষিত এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। এটাই প্রমাণ করে যে, শাসকগোষ্ঠী কতৃর্ক ভূমি বেদখল, জুম্মদেরকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণ, সর্বোপরি জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য জঘন্য হাতিয়ার হিসেবে জুম্ম নারীর উপর জঘন্য সহিংসতা, অপহরণ, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা করার মতো নৃশংস ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য মতে, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে ১২ জন জুম্ম নারীর উপর শারীরিক ও যৌন সহিংসতা ঘটনা ঘটেছে। বস্তুত, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং চুক্তির আলোকে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ কার্যকর না হওয়ায়, উল্টো চুক্তি বিরোধী ষড়যন্ত্র জোরদার হওয়ার কারণে চুক্তি স্বাক্ষরের পরেও এহেন ঘটনা বেড়েই চলেছে।

তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে যথাযথভাবে বিচারের আওতায় এনে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা হোক।

সর্বোপরি জুম্ম নারীর জাতিগত নিরাপত্তা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং যথাযথ বিচার নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি দ্রুত রোডম্যাপ ঘোষণাপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

কল্পনা চাকমার জীবন ও সংগ্রাম বৃথা যেতে পারে না।॥

আগামীর পাহাড় হোক তরুণদের হাতে গড়া

রিমেন তালুকদার

ইতিহাস বলে তরুণরাই সমাজ ও রাজনীতির মোড় পরিবর্তন করেছে সবসময়। বিপ্লব এসেছে তাদেরই হাত ধরে। উদ্যোক্তা থেকে উদ্যম, সাহস থেকে সংগ্রাম, উল্লাস থেকে উদ্ভব, রাজপথ থেকে রাজনীতি সবকিছুতে এখন তরুণরাই মুখ্য। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম তরুণরাও বর্তমানের নায়ক, ভবিষ্যত নির্মাতাও এই তরুণেরা। পাহাড়ের কোণায় কোণায় থাকা জুম্ম তরুণদের জেগে উঠতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে। স্বপ্নকে সার্থক করতে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা জুম্ম তরুণ, আমরা আমাদের নিজের অধিকার কিভাবে আদায় করতে হয় জানি। আমরা আমাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্নকে কিভাবে বাস্তবে রূপ দিতে হয় জানি। তাই জুম্ম জাতির মুক্তি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এই সম্ভাবনাময়ী শিক্ষিত জুম্ম তরুণদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

> বেশ কিছুদিন আগে পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দেওয়া একটি বক্তব্যর ভিডিও দেখলাম ফেসবুকে তিনি সেখানে বলেছিলেন, 'বান্দরবানে এক ইঞ্চি জায়গাও খালি রাখা হবে না, উন্নয়নের জোয়ারে ভাসবে পার্বত্য এই বান্দরবান জেলা।' সেই উন্নয়নের জোয়ারে আজ বান্দরবানে আন্তর্জাতিক মানের রিসোর্ট হয়েছে। যে রিসোর্টের ইট, বালি, কংক্রিটের নিচে চাপা পড়ে আছে চিম্বুক ও নাইতং পাহাড়ে শতাব্দী কাল ধরে জুমচাষ করে আসা ম্রো জনগোষ্ঠীদের জুম ভূমি, বসতভিটা, শ্মশান, পবিত্র পাথর, পবিত্র বৃক্ষ, পানির উৎস ইত্যাদিসহ শত শত পরিবারের জীবন-জীবিকা।

১৯৬০-'৭০ দশকের জুম্ম তরুণরা দুই যুগের অধিক কাল বৈশাখীর ঝড়-ঝাপটা পার করেছে বনে-জঙ্গলে, প্রকৃতির সকল অন্তরায় অতিক্রম করে শাসকগোষ্ঠীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে। তেমনি এই ঝড়-বাদলের দিনেও বর্তমান জুম্ম তরুণরা লড়াই সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করার উদ্দেশ্যে সম্ভাবনাময় পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। আমাদের আগের তরুণেরা যদি শাসকগোষ্ঠীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করতে পারে, তাহলে আমরা বর্তমান তরুণরা সেই চুক্তিকে যথাযথ বাস্তবায়ন করতে শাসকগোষ্ঠীকে বাধ্য করতে পারবো না কেন?

আমি নিজেও এই তরুণ প্রজন্মের একজন ক্ষুদ্র প্রতিনিধি। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া রোজ অন্যায় অবিচারগুলো চিন্তাশক্তিকে টলিয়ে নিয়ে যায়। আমি নিজেকে যখন এই সমাজের একজন দাবি করছি তখন এই সমাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা অবশ্যই আমার আছে। যেমন পাহাড় আমরা আশা করেছিলাম, যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নতুন পাহাড় গড়ার উদ্দেশ্যে আমাদের আগের প্রজন্মরা আত্মদান করেছে, যে গভীর রোগ সারাতে এম এন লারমা, কল্পনাসহ আরো অনেক জুম্ম বীর নিজেদের ত্যাগ করেছে, আমরা তেমন পাহাড়ে নেই। সেই রোগ সারেনি, বরং আরও জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

এইতো সম্প্রতি ১৭-২৮ এপ্রিল ২০২৩, নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরামের ২২তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে ৪০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ১,৫৫৫টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে বলে যে উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা, কিন্তু সেই উন্নয়ন কার্যক্রম কাদের জন্য, সেই উন্নয়নে যদি আমরা আমাদের জায়গা-জমি হারিয়ে ফেলি, আমরা আমাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ি, যদি পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক আমাদের নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই

নির্ধারণ করতে না পারি, যদি আমাদের এলাকায় জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও জলাশয়ের উৎসস্থল ধ্বংসের মুখে পড়ে, আমরা আমাদের প্রথাগত চাষাবাদ ও জীবনজীবিকা থেকে যদি বঞ্চিত হয়, তাহলে এই উন্নয়নের মহোৎসব কাদের জন্য?

বেশ কিছুদিন আগে পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দেওয়া একটি বক্তব্যর ভিডিও দেখলাম ফেসবুকে তিনি সেখানে বলেছিলেন, 'বান্দরবানে এক ইঞ্চি জায়গাও খালি রাখা হবে না, উন্নয়নের জোয়ারে ভাসবে পার্বত্য এই বান্দরবান জেলা।' সেই উন্নয়নের জোয়ারে আজ বান্দরবানে আন্তর্জাতিক মানের রিসোর্ট হয়েছে। যে রিসোর্টের ইট, বালি, কংক্রিটের নিচে চাপা পড়ে আছে চিম্বুক ও নাইতং পাহাড়ে শতাব্দী কাল ধরে জুমচাষ করে আসা ম্রো জনগোষ্ঠীদের জুম ভূমি, বসতভিটা, শ্মশান, পবিত্র পাথর, পবিত্র বৃক্ষ, পানির উৎস ইত্যাদিসহ শত শত পরিবারের জীবন-জীবিকা।

সরকারের এমনই উন্নয়ন, যে উন্নয়নের উৎপীড়নে জুম্মদের দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। বিগত ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে হিল ভয়েসের এক প্রতিবেদনে সাজেক পর্যটন এলাকার অনিশ্চিত, ভয়ংকর এক ভবিষ্যতের আশংকার কথা তুলে ধরে উল্লেখ করা হয় যে, 'পর্যটনের রুইলুই এবং কংলাক পাড়ায় আগে যেখানে ৬৫ পরিবার লুসাই জনগোষ্ঠীর আদিবাসী ছিল এখন সেখানে আছে মাত্র ১০ পরিবার।' এরমধ্যে এই ১০ পরিবারও টিকে আছে কিনা সন্দেহ রয়েছে। বোমার ভয়ে নয়, গুলির ভয়েও নয়, উন্নয়ন!, উন্নয়নের উৎপীড়নে দেশ ছেড়েছেন তাঁরা।

পাহাড়, বন ভেদ করে যে সীমান্ত সড়ক চলে গেছে দুর্গম পাহাড়ি জনপদে, সেই সড়ক দিয়েই গেছে সামরিক বাহিনীর কনভয় এবং মুসলিম সেটেলারদের বহনকারী ট্রাক। এই সীমান্ত সড়ক জুম্ম আদিবাসীদের যতটুকু কাজে আসবে, তার থেকে বেশি জুম্ম জনগণের উপর সেনাবাহিনীর অভিযান চালানোর জন্য সেনা কনভয় চলাচলের জন্য কাজে আসবে। পাহাড়, বন উজার করে এই সড়ক নির্মানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই রাস্তা দিয়ে তাদের সৈন্য ও রসদ পৌঁছানো। জুম্মদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য নয়। স্কুল, মন্দির তৈরিতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, চিকিৎসা সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্য, পাহাড়ের সহজ সরল জুম্মদের মন জয় করা। তাই সাদা চোখে যাকে শান্তি-সম্প্রীতি-উন্নয়ন মনে হচ্ছে, তার পেছনে রয়েছে দমন-পীড়ন-শোষণের ষড়যন্ত্র।

এই সীমান্ত সড়ক নির্মাণের ফলে বিগত ২০২১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অন্তত শত শত জুম্ম পরিবার প্রত্যক্ষভাবে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছে আরো কয়েক শত জুম্ম পরিবার। যারা নিজের ঘরের ভিটা পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি।

সেনাবাহিনীর এই উন্নয়ন রাজনীতিকে বোঝার দায়িত্ব কিন্তু বর্তমান জুম্ম তরুণদের বেশি। কীভাবে সেনাবাহিনীর কালো পিচের রাস্তা এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সেখানকার আদিবাসী জুম্মদের শোষণ করে, কীভাবে পর্যটন নামের উন্নয়ন আদিবাসীদের শোষণ করছে- এর একেকটি বিষয় নিয়েই গভীর আলোচনা করতে হবে। চিম্বুক থেকে সাজেক এই সবই রাষ্ট্রের উন্নয়ন আগ্রাসনের দৃষ্টান্ত।

অন্যায় হবে যেখানে, প্রতিবাদেরে মশাল জ্বালাবো সেখানে। জাতির এই সংকটে তরুণেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে এইটাই সবার কাম্য। জাতির মুক্তির সংগ্রামে তরুণেরা বাড়ি ছাড়বে এইটাই জাতির প্রত্যাশা। যে তরুণ নিজ জন্মভূমির অস্তিত্ব ও জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে বাড়ি ছাড়ে সে তরুণ সমাজের চোখে কখনো সন্ত্রাসী হতে পারে না। আমরা জুম্ম তরুণ, আমাদের জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের অন্যতম পথপ্রদর্শক প্রিয় নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেছেন 'জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের জন্য মৃত্যুকে জয় করেছি। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, আমরা আমাদের অধিকারের জন্য আমরা জীবিত অবস্থায় মৃত থাকতে চাই না। আমরা চাই মানুষের মতো বেঁচে থাকতে এবং বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতে।' তাই প্রিয় নেতার এই উক্তি হৃদয়ে বেঁধে নিয়ে আমাদের তরুণদের জুম্ম জাতির মুক্তির সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখবেন আগামীর পাহাড় কিন্তু আমরা তরুণরাই গড়বো।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৭ম বৈঠক এবং চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা

গত ৯ মার্চ ২০২৩ বৃহস্পতিবার পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় গ্র্যান্ড হোটেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সপ্তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার বাইরে এই প্রথম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলো। গত ৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার সাড়ে তিন মাস পর কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হলো।

কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) এবং কমিটির সদস্য ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি দীপংকর তালুকদার এমপি, সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি বাসন্তী চাকমা, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব ও রাষ্ট্রদূত আবদুস সোবহান সিকদার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুসাম্মৎ হামিদা বেগমসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিগত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন, বিগত সভার সিদ্ধান্তাবলি পর্যালোচনা ও অগ্রগতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে বিষয় বা কার্যাবলি হস্তান্তর, চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ২৭ জনবল বিশিষ্ট অর্গানোগ্রাম কার্যকরকরণ, জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার, তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে জেলা প্রশাসকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের বিধি-বহির্ভূত নির্দেশনা প্রত্যাহার, টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ ত্বরান্বিতকরণ ও টাস্কফোর্সের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের পরিবর্তে টাস্কফোসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট অর্পণ ইত্যাদি।

বর্তমান সরকারের আমলে বিগত ১৪ বছরে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এবং ভারত-প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স পুনর্গঠিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু এসব কমিটির সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়নে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে সরকার কমিটির সিদ্ধান্তের বিপরীতে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।

২০১৪ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। সরকার কেবল চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখেনি, তার সঙ্গে চুক্তিকে নানাভাবে পদদলিত করে চলেছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো ব্যাপক সামরিকায়ন করে দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমাধানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। এর ফলে চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অধিকতর জটিল ও সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের চলমান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে সরকার 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'চাঁদাবাজি' কার্যক্রম হিসেবে আখ্যায়িত করে ক্রিমিনালাইজ করে চলেছে। ফলে জুম্ম জনগণের জীবনে নির্বিচারে গ্রেফতার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণ, জামিনে মুক্তির পর জেল গেইট পুনঃগ্রেফতার, ক্রসফায়ারের নামে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন, রাত-বিরাতে ঘরবাড়ি তল্লাশি ও হয়রানি, নারীর উপর সহিংসতা ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের পরিবর্তে সরকার অমুসলিম

অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদেরকে যথাযথ ও সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসনের পরিবর্তে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও সমতল জেলাগুলো থেকে বহিরাগত অভিবাসন অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দল ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর সহায়তায় রোহিঙ্গারা বান্দরবানসহ তিন পার্বত্য জেলায় বসতিস্থাপন করছে। পার্বত্য চুক্তিতে লঙ্ঘন করে এসব সেটেলারদেরকে তিন পার্বত্য জেলা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র করে চাকরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিসহ নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এভাবেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। ফলে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম দ্রুত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে ভারত-প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। ফলে তারা এখনো নিজ দেশে পরবাসীর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

নিজেদের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী সরকারগুলো কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে উস্কে দেওয়া সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও উত্তেজনা নিরসনের পরিবর্তে বর্তমানে সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক প্ররোচনা আরো জোরদার করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী ও সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এবং ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ নামক একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনে সংগঠিত করে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম, ভূমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা ইত্যাদি তৎপরতায় লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম ঘটনা হলো গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের আহূত সভা ভন্ডুল করার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কর্তৃক ৩৬ ঘন্টার হরতাল আহ্বান। এ সময় প্রশাসন, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে মুসলিম সেটেলারদের হরতাল প্রতিরোধ করার পরিবর্তে প্রকারান্তরে হরতালকারীদের সহায়তা করতে দেখা গিয়েছিল। চুক্তি-উত্তর সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর ২০টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে সংঘটিত হয়েছে ১৫টি।

পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়নি, বরঞ্চ অবাধে ভূমি বেদখল, ভূমি থেকে উচ্ছেদ ও বিতাড়নের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক হামলা ও গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, সেনা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণ, অস্থানীয়দের নিকট জুম্মদের প্রথাগত জুমভূমি ও মৌজা ভূমি ইজারা প্রদান, সেনাবাহিনী কর্তৃক বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র ও বিনোদন পার্ক নির্মাণের নামে হাজার হাজার একর জমি বেদখল ও অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও স্থানীয় জুম্ম জনগণের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে জুম্মদের গ্রাম উচ্ছেদ করে, ঘরবাড়ি, স্কুল ও মন্দির ভেঙ্গে দিয়ে, শত শত একরের বাগান-বাগিচা ধ্বংস করে তিন পার্বত্য জেলায় সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণে নির্বিচারে পাহাড় কর্তন ও বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে এলাকায় জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, পানীয় জলের উৎসের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনী এখন সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়কের সংলগ্ন জুম্মদের প্রথাগত জায়গা-জমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ, জুম চাষ ও বাগান-বাগিচা সৃজন করতে বাধা দিচ্ছে। এসব জায়গা-জমি ও পাহাড় জুম্মদের প্রথাগত জায়গা-জমি হলেও এসব জায়গা-জমি সরকারি খাস জমি হিসেবে জোরপূর্বক হেডম্যানদের কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে নিচ্ছে সেনাবাহিনী।

এ ধরনের উন্নয়নের নামে জুম্মদের উচ্ছেদ ও তাদের ভূমি বেদখলের অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে সেনাবাহিনী কর্তৃক বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ে পাঁচ তারকা হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ। সেনাবাহিনীর এই পর্যটন কেন্দ্রের ফলে জুম্ম জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিবর্তে তাদের জীবনজীবিকা ও সংস্কৃতি এবং এলাকার জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের উপর মারাত্মকভাবে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে ম্রোদের চারটি পাড়া ও পরোক্ষভাবে ৭০-১১৬টি পাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রায় ১০,০০০ জুমচাষি উদ্বাস্তু হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে। অন্যদিকে জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে অস্থানীয়দের দেওয়া ভূমি ইজারার ফলে ভূমি হারানো ও উচ্ছেদের আরেকটি অন্যতম ঘটনা হলো লামা রাবার কোম্পানি কর্তৃক গত ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে লামার সরই ইউনিয়নের তিন ম্রো ও ত্রিপুরা গ্রামবাসীর ৪০০ একর জুম ভূমি, বাগান-বাগিচা ও গ্রামীণ বনে অগ্নিসংযোগ ও সংঘবদ্ধ হামলা। এরপর বিগত এক বছর ধরে জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর উপর্যুপরি এক ডজনের অধিক বার হামলা ও ঘরবাড়ি অগ্নিসংযোগ, তিনটি মিথ্যা মামলা দায়ের, বৌদ্ধ মন্দির ভাঙচুর, হত্যার উদ্দেশ্যে ঝিড়িতে বিষ ছিটানো ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়ে আসছে। গত ৫ জুলাই ২০২২ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ছত্রছায়ায় দুই শতাধিক জন সেটেলার

কর্তৃক খাগড়াছড়ির মহালছড়ির মাইসছড়িতে জুম্মদের ৩৭টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ভাঙচুর এবং দুইজন আহত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে ১৫০-এর অধিক লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে।

দীর্ঘ ১৫ বছর আন্দোলনের পর গত ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হয়। এরপর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে ভূমি কমিশনের বিধিমালা খসড়া তৈরি করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করেছে আঞ্চলিক পরিষদ। কিন্তু এরপর সাত বছরের অধিক সময় ধরে সরকার ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়নের কাজ ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে। এই বিধিমালা প্রণীত না হওয়ার কারণে কমিশনের ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত মামলার শুনানি বা বিচারিক কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন এযাবৎ ৬ বার গঠিত হলেও কমিশনের নেই প্রয়োজনীয় জনবল ও তহবিল। খাগড়াছড়ি জেলায় কমিশনের প্রধান কার্যালয় এবং রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যালয়ে কমিশনের শাখা কার্যালয় স্থাপন করা হলেও সেসব অফিস মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এভাবেই আজ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হলেও এখনো চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থা, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা না থাকার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব, তাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা এবং এতদাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এসব কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলছে। ফলে জুম্ম জনগণ নিরাপত্তাহীন ও এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

পার্বত্য চুক্তিতে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান করা হলেও সরকার বর্তমানে একের পর এক নতুন ক্যাম্প স্থাপন কিংবা প্রত্যাহৃত ক্যাম্প নতুন করে পুনঃস্থাপন করে চলেছে। কেবল বিগত কোভিড-১৯ মহামারির সময় ২০টি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬টি নতুন ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে গত ১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকৃত ২৪০টি ক্যাম্পের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৩০টি ক্যাম্পে পুলিশ মোতায়েন করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৫৪৫টি অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে সরকার তিন দফায় মাত্র ১০৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করেছে। এছাড়া চুক্তিকে পদদলিত করে চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকারই ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে 'অপারেশন উত্তরণ' জারি করে। উক্ত 'অপারেশন উত্তরণ'-এর ক্ষমতা বলে নিরাপত্তা বাহিনী সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা, উন্নয়ন কার্যক্রমসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসন তথা আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত শক্তিশালী বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে।

সরকার কেবল এধরনের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমের মধ্যেই ক্ষান্ত থাকেনি, 'ভাগ করো শাসন করো' ঔপনিবেশিক নীতির ভিত্তিতে সরকার সেনাবাহিনী ও সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের মাধ্যমে জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল, সুবিধাবাদী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের নিয়ে একের পর সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠন করে দিয়ে এবং তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যে সশস্ত্রভাবে মোতায়েন করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে চলেছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট প্রসিত নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফ, সংস্কারপন্থী খ্যাত জেএসএস (এমএন লারমা), ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগ পার্টি খ্যাত এমএনপি ইত্যাদি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের পর সর্বশেষ সশস্ত্র গ্রুপ বমপার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) গঠিত হয়েছে। এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি, পানছড়ি ও দীঘিনালা, রাঙ্গামাটির বরকলের সুবলং, সদর উপজেলার জীবতলী ও নান্যাচর এবং বান্দরবানে বালাঘাটা ও পৌর এলাকায়; মগপার্টি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে রাজস্থলীর পোয়াইতু পাড়া; বমপার্টি সন্ত্রাসীদেরকে রোয়াংছড়ির সিপ্পি পাহাড়ে ও রুমার রেমাক্রি প্রাংসা এলাকায় প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্রসহ মোতায়েন রেখে অবাধে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে মদদ দেওয়া হয়েছে।

সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই কেবল কেএনএফ'কে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে তাই নয়, কেএনএফ কর্তৃক মাসিক অর্থের বিনিময়ে জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বিয়া

নামে ইসলামি জঙ্গী গোষ্ঠীকে আশ্রয় ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টিও দেখেও না দেখার ভান করে প্রকারান্তরে মদদ দিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরে সেই তথ্যটি ফাঁস হয়ে পড়লে আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে সরকার বাধ্য হয় ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ইসলামি জঙ্গী ও জঙ্গী আশ্রয়দাতা কেএনএফের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী, র‍্যাব, এসএসএফ ও সিটিটিসি (কাউন্টার টেরোরিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট) কর্তৃক কম্বিং অপারেশন চালাতে। কম্বিং অপারেশনের প্রারম্ভিক অবস্থায় রোয়াংছড়ির সিপ্পি পাহাড়ের আস্তানায় সেনাবাহিনী কেএনএফ ও ইসলামি জঙ্গী ঘিরে রাখলেও সেখান থেকে কেএনএফ ও ইসলামি জঙ্গীদের পালিয়ে যেতে কৌশলে সুযোগ করে দিয়েছিল। কম্বিং অপারেশনের ফলে অনেক ইসলামি জঙ্গী পাহাড় থেকে সমতল অঞ্চলে পালিয়ে যাওয়ার সময় সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও সিটিটিসি'র হাতে ধরা পড়লেও এখনো কেএনএফ ও জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বিয়ার নেতারা ধরাছোঁড়ায় বাইরে রয়েছে। জানা যায় যে, রুমার সিলৌপি পাড়া সংলগ্ন কেএনএফের কেটিসি ক্যাম্পে এখনো 'জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বিয়া'র নেতৃবৃন্দসহ ডজন খানেক জঙ্গী সদস্য অবস্থান করছে। বমপার্টি এখনো ইসলামি জঙ্গীদের আশ্রয় ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম থেকে সরে আসেনি বলে জানা যায়।

বস্তুত সরকারের প্রশ্রয়ে এভাবে সেনাবাহিনী একদিকে এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে লালন-পালন ও মদদ দিয়ে এলাকায় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে, অপরদিকে সন্ত্রাসী দমনের নামে জনসংহতি সমিতিসহ জুম্ম জনগণের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে এবং সন্ত্রাসী তৎপরতার দায়ভার সমিতির উপর চাপিয়ে দিয়ে চলেছে। গত ২৬ মে ২০২২ রাঙ্গামাটিতে এপিবিএনের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চাঁদাবাজি ও সশস্ত্র তৎপরতার মনগড়া অভিযোগ এনে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জুম্ম জনগণকে সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান জানান এবং ৩০ মিনিটের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করার হুমকি প্রদান করেন ২৪ পদাতিক ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল সাইফুল আবেদীন। শুধু তাই নয়, ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগসহ জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোতে যুক্ত জুম্মদের সুবিধাবাদী, ক্ষমতালিপ্সু ও তাঁবেদার লোকদেরকে মদদ দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম থেকে এটা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, শেখ হাসিনা সরকার আর চুক্তি বাস্তবায়ন করবে না। চুক্তি বাস্তবায়ন করবে না বিধায় গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২২তম অধিবেশনে ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫ ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে অসত্য তথ্য প্রচার করেছে। অথচ চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে, যা বিভিন্ন স্বাধীন ও নিরপক্ষে গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ফলাফলেও ফুটে উঠেছে।

> "জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের জন্য মৃত্যুকে জয় করেছি। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, আমরা আমাদের অধিকারের জন্য আমরা জীবিত অবস্থায় মৃত থাকতে চাই না। আমরা চাই মানুষের মতো বেঁচে থাকতে এবং বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতে।"
>
> –জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নয়ন আগ্রাসন: পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক

সরকার সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রকে কাজে লাগিয়ে চারিদিকে ঘিরে ধরার মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের নীলনক্সা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে উন্নয়ন ক্ষেত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জুম্মদেরকে তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ, জীবন-জীবিকা বিপন্ন করা, অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া, এলাকার জীব-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে। এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একতরফা রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, অস্থানীয়দের নিকট জুম্মদের প্রথাগত জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি লিজ দেওয়া, বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস-তেল অনুসন্ধান ইত্যাদি অন্যতম।

সীমান্ত সড়ক:

এ ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রকল্পের একটি হচ্ছে সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। 'সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পাবত্য জেলা) নির্মাণ প্রকল্প' নামক প্রকল্পের অধীনে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্তে ৩১৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে ২১০ কিমি। ভারত ও মিয়ানমারের পুরো সীমান্ত বরাবর সড়ক নির্মাণ করা হবে।

সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) প্রকল্পের ১ম পর্যায় (জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) সভায় মার্চ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে অনুমোদন দেওয়া হয়। শুরুতে প্রাক্কলিত বাজেট ছিল ১,৭০০ কোটি টাকা। এরপর উক্ত প্রকল্প অধিকতর সংশোধন করে গত ১৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় সংশোধিত বাজেট অনুমোদন দেওয়া হয়। সর্বশেষ অনুমোদিত বাজেটের পরিমাণ হলো ৩,৮৬০.৮২ টাকা। উক্ত প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০২৪ সাল পর্যন্ত। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প। ১০ বছর মেয়াদে মোট ১,০৩৬ কিমি সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করা হবে।

একনেকের অনুমোদনপত্র অনুসারে, সীমান্ত সড়ক প্রকল্পের পুরো টাকা বাংলাদেশ সরকারের কোষাগার থেকে ব্যয় করা হবে বলে বলা হয়েছে। এই বাজেটে চারটি খাত রয়েছে: (ক) রাজস্ব ব্যয়; (খ) মূলধন ব্যয়; (গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি ও (ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি। রাজস্ব ব্যয়টা মূলত বেতন ভাতা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সেবা, জ্বালানী, যাতায়াত ও যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বাবদ পরিচালন খরচ ধরা হয়েছে। কনটিনজেন্সি বা অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য মোট বাজেটের ১.২৫% বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ব্যয় ধরা হয়েছে মূলধন ব্যয়ের খাতে ৩ হাজার ৬ শত ৯০ কোটি ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, যা মোট বাজেটের ৯৬%। মূলধন ব্যয়ের অংশে ৩৩টি খাত ধরা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান খাতগুলো হলো: ক্যাম্প ও ডাকবাংলো নির্মাণ, সড়ক নির্মাণ, ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ, নিরাপত্তা বেষ্টনি নির্মাণ, ধারন দেওয়াল নির্মাণ, যন্ত্রপাতিসহ নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ক্রয় ইত্যাদি।

প্রকল্পের নথি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো- পার্বত্য জেলাসমূহের সীমান্ত বরাবর নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, সীমান্তের দুই পাশের অবৈধ ব্যবসা (অবৈধ অস্ত্র, অবৈধ ড্রাগস, মানব পাচার ইত্যাদি) বন্ধকরণ, পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধিকরণ, সীমান্ত এলাকায় কৃষি পণ্য দেশের মূল ভূখণ্ডের কৃষি পণ্যের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সীমান্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ, পার্বত্য এলাকার কৃষিপণ্য এবং ফসল ও উন্নতজাত পণ্য বৃদ্ধিকরণ, পার্বত্য জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকরণ, পার্বত্য জেলার দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদান করা, পার্বত্য জেলার দুর্গম সীমান্তবর্তী এলাকায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টিকরণ।

সংযোগ সড়ক:

সীমান্ত সড়কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য আরো রয়েছে অনেক সংযোগ সড়ক বা লিঙ্ক রোড। এসব সংযোগ সড়ক বা লিঙ্ক রোডের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–

১। সংযোগ সড়কের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে **রাজস্থলী-বিলাইছড়ি- জুরাছড়ি- বরকল- ঠেগামুখ** সংযোগ সড়ক। রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলায় নির্মাণাধীন ঠেগা স্থল বন্দরের সঙ্গে চট্টগ্রাম সুমদ্র বন্দরের সংযোগের জন্য রাজস্থলী থেকে ঠেগামুখ পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। জানা গেছে যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৬ ইসিবি বর্তমানে রাজস্থলী হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ পরিচালনা করছে। বর্তমানে বিলাইছড়ির ফারুয়া ইউনিয়ন হয়ে জুরাছড়ি উপজেলার সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তা কাটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২। রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের সিজকছড়া থেকে **সাজেক-শিলদা-বেতলিং সংযোগ সড়ক**, যার দৈর্ঘ হচ্ছে ৫২ কিলোমিটার। এই সংযোগ সড়ক সাজেক-দোকানঘাট-ঠেগামুখ পর্যন্ত ৯৫ কিলোমিটার সীমান্ত সড়কের সঙ্গে সংযোগ হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২০ ইসিবি (ইঞ্জিনিয়ার্স কন্সস্ট্রাকশন ব্যাটিলিয়ন) শিজকছড়া থেকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা উদয়পুর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করছে। এছাড়া উদয়পুর থেকে উত্তরে ১০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে ১০ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণাধীন রয়েছে।

৩। আলিকদম উপজেলা হতে **আলিকদম-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী সংযোগ সড়ক** রয়েছে। এ সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার নিরাপত্তা জোরদার হবে বলে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি আলিকদম উপজেলায় কুরুক পাতা ইউনিয়নের সঙ্গে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন ও স্থানীয় ম্রো ও ত্রিপুরা আদিবাসীদের উৎপাদিত কৃষি ও জুমজাত পণ্য বিপণনে ভূমিকা রাখবে বলে প্রকল্পের নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার নিরাপত্তা জোরদার হবে বলে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি আলিকদম উপজেলায় কুরুক পাতা ইউনিয়নের সঙ্গে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন ও স্থানীয় ম্রো ও ত্রিপুরা আদিবাসীদের উৎপাদিত কৃষি ও জুমজাত পণ্য বিপননে ভূমিকা রাখবে বলে প্রকল্পের নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়।

২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সংযোগ সড়কটি নির্মাণ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬ নির্মাণ প্রকৌশলী ব্যাটালিয়ন (১৬ ইসিবি)। এই সড়কটি দোছড়ির পাইনছড়ি থেকে থানছি সীমান্ত সড়কের সঙ্গে সংযোগ হবে। জানা গেছে যে, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে সড়কটি নির্মাণের জন্য ৩ শত ৭৪ কোটি টাকা অনুমোদন দেয় একনেক। এছাড়াও প্রকল্পে ২০ হাজার ৬ শতটি বৃক্ষরোপণ এবং গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নখাত বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে– ৮ লাখ ৭৬ হাজার ঘনমিটার মাটি কাটা, ১২ টি আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, ১১টি কালভার্ট, ১শ মিটার ওয়ার্টার ডেম (২/৩টি), ৯ শত ১৯ মিটার (১২টি) আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ, ৭২ মিটার (১১টি) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, ৪৮ দশমিক ৩ কিলোমিটার সাইড ড্রেন নির্মাণ, ১ শত ৩১ দশমিক ৮৪ মিটার ৫৫টি ক্রস

ড্রেন নির্মাণ, ১ হাজার ৮ শত ৫৪ মিটার রিটেইনিং ওয়াল ও ব্রেস্ট ওয়াল নির্মাণ, ৯৫ মিটার বল্টা প্যালাসাইডিং প্রভৃতি।

৪। বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের **আর্য্যপুর বনবিহারের কাছাকাছি উগলছড়ি গ্রাম হতে ৩০ ফুট প্রস্থ সংযোগ সড়ক** নির্মাণ করা হচ্ছে। এই সংযোগ সড়কটি নির্মাণ করছে সাজেক ইউনিয়নের ১০নং ক্যাম্পের সেনাবাহিনীর ২০ ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাক্টশন ব্যাটেলিয়ন। উক্ত জায়গা থেকে কজোইছড়ি মুখ হয়ে হালিমপুর বিজিবি সীমান্তবর্তী ক্যাম্প পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে এই সংযোগ সড়কটি। আর সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের তাংগুম মুখ ব্রিজ থেকে ঐ কজোইছড়ি ক্যাম্প বিজিবি রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত হবে।

ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন:

সীমান্ত সড়কের মূলধন ব্যয়ের খাতগুলোর মধ্যে দু'টো উল্লেখযোগ্য খাত রয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ বা পুনর্বাসনের বিষয়টি জড়িত। একটি হলো ভূমি অধিগ্রহণ এবং অন্যটি হলো বনায়ন। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ১ শত ৩৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, যা মোট বাজেটের প্রায় ৪.০%। একনেকের অনুমোদিত পত্রের সারসংক্ষেপ অনুসারে, এই সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ১০১.১২ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু ভূমি অধিগ্রহণ কীভাবে করা হবে, কিংবা করা হয়ে থাকলে কীভাবে করা হবে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা দেওয়া নেই। ভূমি অধিগ্রহণ যদি করা হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে কীভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তার কোনো তথ্য কোথাও উল্লেখ নেই। প্রথাগত ভূমি মালিকানার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা জানা নেই। জমি, ফসল, গাছপালা ও শস্য নষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য কী কোনো ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা তাও জানা নেই।

এদিকে বনায়নের জন্য থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ৬৩৪ কিমি এলাকায় বনায়নের জন্য ৬৩৪ কোটি থোক পরিমাণ ধরা হয়েছে। এই বনায়ন কোথায়, কী ধরনের, কীভাবে এবং কাকে দিয়ে করা হবে সে ব্যাপারে এখনো ধারণা পাওয়া যায়নি।

সড়ক নির্মাণের ফলে ক্ষয়ক্ষতি, উচ্ছেদ ও বিতাড়ন:

এই সীমান্ত সড়ক নির্মাণ এবং এ সড়কের সঙ্গে সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে জুম্মদের শত শত পরিবারের বসতবাড়ি, বাগান-বাগিচা, স্কুল, মন্দির উচ্ছেদ ও ধ্বংস করা হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। সীমান্ত সড়কের

চেয়ে সংযোগ সড়ক নির্মাণে বেশি ক্ষয়ক্ষতি করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী তাদের ইচ্ছা মতো সংযোগ সড়ক তৈরি করছে। স্থানীয় জুম্ম জনগণকে কীভাবে কম ক্ষতি করা যায় সে বিষয়টি বিবেচনা করছে না সেনাবাহিনী। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

১। রাজস্থলী- বিলাইছড়ি- জুরাছড়ি- বরকল- ঠেগামুখ সংযোগ সড়ক: ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের জুনে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের প্রকাশিত এক রিপোর্টে রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সংযোগ সড়ক বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক ৬১১ একর ভূমির প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয়। সমীক্ষায় জানানো হয় যে, উক্ত রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সড়ক নির্মাণ করা হলে ১১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, ৫৬৪ পরিবার প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ২৪১টি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ১৫৭ পরিবার ব্যবসায়িক কাঠামো হারাবে, ১০টি সাংস্কৃতিক অবকাঠামো (৩টি মসজিদ, ৩টি মন্দির ও ৪টি স্কুল) ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ৩২টি পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে জানানো হয়।

এই সড়ক নির্মাণ কাজের ফলে ইতোমধ্যে দুই উপজেলায় অন্তত ১২৯ পরিবার জুম্ম ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছে। তন্মধ্যে রাজস্থলী উপজেলায় ৫৫ পরিবার জুম্ম প্রায় ২৭.০৫ একর ভূমি এবং ২,১৫১টি বনজ ও ফলজ গাছ হারিয়েছে। অপরদিকে বিলাইছড়ি উপজেলায় ৭৪টি পরিবার ৯.৮ একর পরিমাণ ভূমি এবং ১,৪১৫টি বনজ ও ফলজ গাছ হারিয়েছে। এছাড়া এই সড়ক নির্মাণের ফলে বিলাইছড়ির ফারুয়া ইউনিয়নের এগুজ্যাছড়ি এলাকা থেকে ৮ পরিবার, শুক্করছড়ি এলাকা থেকে ৫ পরিবার ও গবছড়ি এলাকা থেকে ৬ পরিবার জুম্ম নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে। অধিকন্তু ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ির ফারুয়া ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর বীর ৩২ রেজিমেন্ট কর্তৃক গাছ-বাঁশের ব্যবসা ও গ্রামের প্রথাগত ভূমিতে চাষাবাদ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

২। সিজকছড়া থেকে সাজেক- শিলদা- বেতলিং সংযোগ সড়ক: বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২০ ইসিবি (ইঞ্জিনিয়ার্স কনস্ট্রাকশন ব্যাটিলিয়ন) শিজকছড়া থেকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা উদয়পুর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করছে। এছাড়া উদয়পুর থেকে উত্তরে ১০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে ১০ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণাধীন রয়েছে। কমলাক সাজেক ইউনিয়নের অন্তর্গত রুইলুই মৌজা ও লংকর মৌজার রুইলুই, শিজকছড়া, দাড়ি পাড়া হতে মিজোরামের শিলছড়ি সীমান্ত পাড় পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের ফলে নিজস্ব বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ এবং আংশিক বাগান-বাগিচা ও জুমভূমি হারিয়ে ২১১ পরিবারের আনুমানিক প্রায় ৮৫০ একর ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কমলাক এলাকায় ৬ পরিবার জুম্ম গ্রামবাসীর প্রায় ২০ একর পরিমাণ ভূমি বেদখল করে একটি বিজিবি ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া সিজকছড়া হতে উদয়পুর পর্যন্ত ৫টি সেনা ক্যাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যে জুম্মদের ভূমি বেদখল করে সিজকছড়া মুখ নামক স্থানে একটি এবং উদয়পুর এলাকায় একটি সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩২ কিলোমিটার পরিমাণ সড়ক নির্মাণ করার জন্য সাজেকের দাঁড়িপাড়া, ছয়নালপাড়া, বড় কমলাক পাড়া ও উদয়পুর গ্রামের ৬০ পরিবারের অন্তত ৪৩ একর ভূমি বেদখল করা হয় এবং সেখানে গড়ে তোলা দীর্ঘ দিনের সেগুন, কলা, আম, লিচু, সুপারি, ফুল ঝাড়ু ইত্যাদি বাগান ও হলুদ, তিল ইত্যাদি ক্ষেত ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সড়কের পাশে থাকা বেশকিছু জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িঘরও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এমনকি বড় বড় বুলডোজার ও ট্রাক্টর দিয়ে একরের পর একর প্রাকৃতিক বন ও পাহাড়ও কাটা হয়।

৩। আলিকদম-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে কুরুকপাতা ইউনিয়নের অধীন ১৩টি গ্রামের ৬০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৯ পরিবারের ঘরবাড়ি উচ্ছেদ হয়, ২৬ পরিবারের বাগান-বাগিচা ও ৩ পরিবারের জুমভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা গেছে। এমনকি ঘরবাড়ি উচ্ছেদ হয়ে ৩৯ পরিবারকে নিজ বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। ৬০ পরিবারের মধ্যে ৪৫ পরিবার ম্রো জনগোষ্ঠী, ২৩ পরিবার ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী ও ২ পরিবার মারমা জনগোষ্ঠীর বলে জানা গেছে।

৬০ পরিবারের মধ্যে ক্রাতপুং ম্রো চেয়ারম্যান কুরুকপাড়ার ৪ পরিবার (২ ত্রিপুরা ও ২ মারমা পরিবার)-এর বাগান ক্ষতিগ্রস্ত; করুকপাড়া বাজারের মেনপাত পাড়ার ৬টি ম্রো পরিবারের ঘর উচ্ছেদ; বুচিছড়া মেত্তলা পাড়ার ১ ম্রো পরিবারের বাগান ও ২ ম্রো পবিারের জুমভূমি ক্ষতিগ্রস্ত; ছোট বেটি খরচং পাড়ার ১ ম্রো পরিবারের বাগান ক্ষতিগ্রস্ত; দুঃখা পাড়ার ১ ম্রো পরিবারের বাগান ক্ষতিগ্রস্ত; বড় বেটি ইয়াংরি পাড়ার ৯ ম্রো পরিবারের বাগান ক্ষতিগ্রস্ত; দরিঅলেং পাড়ার ৩ ম্রো পরিবারের জুমভূমি ক্ষতিগ্রস্ত; জানালী পাড়ার ৪ ম্রো পরিবারের বাগান ক্ষতিগ্রস্ত; মেরিংচর কেংক পাড়ার ৬ ম্রো পরিবারের বাগান ক্ষতিগ্রস্ত; সাথিরাম ত্রিপুরা পাড়ার ১ পরিবারের বাগান ক্ষতিগ্রস্তসহ ৩ ত্রিপুরা পরিবারের ঘর উচ্ছেদ; জিরা পাড়ায় ২ পরিবারের বাগান ক্ষতিগ্রস্তসহ ১৮ ত্রিপুরা পরিবার উচ্ছেদ ও অন্যত্র স্থানান্তর; মেননিক ম্রো পাড়ায় ৮ পরিবারের ঘর উচ্ছেদ; এবং

মেনদন পাড়ায় ২ পরিবারের ঘর উচ্ছেদসহ ৪ ম্রো পরিবারের বাগান ক্ষতির শিকার হয়।

৪। বাঘাইছড়ি আর্য্যপুর বনবিহারের কাছাকাছি উগলছড়ি গ্রাম হতে সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে বাঘাইছড়িতে ১৮৮ পরিবারসহ জুম্ম গ্রামবাসীদের অন্তত ৫০০ পরিবারের বসতবাড়ি, বাগান-বাগিচা, স্কুল, মন্দির উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর ২০ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাক্টশন ব্যাটেলিয়ন কর্তৃক জুম্মদের বসতবাড়ি, বাগান-বাগিচা ও বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করে জোরপূর্বক এ ধরনের সংযোগ সড়ক নির্মাণের বিরুদ্ধে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি দিয়েছে বাঘাইছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত ১৮৮ পরিবারের লোকজন। পরে তাদেরকে খুবই সামান্য পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। সর্বমোট ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ২১৫ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

৫। পানছড়ি ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায়ও সীমান্ত সড়ক নির্মাণের নামে জুম্মদের বাগান-বাগিচা ও স্থাপনা ধ্বংস করা হচ্ছে। পানছড়ি উপজেলায় জুম্ম গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ি ঘেঁষে সীমান্ত সড়কের জন্য মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে। অনেক বাড়ির উঠোন কেটে নেওয়া হয়েছে। সড়কের দুই পাড়ে আম, কাঁঠালসহ যেসব ফলজ গাছ ছিলো সেগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। ধানি জমির উপর দিয়ে সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। অশোক কুমার চাকমা বলেন, লোগাং ইউনিয়নের ঘিলাতুলিতে একজনের বাড়ির উঠোন কেটে নেওয়া হয়েছে। তার বসত বাড়ি এখন হুমকির মুখে। সড়ক থেকে ঘরের দূরত্ব ৫ ফুটও নেই। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি হলে ভূমি ধ্বস হওয়ার আশংকা রয়েছে। ধারন দেওয়াল দেওয়া না হলে ঘরটাও ভেঙে পড়তে পারে। উক্ত গ্রামবাসীর লিচু, কাঁঠাল, আম ও কাঠদায়ী গাছ কাটা পড়েছে। একজনের লাগানো ছায়াশীতল বটগাছও কাটা হয়েছে।

উক্ত গ্রামবাসী সড়কের মাটি কাটার সময় দায়িত্বরত এক সেনাকে অনুরোধ করেছিলেন একটু দূরে করে মাটি কাটতে। কিন্তু তিনি কোনো কথা শুনেননি। সেনা সদস্যকে যখন বুলডোজার চালাতে মানা করা হচ্ছিলো, তিনি নাকি বলেছেন, 'রাস্তার জন্য যা করার তা করবো। দেশ আমার, মাটি আমার। এভাবে ঘিলাতুলি গ্রামের অনেক পরিবারের ফলজ গাছ ও ক্ষেত কেটে ফেলা হয়েছে। ঘিলাতুলি গ্রামের কার্বারি ঘরের উঠোনটাও সীমান্ত সড়কের মাটি কাটা থেকে রক্ষা করতে পারেননি।

পানছড়ি অঞ্চলে সীমান্ত সড়কের কাজ করতে গিয়ে অনেকের ধানি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই ধানি জমিগুলোকে সাধারণত চাকমা ভাষায় 'ঘোনা ভুই' (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ধানি জমি) বলা হয়। সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক পাহাড় কেটে ফেলা হয়েছে। ঘোনা জমিতে মাটি পড়ে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। কোথাও কোথাও ঘোনা জমির উপর দিয়ে সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে অনেক পরিবার ঘোনা জমিতে আর চাষ করতে পারবে না। জলাবদ্ধতা আর বাঁধের নিম্ন অঞ্চলে মাটির আস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক ঘোনা জমি চাষের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

লোগাং ইউনিয়নের ঘিলাতুলি গ্রামে সমবায়ের মতো একটা সমিতি করে আম, পেয়ারা ও বড়ই বাগান করা হয়েছে। সড়ক নির্মাণের জন্য সেই বাগান দখল করে বিজিবি ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। ঐ বিজিবি ক্যাম্পে পানি সরবরাহের জন্য একজনের ঘোনা জমিতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এরকম আরো অনেক পরিবার আছে, যারা ঐ সড়ক প্রকল্পের কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পানছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর কার কয়টা গাছের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে ব্যাপারে একটা তালিকা করা হয়েছিল। তাদেরকে নাকি মৌখিকভাবে জানানো হয়, ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু কী দেওয়া হবে এবং কখন দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে তাদেরকে কিছুই জানানো হয়নি। যাদের ফলজ গাছের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তাদেরকে দায়িত্বরত সেনাসদস্যরা কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তারা নাকি বলেছিলেন, ঐ টাকাটা ক্ষতিপূরণের টাকা হিসেবে নয়, সরকার খুশি হয়ে 'মাছ মাংস' কিনে খাওয়ার জন্য দিচ্ছে। গ্রামবাসীরা নিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত সেনা সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকাভুক্ত পরিবার প্রধানদের হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। টাকা

দিয়ে ছবি তুলেছিলেন। কেউ কেউ ২,০০০ টাকা, কেউ কেউ ২,৫০০ টাকা আর কেউ কেউ নাকি ৩,০০০ টাকা পেয়েছিলেন। গ্রামবাসীরা জানালেন, তারা বুঝতে পারলো না, ঐ টাকা গাছ-গাছালির ক্ষতিপূরণের দাম নাকি সরকারের খুশিতে মাছ-মাংস কিনে খাওয়ার টাকা।

৬। **অন্যান্য অঞ্চল:** বরকল উপজেলাস্থ হরিণা ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের ১৬০ নং তৈবাং মৌজায় ঘাসকাবাছড়া বিজিবি ক্যাম্প থেকে শ্রীনগর বাজার পর্যন্ত বিজিবি কর্তৃক সীমান্ত সড়ক নির্মাণে ৭ জন গ্রামবাসীর অনেক সেগুন বাগান কেটে ধ্বংস করা হয়েছে। বিজিবি ঘাসকাবাছড়া বিওপি ক্যাম্পের কম্যান্ডার নাম মো: হায়দার এর নেতৃত্বে ঘাসকাবাছড়া ক্যাম্প থেকে শ্রীনগর বাজার পর্যন্ত বিজিবি কর্তৃক ১০ ফুট চওড়া আনুমানিক ৩ কিলোমিটার একটি সীমান্ত সড়ক নির্মাণের সময় উক্ত ৭ জন গ্রামবাসীর ২৫ টি সেগুন গাছ কেটে দেওয়া হয়। যার বাজার মূল্য ১ লক্ষ টাকার উপরে।

উল্লেখ্য, রাস্তা না কাটার আগে ক্যাম্প কম্যান্ডার মো: হায়দার শ্রীনগর বাজারের স্থানীয় কার্বারি জ্ঞানশ্রী চাকমার সঙ্গে রাস্তাটির বিষয়ে কথা বললে তিনি স্থানীয় গ্রামবাসীদের ক্ষয়ক্ষতির কথা বিবেচনা করে রাস্তাটি না কাটার অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের কথা বিবেচনা না করে বর্তমানে রাস্তাটি বিজিবি নির্মাণ করছে।

সড়ক সংলগ্ন জায়গাতে ঘরবাড়ি নির্মাণে বাধা, জনগণের প্রতিবাদ ও ক্ষতিপূরণের দাবি

বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক এলাকার আদিবাসী জুম্ম জনগণ বাঁচার আকুতি এবং ভূমি বেদখল বন্ধ করে আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তারা বলছেন, উন্নয়ন নয়, আগে বাঁচতে হবে। আমার ভূমি আমার মা, কেড়ে নিতে দেবো না; আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। গত ২৮ এপ্রিল ২০২১ সাজেকের কমলাক, তালছড়া ও ছয়নালছড়া এলাকাবাসী জুম্ম জনগণ এক মানববন্ধন আয়োজন করে এসব দাবি ও মতামত উত্থাপন করেন। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী জুম্মরা স্থানীয় জুম্মদের ভূমি জোরপূর্বক বেদখল করে বিজিবি ও সেনা ক্যাম্প স্থাপন এবং সাজেক সড়ক নির্মাণের বিরোধিতা করেন এবং প্রতিবাদ জানান।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীরা কমলাক এলাকায় জুম্মদের জুম চাষে বাধা দিয়ে ও তাদের জুম ভূমি বেদখল করে এবং জুম্মদের সেগুন বাগান ও ফলজ বাগান ধ্বংস করে সেনাবাহিনীর ইসিবি (ইঞ্জিনিয়ার্স কনস্ট্রাকশন ব্যাটিলিয়ন) সড়ক নির্মাণ এবং বিজিবি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করছে। জানা গেছে, সেখানে ৬ পরিবার জুম্ম গ্রামবাসীর প্রায় ২০ একর পরিমাণ ভূমি বেদখল করে সড়ক ও বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

কমলাক পাড়ার জনৈক বাসিন্দা জানান, 'এই এলাকার মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে জুম। এখন আমাদের জুমচাষে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং জুমভূমি বেদখল করা হচ্ছে। এখন আমরা কী খেয়ে বাঁচবো?' জানা গেছে, কেবল সিজকছড়া হতে উদয়পুর পর্যন্ত ৫টি সেনা ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে জুম্মদের ভূমি বেদখল করে সিজকছড়া মুখ নামক স্থানে একটি এবং উদয়পুর এলাকায় একটি সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

পানছড়ি উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী গ্রাম নতুন শনখোলা ও ঘিলাতলি পাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের জায়গায় সীমান্ত সড়ক নির্মাণ ও সেনা ক্যাম্প স্থাপনের নামে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে পানছড়ি এলকাবাসী। উক্ত সড়কটি দক্ষিণে মাটিরাঙ্গার তানাক্কা পাড়া এবং উত্তরে দীঘিনালা-সাজেকে সংযুক্ত করা হবে বলে জানা যায়। সড়কটি নির্মাণের ফলে সড়কের আশেপাশে অনেক জন জুম্ম গ্রামবাসীর বাগান-বাগিচা, ফসল, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এতে স্থানীয় জনগণ ব্যাপক ক্ষতির শিকার হবেন।

২৯ মে ২০২২ পানছড়ি উপজেলার ২নং চেংঙ্গী ইউনিয়ন এলাকায় উক্ত সীমান্ত সড়ক নির্মাণ ও ক্যাম্প স্থাপনের নামে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে এই মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পানছড়ি উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও হেডম্যান-কার্বারিরা এক বিবৃতিতে মাটিরাঙ্গা-পানছড়ি-দীঘিনালা সীমান্ত সড়ক নির্মাণ ও পানছড়ির শনখোলা পাড়ায় সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। ৩০ মে ২০২২ প্রদত্ত এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে ১৮৪ জন বর্তমান ও সাবেক জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান ও কার্বারি এই দাবির কথা জানান।

হেডম্যানদের কাছ থেকে জোরপূর্বক দস্তখত আদায়:

জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুম্যা ইউনিয়নে সীমান্ত সড়ক নির্মাণকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক জোরপূর্বক ও বেআইনিভাবে স্থানীয় হেডম্যানদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক সংলগ্ন আশেপাশের সকল ভূমি খাসজমির অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকারোক্তি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যানের কাছ থেকে এই স্বাক্ষর গ্রহণ করছে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত), পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ (২০১৬ সংশোধিত) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০-এ স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকার অনুসারে সংশ্লিষ্ট মৌজার সকল ভূমি মৌজাবাসীর প্রথাগত ভূমি হিসেবে স্বীকৃত। এসব ভূমি হেডম্যানের পরিচালনায় জুম চাষ, বন সংরক্ষণ, চারণ ভূমি, বসতভিটা, শ্মশান ভূমি হিসেবে বন্টন ও ব্যবহার হয়ে থাকে। ফলে জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকার মোতাবেক হেডম্যানের অধীন এসব মৌজা ভূমি খাস বলে বিবেচিত নয় এবং খাস ভূমি হিসেবে কোনো হেডম্যান কোনো প্রত্যয়নপত্রও প্রদান করতে পারে না।

দুমদুম্যা ইউনিয়নে সীমান্ত সড়ক নির্মাণকারী সেনাবাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় গন্ডাছড়া মৌজার হেডম্যান সুংঙুর পাংখোয়াকে সীমান্ত সড়কের জায়গা ও এর আশেপাশের ভূমি সরকারি খাস জমি হিসেবে উল্লেখ করে সেনাবাহিনীর তৈরিকৃত একটি সনদপত্রে স্বাক্ষর দিতে নির্দেশ পাঠায় বলে জানা যায়। সেনাবাহিনীর তৈরিকৃত ঐ সনদপত্রে 'নির্মিতব্য সীমান্ত সড়কটি সরকারি খাস জমির উপর দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত সড়কটির এলাইনমেন্ট এবং এলাইনমেন্ট সংলগ্ন সকল জমি সরকারি খাস জমির অন্তর্ভুক্ত' বলে উল্লেখ করে মনগড়া বক্তব্য প্রদান করা হয়।

ইতোমধ্যে দুমদুম্যা ইউনিয়নে অবস্থিত গাছবাগান সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার সাইফুল উক্ত বক্তব্য সম্বলিত সনদপত্র শীর্ষক একটি কাগজ ১৫০নং দুমদুম্যা মৌজার হেডম্যান ও কার্বারিদের পাঠিয়েছেন এবং তাদের এতে স্বাক্ষর দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ওয়ারেন্ট অফিসার সাইফুল হেডম্যান ও কার্বারিদের উদ্দেশ্য করে এটাও বলেছেন যে, 'আপনারা স্বাক্ষর না করলেও তাতে কোনো কিছু আসে যায় না। সরকার তার কাজ সে করেই চলবে।'

অপরদিকে পার্শ্ববর্তী রেংখ্যং চংড়াছড়ি মৌজার হেডম্যান বলভদ্র চাকমার কাছ থেকেও এ ধরনের স্বাক্ষর আদায় করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন। মূলত ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা এবং সীমান্ত সংলগ্ন প্রথাগত জায়গা-জমিতে জুম্মদেরকে জুম চাষ ও বসতবাড়ি নির্মাণে বাধা প্রদানের হীন উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনী হেডম্যানদের কাছ থেকে এসব ভূমিকে খাস ভূমি হিসেবে প্রত্যয়ন প্রদানের জন্য জোরপূর্বক স্বাক্ষর নেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সীমান্ত সড়ক সংলগ্ন ব্যাপক এলাকা থেকে জুম্মদের বিতাড়নের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে সেনাবাহিনী এধরনের হীনতৎপরতা চালাচ্ছে বলে অনেক গ্রামবাসী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পর্যটনের জন্য সেনাবাহিনী কর্তৃক আকর্ষণীয় জায়গা জবরদখল:

সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নে সীমান্ত ও সংযোগ সড়ক সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকার জুম্ম অধ্যুষিত গাছবান গ্রামটি দীর্ঘদিন ধরে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে। ইতোমধ্যে ওই গ্রামের ২৬ পরিবারের মধ্যে ১৭ পরিবার অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং বাকি ৯

পরিবারকেও সেনাবাহিনী কর্তৃক সেখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অবশিষ্ট ৯ জুম্ম পরিবারকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদের জন্য সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতিনিয়ত গ্রামবাসীদের হুমকি-ধামকি প্রদান, গালিগালাজ ও হয়রানি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের একটি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, দু'টি দোকান ভাঙচুর এবং চার পরিবারের জুমে কাটা মাটি ফেলে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপরদিকে জুম্মদের উচ্ছেদ করা হলেও সড়কের পাশে নতুন সেনা ক্যাম্প এবং বড় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানান গ্রামবাসীরা।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ গাছবান সেনা ক্যাম্পের ২৬ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর এর ক্যাপ্টেন মারুফ ও সুবেদার মো: আহম্মেদ ফারুয়া ইউনিয়নের গাছবান পাড়া এলাকার কার্বারি (গ্রাম প্রধান) সহ ৯ জুম্ম পরিবারকে নিয়ে এক সভা ডেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিজেদের বাড়িঘর ও জিনিসপত্র নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এর আগে ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বিলাইছড়ি-বরকল এলাকার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শনে গেলে তিনিই উক্ত ৯ জুম্ম পরিবারকে তাদের আবাসস্থল থেকে উঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান বলে জানান ক্যাপ্টেন মারুফ।

গত ১ মার্চ ২০২৩ সেনাবাহিনীর ৩৪ বীর বেঙ্গলের গাছবান সেনা ক্যাম্পের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আহমেদ ও ওয়ারেন্ট অফিসার গোবিন্দের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল গাছবান গ্রামে গিয়ে জুম্মদের দুটি দোকান ভেঙে দেয়। উক্ত ঘটনার প্রায় এক ঘন্টা পর, সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আহমেদ আরও দুই সেনা সদস্য সঙ্গে নিয়ে বাত্যে লাল চাকমা (২৫) পিতা- বুদ্ধলীলা চাকমা নামে এক গ্রামবাসীর বাড়ি ভেঙে ফেলে এবং বাড়িটি জ্বালিয়ে দেয়।

নিজেদের আয়ের উৎস দোকান ও আশ্রয়স্থল বাড়ি হারিয়ে উক্ত গ্রামবাসীরা বর্তমানে চরম অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক ও কঠিন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। গাছবান সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ওই ৯ পরিবারকে জুম চাষেও নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। এর কিছুদিন আগে সেনা সদস্যরা তাদের ট্রাক্টর দিয়ে মাটি কেটে এনে জুমের জন্য নির্ধারিত জায়গার উপর সেই মাটি ঢেলে দিয়েছে। এতে চার পরিবারের জুমচাষ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। উক্ত ঘটনার কিছুদিন আগে ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মারুফ গ্রামে গিয়ে গ্রামের কেউ জুমে আগুন দিতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়ে আসেন। ক্যাপ্টেন মারুফ আরও বলেন, 'এখানে আমি তিনমাস থাকবো, দেখবো তোমরা কিভাবে জুমে আগুন দাও।' তারপর তিনি গ্রামবাসীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

সেনাবাহিনী মূলত ওই এলাকায় তাদের বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই উক্ত গ্রামবাসীদের জায়গাটি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সেনাবাহিনী শুধু সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করছে না, তারা সীমান্ত সড়কের নামে জুম্মদের ধনসম্পদ ধ্বংসসহ স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করছে এবং পর্যটন ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় জায়গাগুলো নিজেদের দখলে নিচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় সংরক্ষিত এলাকা বা সেনাবাহিনীর জায়গা বলে সাইনবোর্ডও টানিয়ে দিয়েছে।

আলোচনা করা হয়নি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

গ্রামের সাধারণ লোকজন এই সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ প্রকল্প সম্পর্কে আগে থেকেই কেউ কিছুই জানতেন না। এমনকি স্থানীয় সরকার পরিষদের জনপ্রতিনিধিরাও কিছুই জানেন না। শুধু এটুকুই জানে, সরকার রাস্তা বানাচ্ছে। পুরো সীমান্ত ঘিরে ফেলবে। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কিংবা প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা ও সম্মতি গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও স্থানীয় জুম্ম জনগণের মতামত এবং স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তি মোতাবেক প্রণীত আইনে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করার বিধান করা হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী অধিকার তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে এবং প্রশাসন ও উন্নয়নে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘের আদিবাসী ফোরামের আহ্বানে কি সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে?

সম্প্রতি ১৭-২৮ এপ্রিল ২০২৩, নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরামের ২২তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। উক্ত অধিবেশন শেষে পার্মানেন্ট ফোরাম ২২তম অধিবেশন রিপোর্ট ও সুপারিশ গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে।

উক্ত সুপারিশে বলা হয় যে, 'পার্মানেন্ট ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রগতি সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের তথ্যকে স্বাগত জানাচ্ছে। পার্মানেন্ট ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের সঙ্গে গঠনমূলক সংলাপ এবং সহযোগিতায় চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য আরও প্রচেষ্টা চালাতে বাংলাদেশকে আহ্বান জানাচ্ছে।'

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে দ্য ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে গতকাল রবিবার (৩০ এপ্রিল) এ সংক্রান্ত এক সংবাদ প্রকাশ করেছে। এ প্রেক্ষিতে নিখিল কুমার চাকমা তাঁর ফেসবুকে 'নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আদিবাসী সংক্রান্ত জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামে বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানানো হয়েছে' মর্মে খণ্ডিত তথ্য প্রকাশ করেন।

কিন্তু তিনি অত্যন্ত সুচতুরভাবে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে অধিকতর জোরালো প্রচেষ্টা চালানোর জন্য' বাংলাদেশের প্রতি পার্মানেন্ট ফোরামের আহ্বানকে এড়িয়ে যান। পার্মানেন্ট ফোরামের গৃহীত রিপোর্টের এই খণ্ডিত অংশ প্রচারণার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে জাতিসংঘও বাংলাদেশ সরকারের উপর সন্তুষ্ট- এই বার্তা দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন বৈকি। অথচ পার্মানেন্ট ফোরামের চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের এই সুপারিশটি হচ্ছে ২২তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এ থেকে একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, বাংলাদেশ সরকার কি পার্মানেন্ট ফোরামের আহ্বানে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে?

এ বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে ৪০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ১,৫৫৫টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে মর্মে পার্মানেন্ট ফোরামে উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেছিলেন সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ। তবে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, সেই উন্নয়ন কার্যক্রম আদিবাসী জুম্মদের জন্য কতটুকু টেকসই হবে, যদি জুম্মরা তাদের জায়গা-জমি হারিয়ে ফেলে, তাদের চিরায়ত ভূমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে, যদি পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক তাদের স্বশাসন তথা নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে, যদি এলাকায় জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও জলাশয়ের উৎসস্থল ধ্বংস করা হয়ে যায়, যদি জুম্মরা তাদের প্রথাগত চাষাবাদ ও জীবনজীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়?

'চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ জাতিসংঘের মতো বিশ্ব ফোরামে গিয়ে অসত্য তথ্য তুলে ধরেছিলেন। তাদের কথা মতো যদি ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়, ৩টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয় এবং বাকি মাত্র ৪টি ধারা অবাস্তবায়িত থাকে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক ও সার্বিক পরিস্থিতি কেন এখনো চুক্তি-পূর্ব অবস্থার মতো? চুক্তির ২৫তম বর্ষপূর্তিকালে সরকার যেখানে ৪৮ ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেছিল, সেখানে বিগত ৫ মাসে কীভাবে আরো ১৭টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলো তা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। অথচ বিগত ২০১৪ সাল থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ রেখেও চুক্তি বাস্তবায়ন করা যায়- এমনতর ভেলকিবাজিতে সাধারণ মানুষ হতবাক না হয়ে থাকতে পারে না।

৩টি ধারা আংশিক বাস্তবায়ন ও চুক্তির ৪টি ধারা যদি অবাস্তবায়িত থেকে যায়, তাহলে চুক্তির 'ক' খণ্ডের ১নং ধারায় স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি (জুম্ম) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কেন ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ন হচ্ছে? উক্ত খণ্ডের ২নং ধারা মোতাবেক কেন পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান ইত্যাদি সংশোধিত হয়নি কেন? পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রুজুকৃত মামলা নিষ্পত্তির কাজকে এতো বছর ধরে কেন সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে?

চুক্তির 'খ' খণ্ডের বিধান অনুসারে বিগত ২৬ বছরে এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো না। এই খণ্ডে স্বীকৃত বিধান অনুসারে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের

নিয়ে ভোটার তালিকা এখনো প্রণয়ন করা হয়নি। প্রণীত হয়নি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা বিধিমালা ও নির্বাচন বিধিমালা। ২৬ বছরেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো হস্তান্তর করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলায় এখনো পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়নি। চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটিতে সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও বাতিল করা হয়নি চুক্তি লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসকদের নিকট প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের এখতিয়ার।

চুক্তির যদি মাত্র ৪টি ধারা সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত ও ৩টি আংশিক অবাস্তবায়িত থাকতো, তাহলে চুক্তির 'গ' খণ্ডে সন্নিবেশিত বিধান অনুযায়ী কেন তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হচ্ছে না? কেন প্রবর্তিত হয়নি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির উপর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার প্রক্রিয়া? আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কেন দায়িত্ব পালন করছে না?

অপরদিকে চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের সন্নিবেশিত বিধান অনুসারে এখনো ভারত-প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা তাদের জায়গা-জমি ফেরত পায়নি। স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসন করা হয়নি আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদেরকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম মূল সমস্যা হচ্ছে ভূমি সমস্যা। ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে কেন ২৬ বছরেও একটি ভূমি বিরোধও নিষ্পত্তি হয়নি? জুম্ম জনগণ কেন প্রতিনিয়ত তাদের জায়গা-জমি হারাচ্ছে ও ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে? অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি লিজ বাতিল হয়নি কেন? জুম্ম জনগণের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে ক্ষুন্ন করে দেওয়া সেই লিজ বাতিল হয়নি বলেই সাম্প্রতিক সময়ে লামার সরই ইউনিয়নের তিনটি ম্রো ও ত্রিপরা গ্রামে একের পর এক হামলা ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ বন্ধ হয়নি। চুক্তিতে ভূমিহীন পাহাড়ি পরিবারগুলোকে দুই একর জমি বন্দোবস্তী দেওয়ার কথা থাকলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি।

চুক্তি বেসমারিকীকরণের বিধানাবলি বাস্তবায়িত হয়নি বলেই আজো পার্বত্য চট্টগ্রামে চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প ও 'অপারেশন উত্তরণ' বলবৎ রয়েছে। ফলে নিরীহ জুম্ম জনগণ কেন প্রতিনিয়ত আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ধর-পাকড়, জেল-জুলুম, ঘরবাড়ি তল্লাশি, বিচার-বহির্ভুত হত্যার শিকার হচ্ছে। 'অপারেশন উত্তরণ'-এর ক্ষমতা বলে সেনাবাহিনী আজো সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নয়ন কার্যক্রমসহ হেন বিষয় নেই নিয়ন্ত্রণ করছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি বলেই তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আগাম অনুমতি ব্যতীত কোনো বিদেশীকে আজো পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ করতে এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনের প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়া আদিবাসী জুম্মদের সঙ্গে বিদেশীরা কথা বলতে বিধিনিষেধ জারি রয়েছে।

সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ কি এসব প্রশ্নাবলির উত্তর দিতে পারবেন? হয়তো দিলেও দিতে পারেন তাদের মনগড়া যুক্তি ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে।

এখানে মূল প্রশ্ন হলো, পার্মানেন্ট ফোরামের আহ্বানে কি সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে? ইতিমধ্যেই ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে ১০ম অধিবেশনেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সুপারিশ ছিল। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে আগস্টে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারও চুক্তি বাস্তবায়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীন পক্ষগুলোকে অবাধে প্রবেশাধিকার দিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান করেছিলেন। গত ২ ডিসেম্বর জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোটিয়রও পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জোরালো আহ্বান জানিয়েছিলেন। জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা আইএলও এবং মানবাধিকার পরিষদের ইউপিআরেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কথা উঠেছে। কিন্তু কই, বাংলাদেশের কোনো স্থায়ী মিশন থেকে তো বিবৃতি দিয়ে এসব সুপারিশের উপর কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়নি? কিন্তু এতো আহ্বান সত্ত্বেও সরকার তো অন্ধ-বধির সেজে রয়েছে।

মনে রাখা উচিৎ হবে যে, সরকার অন্ধ-বধির সাজলে যে প্রলয় বন্ধ হবে তা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। প্রলয় তার নিজস্ব গতিতেই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাবেই। জুম্ম জনগণের উপর দেশে তো নিপীড়ন-নির্যাতন চলছেই, জাতিসংঘের মতো বৈশ্বিক মানবাধিকার ফোরামেও নজরদারি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে জুম্ম আদিবাসী অধিকার কর্মীদের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

যারা অধিকারের জন্য লড়াই করতে একবার শিখেছে, তাদেরকে শত দমন-পীড়ন করেও তাদের লড়াই নস্যাৎ করা যায় না। তাই সরকার দমন-পীড়ন করে এবং দেশে-বিদেশে অসত্য প্রচারণা চালিয়ে পার্বত্য সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তার সমাধানে একমাত্র পথ হচ্ছে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র ও ছলচাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী আদিবাসী জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহ নির্মাণ, গরু-ছাগল পালন, সুদ-মুক্ত ঋণ ইত্যাদি প্রলোভন দেখিয়ে বান্দরবান জেলায় ধর্মান্তরকরণ চলছে। বান্দরবান জেলায় 'উপজাতীয় মুসলিম আর্দশ সংঘ', 'উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা' ও 'উপজাতীয় আর্দশ সংঘ বাংলাদেশ' ইত্যাদি সংগঠনের নাম দিয়ে জনবসতিও গড়ে তোলা হয়েছে এবং এসব সংগঠনের মাধ্যমে জুম্মদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালানো হচ্ছে।

এমনকি লেখাপড়া শেখানোর লোভ দেখিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে তাদের মাতা-পিতা থেকে নিয়ে ঢাকা, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পিতা-মাতার অজান্তে মাদ্রাসায় ভর্তি করানো এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার সংবাদ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। অন্যদিকে জুম্ম নারীদেরকে ফুসলিয়ে কিংবা ভালোবাসার প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করা এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিয়ের কিছুদিন পর বিবাহিত জুম্ম নারীকে শারীরিক নির্যাতন করা এবং নানা অজুহাতে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি বিবাহিত জুম্ম নারীর সঙ্গে যৌন জীবনের ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতেও দেখা গেছে।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণের কাজ কিছুটা ভাটা পড়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ২৫ বছরেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায়, বিশেষ করে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের একনাগাড়ে দীর্ঘ সাড়ে ১৪ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পরও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক জুম্মদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণের কাজ বর্তমানে চাঙ্গা হয়েছে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো-

শিক্ষার সুযোগ দানের ফাঁদ পেতে মাদ্রাসায় ভর্তি ও ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ

দেশের কিছু প্রত্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার শিশুদের নানা কূটকৌশলে তাদের স্ব স্ব ধর্ম থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা

হচ্ছে। এসমস্ত পরিবারসমূহ আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও তাদের এলাকা থেকে স্কুলের দুর্গম্যতার কারণে তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠাতে না পারায়, দরিদ্র ও নিরক্ষর আদিবাসী পরিবারের শিশুরা এরূপ ধর্মান্তরকরণের প্রধান শিকার। এই অমুসলিম আদিবাসী সম্প্রদায়কে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় মৌলবাদীরা সারাদেশে 'ইসলামিকরণ'-এর উদ্দেশ্য নিয়ে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীকে প্রলুব্ধ করার জন্য শিক্ষাকে ব্যবহার করছে।

দরিদ্র অনেক আদিবাসী মানুষের সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই নিজেদের শিশুদের লেখাপড়া করানোর। আর সেটাকেই ধর্মান্তরিতকরণের মোক্ষম সুযোগ ও সম্ভাবনা হিসেবে বেছে নেয় ইসলামি মৌলবাদী চক্র। দরিদ্র ও নিরক্ষর আদিবাসী পরিবারের শিশুরা এরূপ ধর্মান্তরকরণের অন্যতম শিকার।

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠী প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করে থাকে, সেহেতু জুম্ম শিশুদের ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ থাকে না, যদিও সেখানে আদৌ স্কুল থাকে। স্কুলে যেতে ও স্কুল থেকে ফিরে আসতে আদিবাসী শিশুদের পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয় কয়েক মাইল। এছাড়া আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠী জাতীয় সমাজের অন্যতম সবচেয়ে দরিদ্রতম অংশ হওয়ায়, আর্থিক দুরবস্থার কারণে অনেক আদিবাসী পরিবারের তাদের শিশুদের ভালো স্কুলে পাঠানোর সামর্থ্য থাকে না। ফলে তাদের শিশুদের জন্য ভালো শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে এমন যে কোনো সুযোগ তারা খোঁজে।

জানা গেছে, ইসলামি ধর্মীয় মৌলবাদীরা তারা ভালো স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এই প্রলোভন দেখিয়ে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা বলে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল আদিবাসী পরিবারগুলোকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু বাস্তবে এইসব ধর্মীয় মৌলবাদীরা আদিবাসী শিশুদের কখনোই ভালো স্কুলে নিয়ে যায় না, বরং ইসলামে ধর্মান্তরিত করার অভিসন্ধি নিয়ে তাদেরকে ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় নিয়ে যায়। সেখানে সেই শিশুদের ধীরে ধীরে নিজের পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে ইসলামি ধর্ম ও সংস্কৃতি শিখতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

গত ১ জানুয়ারি ২০১৭, ঢাকায় এক মাদ্রাসায় পাচার হওয়ার সময় পুলিশ বান্দরবান শহরের 'অতিথি আবাসিক হোটেল' থেকে চার আদিবাসী শিশুকে উদ্ধার করে। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত আবু বক্কর সিদ্দিক (৪৫), যার পূর্ব নাম মংশৈ প্রু চৌধুরী ও মোহাম্মদ হাসান (২৫) এই পাচারকাজের অন্যতম মূল হোতা বলে জানা যায়। তাদেরকে উক্ত চারজন শিশুসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। অপরদিকে তাদের সঙ্গী সুমন খেয়াং গ্রেফতার থেকে পালিয়ে যায়। গ্রেফতারের পর বান্দরবান সদর থানায় একটি মানবপাচার মামলা দায়ের করা হয়। উদ্ধারকৃত শিশুরা সকলেই বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের বাসিন্দা। অপরাধ চক্রের সদস্যদের কর্তৃক শিশুদের পরিবারগুলোকে ঢাকায় বিনা খরচে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রলোভন দেখানো হয়।

উদ্ধারকৃত শিশুরা, যারা সকলেই বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়ন থেকে, তারা হলো- হেডম্যান পাড়ার উহ্লা অং মারমার মেয়ে মাসিং সই মারমা (১২) ও পাচিনু মারমার ছেলে থোয়াইলা মারমা (৮); বেতছড়ামুখ পাড়ার সাউপ্রু মারমার মেয়ে নুছিং উ মারমা (১২) এবং বৈদ্য পায়ার অং থোয়াই চিং মারমার মেয়ে মেচিং প্রু মারমা (১৩)। পাচারকারী চক্রের সদস্যদের কর্তৃক শিশুদের পরিবারগুলোকে ঢাকায় বিনা খরচে তাদের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রলোভন দেখানো হয়।

সুবিধাবঞ্চিত ও অশিক্ষিত পরিবেশ থেকে আসা অনেক প্রত্যন্ত আদিবাসী পরিবার তাদের শিশুদের অধিকতর ভালো ভবিষ্যতের মিথ্যা আশার ফাঁদে পড়ে। তবে এটা সবসময় বিনামূল্যে হয় না, পরিবারগুলোতে কয়েক হাজার টাকা থেকে শুরু করে কিছু টাকা খরচ করতে হয়। যেহেতু ধর্মান্তরিতকরণ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয় না, তাই মা-বাবারা সহজেই তাদের শিশুদের জন্য ভালো ভবিষ্যতের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়।

কাপেং ফাউন্ডেশন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের তার বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনের আদিবাসী শিশুদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণের এরকম কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরে। তার পূর্ববর্তী ৭ বছরে অন্তত ৭০ জন আদিবাসী শিশু, অধিকাংশই খ্রিষ্টীয় ও হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়। এসব শিশুদের অধিকাংশই বান্দরবান জেলা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এর পূর্বে ২ জানুয়ারি ২০১৩, পুলিশ ঢাকার সবুজবাগ থানাধীন আবুযোর জিফারি মসজিদ কমপ্লেক্স নামের এক মাদ্রাসা থেকে ১৬ আদিবাসী শিশুকে উদ্ধার করে। শিশুদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। ত্রিপুরা ও চাকমা জাতিভুক্ত এসব শিশুদের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতারণা করে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আদিবাসী ত্রিপুরা শিশুদের আরেকটি গ্রুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ঢাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। শিশুদেরকে বান্দরবানের চিম্বুক এলাকা থেকে

ফিরোজপুর জেলার একটি মাদ্রাসায় নেওয়া হচ্ছিল। তাদেরকে একটি মিশনারি স্কুলে ভর্তি করানো হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

এর আগে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসেও গাজীপুর ও ঢাকার বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে ১১ জন আদিবাসী ত্রিপুরা শিশুকে উদ্ধার করা হয়। তাদের মধ্যে গাজীপুর জেলার মিয়া পাড়ার দারুল হুদা ইসলামি মাদ্রাসা থেকে ৮ শিশুকে এবং ঢাকার মোহাম্মদপুরের এক মাদ্রাসা থেকে ১ নারী শিশু ও গুলশানের দারুল হুদা মাদ্রাসা থেকে ২ শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

২০১০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুলিশ কর্তৃক কেবল বান্দরবান শহরের এক মোটেল 'অতিথি বোর্ডিং' থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ৩৩ শিশুকে উদ্ধার করে। বান্দরবানের থানচি উপজেলা থেকে এই শিশুদের সংগ্রহ করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ধানমন্ডি আদর্শ মদিনা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন দেখিয়ে। এসময় পুলিশ গর্ডন ত্রিপুরা ওরফে রুবেল, ঢাকার দারুল ইহসান মাদ্রাসার ছাত্র আবু হোরাইরা ও শ্যামলীর বাসিন্দা আবদুল গণি নামের শিশুদের পাচারকারী তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

২২ জানুয়ারি ২০২১ আলিকদম উপজেলার কুরুকপাতা ইউনিয়নের চারটি ম্রো গ্রামের ১৩ আদিবাসী ম্রো শিশুকে ইসলামে ধর্মান্তরকারী চক্রের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়। একদল সচেতন ম্রো ছাত্র স্থানীয় এনজিওকর্মী ও সমাজকর্মীদের সহযোগিতায় কক্সবাজারের 'ঈদগাহ উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংঘ' নামক এক প্রতিষ্ঠান থেকে এই শিশুদের উদ্ধার করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিনা খরচে থাকা, খাওয়া, লেখাপড়ার খরচ এর ব্যবস্থা ও আর্থিক সহযোগিতার প্রলোভন দেখিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরকারী এই চক্রটি দরিদ্র ও সহজ-সরল ম্রো পরিবারের কাছ থেকে এই শিশুদের নিয়ে যায়। পরে তারা বিভিন্ন মাদ্রাসায় রেখে এই অবুঝ শিশুদের আযানসহ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন শিক্ষা দিয়ে থাকে। শিশুদের পড়ানো হয় ইসলামি পোশাক। এক পর্যায়ে এই শিশুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। জেএমবি শামীম নামে পরিচিত ডা: মো: ইউসুফ আলী এই ধর্মান্তরিতকরণ চক্রের অন্যতম হোতা বলে জানা যায়।

অন্যদিকে লাদেন গ্রুপ নামে খ্যাত মুহাম্মদিয়া জামিয়া শরিফা লামা উপজেলায় দখল করেছে ৭ হাজার একর পাহাড় ভূমি। লাদেন গ্রুপের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো আদিবাসীদের বসতভিটা ও জুমভূমি জবরদখল করা, বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ দিয়ে আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও খ্রিষ্টানদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা এবং ঢাকায় উন্নত ও উচ্চ শিক্ষার প্রলোভন দিয়ে আদিবাসী শিশু-কিশোরদের কৌশলে ঢাকায় নেওয়া। এই গ্রুপ প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় ফাসিয়াখালীর মৌজার হেডম্যান মংথুই প্রু মারমার ২৫ একর জমিসহ ফাসিয়াখালী ও সাঙ্গু মৌজার আদিবাসী ম্রো, ত্রিপুরা ও মারমাদের শত শত একর জমি অবাধে দখল করে নিয়েছে।

লাদেন গ্রুপের বিরুদ্ধে জায়গা-জমি জবরদখল করে অবৈধভাবে বাণিজ্যিক বাগান করা এবং এসব অঞ্চলে জঙ্গি তৎপরতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে।

অপরদিকে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় 'কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন' নামে জাতীয় পর্যায়ের একটি এনজিও কর্তৃক ২০০১ সাল প্রতিষ্ঠিত কোয়ান্টাম স্কুল ও কলেজে নানা প্রলোভন দেখিয়ে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। কোয়ান্টাম আবাসিক স্কুলে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় কথা বলতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। ফলে মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগের অভাবের কারণে জুম্ম শিশুরা মাতৃভাষা ভুলে যেতে থাকে। বিশেষ করে কোয়ান্টামে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও সেই ধর্মীয় সংস্কৃতিতে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার অভিযোগ রয়েছে। উক্ত কলেজে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদেরকে সরাসরি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণে উদ্বুদ্ধ করা না হলেও ইসলামি আদব-কায়দা ও জীবনাচারে গড়ে তোলা হয়। তাদেরকে শ্রেণিকক্ষে 'সালামালিকুম', 'ওলাইকুম সালাম' ইত্যাদি ইসলামি সম্বোধন ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়। নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় তা শেখানো হয়।

কোয়ান্টাম সংস্থা শুরু থেকে জুম্মদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কোরবান ঈদের সময় শত শত গরু জবাই করে আশপাশের এলাকার সকল জুম্মদেরকে ডেকে ডেকে তালিকা করে গরুর মাংস ভাগবন্টন করে দেয়। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল আপন সেজে সহজ সরল জুম্মদের, বিশেষ করে ম্রোদের জায়গা জমি দখল করে নেওয়া ও তাদেরকে ইসলামি খাদ্য-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করা। ৬ ও ৭ মে ২০১৭ তারিখে ঢাকা থেকে এক নাগরিক প্রতিনিধিদল কোয়ান্টাম কর্তৃক লামায় ম্রো গ্রামবাসীর প্রায় ২,০০০ একর ভূমি বেদখল করা এবং জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগের অভাবের কারণে তাদের মাতৃভাষা ভুলে যাওয়ার অভিযোগ তদন্ত করতে গেলে সেনাবাহিনী বাধা প্রদান করে। ফলে তদন্ত করতে না পেরে নাগরিক প্রতিনিধিদলকে ঢাকায় ফিরতে হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান দেশের শিশুদেরকে জোরপূর্বক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে নিষেধ করে। সংবিধানের ৪১(২) ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।' তবু আদিবাসী শিশু ও তাদের পরিবার শিক্ষার ফাঁদে পড়ায়, আদিবাসী শিশুদের জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ অব্যাহতভাবে চলছে। রাষ্ট্র একদিকে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, অপরদিকে সংবিধানকে লংঘন করছে। তবু এ পর্যন্ত সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের তরফ থেকে আদিবাসী শিশুদের তাদের নিজেদের ধর্ম থেকে অপর একটি ধর্মে দীক্ষিতকরণ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো উদ্যোগ দেখতে পাওয়া যায় না। সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থা থেকে কতজন শিশু ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় সে ব্যাপারে যথাযথ কোনো তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না। যদি অবিলম্বে এ ধরনের ধর্মান্তরকরণ প্রতিরোধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, তাহলে অনেক আদিবাসী শিশু তাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা, ও জীবিকা হারিয়ে ফেলবে।

উপজাতীয় মুসলিম আর্দশ সংঘ ও তাবলীগ জামায়াত কর্তৃক আলিকদম ও লামায় ধর্মান্তরকরণ

বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার থানচি সড়ক ১১ কিমি এলাকায় ১ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৪টি অসহায় ও গরিব পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার নাম করে তাদের মাঝে সুদ মুক্ত ঋণ, তাদের মাঝে গৃহপালিত গরু-ছাগল দেওয়া হবে, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়াসহ নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র পাহাড়িদের মন ভুলিয়ে সুযোগ বুঝে গোপনে উপজাতীয় মুসলিম আর্দশ সংঘ ও দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ঈদগাঁও মডেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াবেটিস কেয়ার সেন্টারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডা: মো: ইউসুফ আলী মানবকল্যাণ কাজ তথা অসহায়, গরীব, দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবাসহ নানান মানব সেবামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে স্থানীয় গরিব পাহাড়িদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তেমনি তার হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা উপজাতীয় মুসলিমদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাদের সমস্যার কথা জেনে এ পরিবারগুলোর সন্তানদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করে। বর্তমানে বিভিন্ন মাদ্রাসায় ১৯ জনের মতো জুম্ম ছেলেমেয়ে মুসলিম রয়েছে। অনেকে ঈদগাঁও'র বিভিন্ন মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শেষ করছে।

কয়েকজন উপজাতীয় মুসলিমদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদেরকে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহযোগিতা ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে; গরু-ছাগল, নগদ অর্থ, গৃহ নির্মাণ করে দেওয়াসহ সুদ মুক্ত ঋণ দেওয়া হবে ইত্যাদি প্রলোভন দেখানো হয়। খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া আবু বক্কর ছিদ্দিক (যার পূর্বের নাম অতিরম ত্রিপুরা) বলেন, কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট মূলে ধর্ম ও নাম পরিবর্তন করে মুসলিম হতে হয়। তিনি আরো বলেন,

বর্তমানে তার ছেলে সাইফুল ইসলাম (পূর্বের নাম রাফেল ত্রিপুরা) ডা: ইউসুফ আলী হাসপাতালে চাকরিরত আছে।

তিনি বলেন, বাইবেলে লেখা আছে যে তোমরা সত্যকে খোঁজ, সত্য তোমাদের মুক্ত করবে। সে সত্যকে খুঁজতে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন বলে তিনি জানান। তার মা, বাবা, ভাইসহ সবাই মুসলিম হয়েছে। অন্যদিকে আলিকদমের জেসমিন আক্তার (পূর্বের নাম ঝর্ণা ত্রিপুরা), রোয়াংছড়ির সাদেকুল ইসলাম (জয়খর্ন ত্রিপুরা), গয়ালমারার নুরুল ইসলাম (প্রশান্ত ত্রিপুরা) সবাই এফিডেভিট মুলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে জানান। তবে তারা আরো উল্লেখ্য করেন যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ডা: ইউসুফ আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি তাদেরকে মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। আলিকদম ও থানচি ১১ কিলো এলাকাসহ মোট ৪৫ পরিবার ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন।

এদিকে লামা উপজেলার গয়ালমারা গ্রামে বসাবসরত ত্রিপুরাদের উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা ও উপজাতীয় আর্দশ সংঘ বাংলাদেশ, তাবলিগ ও জামায়াত-এর আলেম হাফেজ মো: জহিরুল ইসলাম, হাফেজ মো: কামাল, মো: মোহাম্মদুল্লাহ, হাফেজ মো: সালামাতুল্লাহ, মৌলভী হেলাল উদ্দিন ত্রিপুরা এবং সাইফুল ইসলাম ত্রিপুরা সভাপতি উপজাতীয় নও মুসলিম আর্দশ সংঘ তাদের নেতৃত্বে গয়ালমারায় ৪৫টি পরিবারকে আর্থিক ও নানা ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে।

সরেজমিন তদন্তে জানা যায় যে, বান্দরবান পৌর এলাকার বাস স্টেশনে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত ত্রিপুরা ও খিয়াং রয়েছে ৩০-এর অধিক পরিবার এবং টাংকি পাড়ায় ২০০১ সাল থেকে বসবাস রয়েছে নও ত্রিপুরা মুসলিমদের ১৫-এর অধিক পরিবার।

লামা উপজেলার লাইনঝিড়িতে ১৯৯৫ সাল থেকে ত্রিপুরা মুসলিমদের ১৭-এর অধিক পরিবার ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। গত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মো: রাসেল ত্রিপুরা (পূর্বের নাম রামন্দ্র ত্রিপুরা)-এর স্ত্রী সারেবান তাহুরা ত্রিপুরা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। আলিকদম-থানচি সড়কের ক্রাউডং (ডিম পাহাড়) এলাকায় (লামার রূপসী ইউনিয়ন) ২০০০ সাল থেকে ত্রিপুরা মুসলিমদের রয়েছে ১৬ পরিবারের মতো।

২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে ঢাকা ট্রিবিউন, ইউএনপিও, বুডিডস্টডোর.নেট, হেরাল্ডমালয়েশিয়া.কমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি ২০১০ হতে জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সাত বছরে কেবল পুলিশ কর্তৃক ধর্মান্তরে জড়িত ইসলামি চক্রের হাত থেকে ৭২ জন আদিবাসী জুম্ম শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর বাইরে যে আরও অনেক আদিবাসী পরিবার ও শিশু এ ধরনের অপরাধী চক্রের শিকার হয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়। সাম্প্রতিককালে

ইসলামি ধর্মান্তরকারীদের হাত থেকে ২২ জানুয়ারি ২০২১ উদ্ধারকৃত আলিকদমের ১৩ ম্রো শিশু।

এই ধর্মান্তরিতকরণের তৎপরতা আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে, ইউটিউবে প্রচারিত বিভিন্ন ভিডিও, পোস্ট এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, তথ্য-উপাত্ত থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে, বিশেষত কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পরপরই বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলিকদম উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসীদের এ ধরনের ধর্মান্তরিতকরণের ব্যাপক কার্যক্রমের খবর পাওয়া গেছে। যেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্মতি ও সহযোগিতা রয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে।

আপাত দৃষ্টিতে এই ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন বা সাধারণ মনে হলেও নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলে এটি একটি পরিকল্পিত ও সুসমন্বিত কার্যক্রমের অংশ বলে প্রতীয়মান হয়। এই কার্যক্রমে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর যে প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্থানীয় ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ যে এই প্রক্রিয়াকে নিবিড়ভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে তাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন সরকারি দলের জুম্ম সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের চোখের সামনেই এসব নির্বিঘ্নে ঘটে চলেছে। অবশ্য আদিবাসীদের ধর্মান্তরকরণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে সহযোগিতা ও মদদদানের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সম্পৃক্ততা এর পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে।

৪ জুন ২০২০ নিপন ত্রিপুরা তার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, 'সম্প্রীতির বান্দরবানে আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে কাজে লাগিয়ে প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাসরত ত্রিপুরাদের অবাধে ধর্মান্তরিত করার ইতিহাস অনেক বছরের পুরনো। সাম্প্রতিক সময়ে তা বহুগুণ বেড়ে গেছে।'

একই দিন 'লংদুকসা মউগ্রো এম' তার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে এ প্রসঙ্গে লেখেন, 'সহজ-সরল সাধারণ জুম্ম আদিবাসীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে ইসলামিকরণ করা হচ্ছে। কিভাবে মোনাজাত করা হয় শেখানো হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার অংশ এটি। এখানে খোদ সরকার সংশ্লিষ্ট রয়েছে বলে জানা গেছে। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মধ্যে ইসলামিকরণ ও বাঙালিকরণ প্রকল্পের ধুম পড়েছে বান্দরবানের আলীকদমে।'

সেনা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক ১৭টি নও মুসলিম ত্রিপুরা পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণ

রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় স্থানীয় সেনা ও উপজেলা প্রশাসন এবং আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সরকারের আশ্রায়ন প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় মারমা অধিবাসীদের শ্মশানভূমি জবরদখল করে তাতে ১৭টি নও (নব) মুসলিম ত্রিপুরা পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মারমাদের শ্মশানের পাশেই রয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের রোয়াংছড়ি কেন্দ্রীয় শ্যামা হরি মন্দির।

বিষয়টি জানার পর গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ সকালে স্থানীয় মারমা অধিবাসীরা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে তাদের শ্মশান এলাকাটি ঘেরাও করেন। স্থানীয় মারমাদের কর্তৃক শ্মশান এলাকায় বেড়া দেওয়ার খবর পাওয়ার পরপরই একই দিন রোয়াংছড়ি সেনা ক্যাম্পের কম্যান্ডার মেজর ফরহাদ রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আথুইমং মারমা, রোয়াংছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেইহ্লাআং মারমা, রোয়াংছড়ি মৌজার হেডম্যান ও ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার অংশৈচিং মারমাকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যান। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখও তাদেরকে বান্দরবান সেনা জোনেও ডেকে নেওয়া হয়।

এসময় জনপ্রতিনিধিদেরকে ক্যাম্পে আটকে রাখা হয় এবং ক্যাম্প কম্যান্ডার ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার অংশৈচিং মারমাকে শ্মশানের কাঁটা তারের বেড়া খুলে ফেলতে ক্যাম্প থেকে শ্মাশানে পাঠিয়ে দেন। উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, রোয়াংছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও রোয়াংছড়ি মৌজার হেডম্যানকে অনেক রাত পর্যন্ত হয়রানিমূলকভাবে ক্যাম্পে আটক রাখা হয়। শ্মশানের কাঁটা তারের বেড়া খুলে ফেলার খবর পাওয়ার পর রাতে উক্ত তিনজনকে ছেড়ে দেয় হয়। প্রথমে রোয়াংছড়ি সেনা ক্যাম্পের কম্যান্ডার মেজর ফরহাদ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মারমাদের শ্মশানভূমি দখলের উদ্দেশ্যে হেডম্যানের কাছ থেকে জোর করে 'খাস জমি'র অজুহাতে শ্মশানভূমি ছেড়ে দিতে সম্মতি আদায় করেন।

বান্দরবান কি ধর্মান্তরকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে?

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলাই ইসলামি মৌলবাদী ধর্মান্তরকারী গোষ্ঠীর টার্গেট ও কর্মক্ষেত্র হলেও, সাম্প্রতিককালে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ইসলামি গোষ্ঠী কর্তৃক দরিদ্র আদিবাসী জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ তৎপরতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মনে হয়, বান্দরবান যেন এখন ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। একটি সূত্রের মতে, বান্দরবান পৌরসভা, আলিকদম, রোয়াংছড়ি, লামাসহ বিভিন্ন এলাকায় ১০টির অধিক জুম্ম মুসলিম পাড়া বা বসতি রয়েছে। এইসব ধর্মান্তরিত জুম্ম মুসলিমদের বলা হচ্ছে 'নও মুসলিম' বা 'উপজাতি

মুসলিম'। এই ধর্মান্তরিত মুসলিম বসতিগুলোকে ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করে এবং কিছু বাছাইকৃত নও মুসলিমকে সুবিধা দিয়ে তাদের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ধর্মান্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে।

বান্দরবানের আলিকদম উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা একে এম আইয়ুব খান, ডা: ইউসুফ আলী, হাফেজ মাওলানা সালামাতুল্লাহ, আলিকদম সদরের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মদ, আলিকদম উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কালাম, মো: জাহিদ, সাহাব উদ্দিন, মাওলানা ইমরান হাবিবি, মোহাম্মদ আইয়ুব প্রমুখ এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ ও বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অপরদিকে আদিবাসী থেকে ধর্মান্তরিত যেসব নও মুসলিম এসব ধর্মান্তরকরণের সঙ্গে জড়িত তাদের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে, তারা হলো– জনৈক চাকমা ধর্মান্তরিত মুসলিম মো: শহিদ, উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘের সহ-সভাপতি মৌলভী হেলাল উদ্দিন ত্রিপুরা, উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘের সম্পাদক ধর্মান্তরিত মুসলিম ইব্রাহিম ত্রিপুরা, মুসলিম পাড়া মডেল একাডেমির শিক্ষক ধর্মান্তরিত মুসলিম সাইফুল ইসলাম ত্রিপুরা, আবু বক্কর ছিদ্দিক (পূর্ব নাম অতিরম ত্রিপুরা), খাগড়াছড়ির মো: আব্দুর রহিম (পূর্ব নাম ভিনসেন্ট চাকমা), মো: আব্দুর রহমান (পূর্ব নাম ভন্দ চাকমা), মো: ইব্রাহিম (পূর্ব নাম ভবাৎ চাকমা) প্রমুখ।

সম্প্রতি বান্দরবানের আলিকদমের এক টিলায় কলাবাগানের মধ্যে শিশু ও নারীসহ কয়েকজন সাধারণ জুম্মকে মোনাজাতের প্রশিক্ষণের ভিডিও প্রচারিত হয়। ভিডিওটিতে আলিকদম উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা একে এম আইয়ুব খান কর্তৃক মোনাজাত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতে দেখা যায়। এতে এসময় ৩ জন শিশু, বিভিন্ন বয়সের ৪ জন নারী, ১০/১১ জন বিভিন্ন বয়সের আদিবাসী পুরুষকে মোনাজাতের প্রশিক্ষণ দিতে দেখা যায়। মোনাজাতে বেশ কয়েকজন মুসলিম বাঙালিও অংশগ্রহণ করেন।

আলিকদম উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা একে এম আইয়ুব খান কর্তৃক ধারণকৃত ও প্রচারিত আরেক ভিডিওতে জানা গেছে, ইতোমধ্যে আলিকদম উপজেলার থানচি সড়ক সংলগ্ন ১১ কিলোমিটার নামক এলাকায় ধর্মান্তরিত মুসলিমদের নিয়ে 'ইসলামপুর' নামে একটি পল্লী গড়ে তোলা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে 'মুসলিম পাড়া মডেল একাডেমি'। এই ধর্মান্তরিত মুসলিমরা যাতে নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে গোঁড়া মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে মসজিদ ও মাদ্রাসা।

'উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘ, বাংলাদেশ' নামে সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এমনকি এই ধর্মান্তরিত আদিবাসী মুসলিম পরিবারের তরুণীদের সরাসরি মুসলিম ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। ১১ কিলো এলাকায় অন্তত ৪৫ পরিবার আদিবাসী ধর্মান্তরিত মুসলিম রয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের ছাঃলাওয়া পাড়ায় (শীলবান্ধা পাড়া) ৫ মারমা পরিবারকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। সেই ধর্মান্তরিত পরিবারগুলি হল- ১. অংঙৈসিং মারমা (পরিবারের সদস্য ৫ জন); ২. খ্যাইসাথুই মারমা (পরিবার সদস্য ৪জন); ৩. রেগ্যচিং মারমা (পরিবারের সদস্য ৬ জন); ৪. সিংনুমং মারমা (পরিবারের সদস্য ৫ জন), সাবেক মেম্বর, তার এক মেয়ে ১০-১৫ বছর আগে এক মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করে; ৫. লোইসাংমং মারমা (পরিবারের সদস্য ৭ জন)।

জানা গেছে, এরা কেউই জেনে-বুঝে বা আগ্রহী হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। তাদের আর্থিক দূর্বলতার সুযোগে সুকৌশলে তাদেরকে মুসলমান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রেগ্যচিং মারমা ও অংঙৈচিং মারমার দুই সন্তানকে ভালো ভবিষ্যতের প্রলোভন দেখিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে বিনিময়ে তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। জানা গেছে, সোলার প্যানেল দেওয়ার নাম করে তাদের কাছ থেকে আইডি কার্ড সংগ্রহ করা হয় এবং এরপর তাদেরকে মুসলমান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রধান হোতা ডা: ইউসুফ আলী ও মাওলানা একে এম আইয়ুব খান?

স্থানীয় সূত্র ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে, আলিকদমসহ বান্দরবানে আদিবাসী জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে সক্রিয় ও তৎপর হিসেবে দেখা গেছে ডা: ইউসুফ আলী নামে এক বহিরাগত চিকিৎসক ও আলিকদম উপজেলা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা একে এম আইয়ুব খানকে। তারা আদিবাসীদের অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিনিয়ত আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং গরিব-অশিক্ষিত আদিবাসীদের ধর্মান্তরের জন্য এফিড্যাভিটসহ আইনি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ডা: ইউসুফ আলীর গ্রামের বাড়ি বগুড়ায়, তবে বর্তমানে কক্সবাজারে থাকেন। সেখানে ঈদগাহ মডেল হসপিটাল ও ডায়াবেটিস কেয়ার সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আবাসিক সার্জন হিসেবে দায়িত্বে আছেন। জানা গেছে, তিনি অত্যন্ত সুক্ষভাবে ও সুকৌশলে বান্দরবানের আলিকদমসহ বিভিন্ন এলাকায় যেখানে সুযোগ পাচ্ছেন সেখানে আদিবাসী জুম্মদের ধর্মান্তরিতকরণে সক্রিয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা, বুদ্ধি-পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে, তিনি যেহেতু নিজে একজন চিকিৎসক এবং আর্থিকভাবে সমর্থ, সেকারণে অনেক সময় বিনা পয়সায় চিকিৎসার নামে অথবা কিছু আর্থিক সহযোগিতার নামেও আদিবাসীদের ধর্মান্তরিতকরণ করছেন।

ডা: মং এ নু চাক এর সঙ্গে ক্যামেরাই ছবি তুলে তিনি গত ৩ জুন তার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, We hate racism but believe in brotherhood (অর্থাৎ, আমরা বর্ণবাদ ঘৃণা করি, তবে ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি)। কিন্তু তিনি যে গরিব আদিবাসীদের সরলতা, দারিদ্র ও শিক্ষার অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার মধ্য দিয়ে মুসলিম বাঙালি বর্ণবাদ চাপিয়ে দিচ্ছেন এবং তাদের স্বকীয় সংস্কৃতির ধ্বংস করে চলেছেন সেই বোধ কি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন? মধুর কথার ফুলঝুরিতে, মানব সেবার আড়ালে তিনি কি এই আধুনিক যুগেও মধ্যযুগীয় কায়দায় অত্যন্ত অমানবিক ও ঘৃণ্য কাজ করছেন না?

গত ২৮ মে ২০২০ তিনি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, 'আমাদের এক প্রিয় নও মুসলিমা পারভীন ত্রিপুরা। মানিকগঞ্জের এক মহিলা মাদ্রাসায় পড়ত। মা ও বর্তমান বাবা নও মুসলিম। সে মাদ্রাসায় পড়ালেখার কারণে তার তাকওয়া ছিল প্রশংসনীয়। বাবা-মা মুসলিম হলেও ইসলামি সংস্কৃতির চেয়ে ত্রিপুরা সংস্কৃতিকে প্রাধান্য বেশি দেয়। তাকে একবার ছুটিতে এনে আর মাদ্রাসায় যেতে দেয় না। সে যেন বাইরে যেতে না পারে এজন্য তার বোরখাটা পুড়ে ফেলে বাবা। তাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। সে শর্ত দেয় পাত্রকে হাফেজ ও আলেম হতে হবে। কিন্তু তারা এক ছেলের সঙ্গে তার অমতে বিয়ে ঠিক করে। সে বুঝতে পারে তার ইসলামের উপর চলা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সে তার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলে রাখে। ফজরের আগে উঠে বান্ধবীর বোরখা নিয়ে পালায়। রাতে খবর পাই সে মাদ্রাসায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা আশ্বস্ত হই। সে আর বাড়িতে আসে না।'

ডা: ইউসুফ আলী পরে এই পারভীন ত্রিপুরার সঙ্গেই কক্সবাজারের ঈদগাহ কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা সালামাতুল্লাহ'র বিয়ের ব্যবস্থা করেন। পারভিন ত্রিপুরার বিষয়ে ফেসবুকের কথোপকথনে জনৈক Hillary try Mhvc মন্তব্য কলামে লেখেন, 'দোয়া ত করি ৩/৫ বছর পর মেয়াদ শেষ হলে বাপের বাড়ি দরজায় সামনে আসবেন না পারভিন বেগম ত্রিপুরা আপা'। এর জবাবে, ডা: ইউসুফ আলী লেখেন, 'কেন, অবশ্যই যাবে, শুদ্ধিকরণ মিশন নিয়ে যাবে। অলরেডি তার ছোটভাই কুরআন হিফজ শুরু করেছে।' এখানে ডা: ইউসুফ আলী 'শুদ্ধিকরণ মিশন নিয়ে যাবে' বলে কী

বোঝাতে চেয়েছেন? এটা কি এই সমস্ত পারভিন বেগম ত্রিপুরা বা চাকমা-মারমা ধর্মান্তরিত মুসলিমদের দিয়ে বেধর্মী বা অশুদ্ধ আদিবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার মধ্য দিয়েই তিনি তথাকথিত শুদ্ধিকরণ মিশন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি?

এই ডা: ইউসুফ আলীর নেতৃত্বেই আলিকদমের ধর্মান্তরিত আদিবাসী মুসলিমদের 'ইসলামপুর' নামক মুসলিম পাড়ায় মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয়। সেখানে তিনি তার নেতৃত্বে কক্সবাজারের বায়তুশ শরফ থেকে ডাক্তারদেরকে নিয়ে এসে মাঝে মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থারও আয়োজন করেন।

ডা: ইউসুফ আলী তার ১৩ মে ২০২০ তারিখে ছবিসহ এক ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'ডানের বাচ্চা সাইমুনা ত্রিপুরা, পিতা-ওমর ফারুক ত্রিপুরা; বাঁয়ের বাচ্চা আয়েশা ম্রো, পিতা-ইব্রাহিম ম্রো; মাঝখানে আমি বাঙালি। অনেক পার্থক্য, দুটি বড় মিল। প্রথম মিল আমরা মানুষ আর দ্বিতীয় মিল আমরা মুসলিম।' বাচ্চা দুটিকে তিনি দুপাশে দুটি রেখে ছবি উঠেন। বাচ্চাগুলো এখনও অবুঝ, দেড়-দুই বছরের বেশি হবে না।

ডা: ইউসুফ আলীর অন্যতম সহচর হচ্ছেন মাওলানা একে এম আইয়ুব খান, যিনি আলিকদম উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম। জানা যায়, তিনি আলিকদমের ১১ মাইল এর ধর্মান্তরিত মুসলিমদের যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানসহ বান্দরবানের আদিবাসীদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই ধর্মান্তরকরণের প্রচার ও প্রসার কাজেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

২০২০ খ্রিষ্টাব্দের মে-জুন মাসে বান্দরবানের আলিকদমের এক টিলায় কলাবাগানের মধ্যে শিশু ও নারীসহ কয়েকজন সাধারণ জুম্মকে মোনাজাতের প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা অনুষ্ঠানের ভিডিও প্রচারিত হয়। এতে ৩ জন শিশু, বিভিন্ন বয়সের ৪ জন নারী, ১০/১১ জন বিভিন্ন বয়সের আদিবাসী পুরুষকে দেখা যায়। এসময় বেশ কয়েকজন মুসলিম বাঙালিও অংশগ্রহণ করেন। এই মোনাজাত প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাওলানা একে এম আইয়ুব খান।

জানুয়ারি ২০১৯ এর দিকে ধারণকৃত এবং পরে ইউটিউবে প্রচারিত এক ভিডিওতে মাওলানা একে এম আইয়ুব খান বলেন, '...সম্মানিত দ্বীনী ভাইয়েরা, আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা খুব খেয়াল করেন। কিছুদিন আগেও আমরা একটা ভিডিও দিয়েছিলাম। আমার আইয়ুব খান এই পেইজে। নও মুসলিমদের বান্দরবান উপজেলার আলিকদমের থানচি সড়কে আরকি, থানচি সড়কে এগারো কিলোতে কিছু আমাদের ভাইয়েরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের কিছু বাচ্চা, প্রায় ১৭-১৮ জন ছেলেদেরকে পড়ানো হচ্ছে মাদ্রাসায়। তাদের জন্য আমাদের এক দ্বীনী ভাই তার আব্বারই ইচ্ছার সোয়াবের জন্য এই যে আমাদের নও মুসলিম ভাইদের জন্য একটা মসজিদ আমরা নির্মাণ করেছি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই মসজিদটি...'।

তিনি আর বলেন, 'যদি কেউ কিছু করতে চান, আপনারা সরাসরি এসে করতে পারেন। এখানে কোনো ধরনের অসুবিধা হবে না। আমরা এখানে সেনাবাহিনীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি এবং উনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন।' তবে ইহা তদন্তের বিষয় যে, তারা তাদের এ কাজে আরও কার কার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করছেন।

লক্ষ্য যখন জুম্ম নারী

জুম্মদের ধর্মান্তরিত করার এবং আধিপত্য বিস্তার ও জাতিগত নির্মূলীকরণের অন্যতম পন্থা হিসেবে লক্ষ্যবস্তু করা হয় আদিবাসী নারীকে। ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণ, যৌন হয়রানি ইত্যাদি সহিংসতা ছাড়াও জুম্ম সমাজকে আঘাত করার অন্যতম উপায় হিসেবে বেছে নেওয়া হয় তথাকথিত ভালোবাসা বা ছলনার ফাঁদে ফেলে জুম্ম নারীদের করায়ত্ত করা। আর জুম্ম নারীকে বিয়ে করা বা ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে তাকে সহজে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা।

এই সহিংসতা বা বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করা- সবকিছুতেই সরকার বা প্রশাসন তথা রাষ্ট্রের উদাসীনতা, আশ্রয়-প্রশ্রয়, মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। যে কারণে চুক্তির পূর্বে ও পরে শত শত জুম্ম নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাসহ নানা সহিংসতার শিকার হলেও কোনো ঘটনারই যথাযথ ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিককালে ধর্ষণের অভিযুক্তদের কাউকে কাউকে গ্রেফতার করা হলেও শেষ পর্যন্ত তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় না।

সম্প্রতি সহিংসতার পাশাপাশি, বাঙালি মুসলিমদের কর্তৃক ভালোবাসা বা ছলনার ফাঁদে ফেলে জুম্ম নারীদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করা বা সমাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা, যাকে বলা হচ্ছে 'লাভ জিহাদ', সেটা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এতে অনেক জুম্ম নারী চরম প্রতারণার শিকার হচ্ছে এবং বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি এমন প্রতারক ও বিকৃত রুচিসম্পন্ন এক মুসলিম যুবকের প্রতারণা তথাকথিত লাভ জিহাদের শিকার হয় আদিবাসী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের এক শিক্ষিত নারী। ঐ মুসলিম যুবক প্রেমের অভিনয় করে উক্ত ত্রিপুরা নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কও গড়ে তোলে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সেসবের ভিডিও ফুটেজ ধারণ করে। একপর্যায়ে মুসলিম যুবকটি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মেয়েটিকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে পরিবার ও

সমাজের অমতে বিয়েও করে। পরে ঐ যুবক ত্রিপুরা মেয়েটিকে বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করার চেষ্টা করে। এসময় মেয়েটি ছেলেটির ভয়ংকর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার কাছ থেকে সরে আসার প্রচেষ্টা চালায়। আর এসময় মুসলিম যুবকটি তাদের শারীরিক সম্পর্কের ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে। ফলে মেয়েটি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে।

এধরনের ধর্মান্তরকরণ ও বিয়ে প্রলোভনের অন্যতম শিকার হলো বহুল আলোচিত কক্সবাজারের লাকিংমে চাকমা। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি অপহৃত হয় লাকিংমে চাকমা। জন্মসনদ অনুযায়ী, অপহৃত হওয়ার দিনটিতে ওর বয়স ছিল ১৪ বছর ১০ মাস। অপহরণের পর ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত লাকিংমেকে আশপাশের গ্রামে রাখা হয়। ৯ জানুয়ারি ওকে নিয়ে যাওয়া হয় টেকনাফেরই শাহপরীর দ্বীপে। সেখানে জনৈক কালামনুর বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল অন্তত দুদিন। কিন্তু টেকনাফ থানা থেকে লাকিংমেকে উদ্ধারের জন্য ন্যূনতম উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১১ জানুয়ারি অপহরণকারী আতাউল্লাহ ভিকটিমকে নিয়ে যায় কুমিল্লায়। এরপর কুমিল্লার আদালতে লাকিংমেকে ধর্মান্তর এবং একটি কাজী অফিসে বিয়েতে বাধ্য করা হয়। টেকনাফেরই বাহারছড়া মাথাভাঙ্গা এলাকার ইয়াসিন, ইসা, আবুইয়াসহ আরও পাঁচজন লাকিংমেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

লালাঅং তাঁর মেয়ের অপহরণের পর মামলা করতে গিয়েছিলেন টেকনাফ থানায়। তখন কক্সবাজারের টেকনাফ থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার দাশ মামলা গ্রহণ করেননি। থানায় মামলা করতে না পেরে ২৭ জানুয়ারি লালাঅং চাকমা কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন। আদালত থেকে মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছিল পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। তদন্তের নামে যে অবহেলা তারা করেছেন তা পিবিআই কক্সবাজার ইউনিটের পরিদর্শক (নিরস্ত্র) ক্যশৈনু মারমার দেওয়া দু পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদনটি পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবেন এটা স্রেফ লোক দেখানো। অপহরণের পর কেটে যায় ১১ মাস। এ সময় মেয়েকে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন বাবা। অবশেষে গত ৯ ডিসেম্বর লালাঅং তাঁর মেয়ে লাকিংমের খোঁজ পান। তবে জীবিত নয়, কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পড়ে আছে তাঁর প্রিয় কন্যার মরদেহ।

উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত বহু আদিবাসী জুম্ম নারী এ ধরনের প্রতারণা বা লাভ জিহাদের শিকার হয়ে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন। বস্তুত আদিবাসীদের প্রতি সহিংস দৃষ্টিভঙ্গি ও আদিবাসী নারীদের প্রতি পাশবিক লালসা থেকেই এই ধরনের চিন্তা ও ঘটনার জন্ম।

ধর্মান্তরিতকরণ কি জাতিগত নির্মূলীকরণেরই অংশ!

বাংলাদেশের সংবিধানে 'ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে সংবিধানে, 'হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করবে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মাত্র ৮.৫% ভাগ হিন্দু এবং মাত্র ১% ভাগ বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের লোক রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ইসলাম যেন এই স্বল্প সংখ্যক ভিন্নধর্মী আদিবাসীদের অস্তিত্বও ধ্বংস করতে তৎপর হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করে ইসলামিকরণ করা এবং পার্বত্যাঞ্চল থেকে জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের অন্যতম অংশ হিসেবে এই ধর্মান্তরিতকরণ চলছে বলে অনেক আদিবাসী জুম্মর অভিযোগ। এমনকি আরাকান, কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য জেলাকে নিয়ে একটি ইসলামি জঙ্গী গোষ্ঠীর নতুন একটি ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েমের যে অভিপ্রায় ও ষড়যন্ত্র এটি তারই এক অংশ কিনা তাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বস্তুত দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই এই ইসলামিকরণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তবে এই কার্যক্রম আরও জোরদার হয় আশির দশকের শুরুতে ১৯৭৯-৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশের সমতল অঞ্চল থেকে ৪-৫ লক্ষ মুসলিম জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের জায়গা-জমিতে বসতিদানের মধ্য দিয়ে। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে সৌদি আরব ও কুয়েতের অর্থায়নে স্থাপন করা হয় ইসলামিক মিশনারি সংগঠন 'আল রাবিতা'। এর রয়েছে হাসপাতাল ও কলেজ।

কার্যত এর প্রদান উদ্দেশ্য ইসলামি ভাবধারাকে সম্প্রসারিত করা, সেটেলার বাঙালিদের সহায়তা এবং আদিবাসী জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের প্রচেষ্টা চালানো। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় মূলত জামায়াতে ইসলামি ও ইসলামি ছাত্র শিবিরের সঙ্গে। লংগদু ছাড়াও, রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলায় এবং বান্দরবানের আলিকদম উপজেলায়ও এর হাসপাতাল রয়েছে বলে জানা যায়। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে আল রাবিতা মিশনারি কেন্দ্র আলীকদমে ১৭ জন মারমাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে।

বস্তুত এই ধর্মান্তরিতকরণের ফলাফল বা পরিণতি যে আদিবাসী জুম্মদের সংখ্যালঘুকরণ, তাদের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা তাদের সংস্কৃতি ধ্বংসকরণ, তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনধারায় ক্ষতিসাধন, জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণতকরণ, সর্বোপরি জুম্মদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জাতিগতভাবে বিলুপ্তকরণেরই নামান্তর, তা বলাইবাহুল্য।

বিশেষ প্রতিবেদন

পাহাড়ে পর্যটন: জুম্মদের উচ্ছেদ ও ভূমি বেদখলের হাতিয়ার

বর্তমান বিশ্বে দেশে দেশে এবং আদিবাসী অঞ্চলে পর্যটন শিল্প স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সংযোগ ও বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের অন্যতম একটি ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে এটিকে সম্ভাবনাময় ও দ্রুত বিকাশমান একটি বহুমাত্রিক শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও পর্যটনকে দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকেও দেশের অন্যতম পর্যটন সম্ভাবনাময় অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হলেও দীর্ঘ সময় ধরে কড়া সামরিক শাসন এবং বিরাজমান সশস্ত্র সংঘাত ও অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এব্যাপারে কেউ কার্যকর উদ্যোগ ও উৎসাহ দেখায়নি। তবে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামেও পর্যটন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে শুরু করে। চুক্তিতে আদিবাসী জুম্মসহ স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করে 'স্থানীয় পর্যটন' বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন মহল কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বিভিন্ন রিসোর্ট, পর্যটন কেন্দ্র, হোটেল-মোটেল নির্মাণসহ নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া, বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর না হওয়া, চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'স্থানীয় পর্যটন' বিষয়টি যথাযথভাবে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে হস্তান্তর না করাসহ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে বর্তমানে পর্যটন পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন আগ্রাসনে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সরকারি মহল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বেসরকারি বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক উন্নয়নের নামে এই পর্যটন এখন স্থানীয় জুম্মদের বঞ্চিতকরণ এবং তাদের ভূমি বেদখল ও স্বভূমি থেকে উচ্ছেদের অন্যতম একটি উপায় বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দীর্ঘ ২৫ বছরেও চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া, উপরন্তু ১৪ বছর ধরে একনাগাড়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করে, উল্টো চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা গ্রহণের ফলে এবং পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী শাসকদের ন্যায় কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর নিকট ন্যস্ত করায় সামরিক বাহিনীই এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বহিরাগত গোষ্ঠী স্থানীয় জুম্মসহ স্থানীয় বিশেষ শাসনব্যবস্থার কর্তৃপক্ষের মতামত, সম্মতি ও অধিকারকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন পাহাড় ও আকর্ষণীয় স্থান ইচ্ছেমত দখল করে বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র, রিসোর্ট, হোটেল, মোটেল, বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণ ও পরিচালনা

করে চলেছে। এতে জুম্মরা স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং নিজেদের ভূমি ও ভূখণ্ডের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও জুম্মসহ স্থানীয়দের অধিকার

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির খ খণ্ডের ৩৪ নং ধারায় (চ) উপধারায় 'স্থানীয় পর্যটন'কে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের 'প্রথম তফসিল'-এ পরিষদের কার্যাবলিতে ২৮ নং ধারায় 'স্থানীয় পর্যটন' অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ২২ ধারায় পরিষদের কার্যাবলি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে 'পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন; পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন; উপজাতীয় রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান' ইত্যাদির বিধান করা হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে অন্তর্ভুক্ত হবার পরও প্রায় ১৫ বছর যাবৎ সরকার এই পর্যটন বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করেনি। অবশেষে প্রায় ১৬ বছরের মাথায় গত ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সরকার এই 'স্থানীয় পর্যটন' বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করে। কিন্তু বিষয়টি হস্তান্তর করলেও সরকার এ বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের দায়িত্ব-ক্ষমতা ও কাজের পরিধিতে চুক্তি এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে।

সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চুক্তিপত্রের শিরোনাম লেখা হয়েছে– 'বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থানীয় পর্যটন এবং বর্তমানে উক্ত জেলায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের স্থাপনা/ইউনিটসমূহ বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর চুক্তিপত্র'। উক্ত শিরোনাম পাঠে সহজে বোঝা যায় যে, 'সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলার স্থানীয় পর্যটন এবং জেলায় অবস্থিত পর্যটন কর্পোরেশনের স্থাপনা/ইউনিটসমূহ' পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তির শিরোনাম অনুযায়ী 'পর্যটন কর্পোরেশনের স্থাপনা/ইউনিটসমূহ' জেলা পরিষদে হস্তান্তর করার কথা বলা হলেও 'উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জনবল ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা'র দায়িত্ব-ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর হাতেই ন্যস্ত রয়েছে। অপরদিকে শর্ত (ক)-তে উল্লেখ করা হয়েছে– 'স্থানীয় পর্যটন বিকাশে সরকার বাংলাদেশ কর্পোরেশনের মাধ্যমে বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সঙ্গে সমন্বয় পূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবে' এবং শর্ত (খ)-তে উল্লেখ করা হয়েছে– 'স্থানীয় পর্যটন বিকাশে মাস্টার প্লান অনুযায়ী বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ হোটেল, মোটেল, বিনোদন স্পট, অডিটরিয়াম ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করিতে পারিবে'।

চুক্তি সংশোধন ও বলবৎকরণ এর ক্ষেত্রে (ক) শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে– 'সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসমূহ প্রয়োজনবোধে যৌথভাবে পর্যালোচনা করিবে এবং জনস্বার্থে ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবেন' এবং (খ) শর্তে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে–'চুক্তি বাস্তবায়নে এবং ইহার ব্যাখ্যার ব্যাপারে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবে'।

উল্লেখ্য যে, উক্ত চুক্তিপত্রে কোথাও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর 'পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন' এবং 'পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন' করার এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু উক্ত চুক্তিপত্রে 'স্থানীয় পর্যটন' বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদের সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে এরূপ অসঙ্গতির মধ্যে আঞ্চলিক পরিষদ এর পক্ষে 'স্থানীয় পর্যটন' বিষয়ে তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হবে না।

বস্তুত মূল কর্তৃত্ব কেন্দ্রের হাতে রেখে স্থানীয় পর্যটন বিভাগ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পর্যটন

বিভাগের জনবল, স্থাপনা ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার কর্তৃত্ব কেন্দ্রের হাতে রেখে পর্যটন বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বারবার লিখিত আপত্তি জানানো হলেও সরকার তা বিবেচনায় নেয়নি।

পর্যটন সংক্রান্ত জাতীয় আইন, নীতি ও পরিকল্পনা

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন' গঠন করে এবং ১৯৭৩ সাল থেকে এর কার্যক্রম শুরু করে। এই সংস্থাকে দেশে পর্যটন শিল্প বিকাশ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘের উদ্যোগে 'বিশ্ব পর্যটন সংস্থা' গঠিত হলে বাংলাদেশও এতে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশে অগণতান্ত্রিক ও সামরিক শাসন ক্ষমতাসীন হলে দেশের পর্যটন সম্ভাবনা প্রায় মুখ থুবরে পড়ে এবং এই অবস্থা প্রায় ১৯৯০ সাল অব্যাহত থাকে। জনগণের মধ্যে পর্যটন নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি; পর্যটন সম্পদসমূহ সংরক্ষণ, সুরক্ষা, উন্নয়ন; কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন; বিদেশে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা; জাতীয় সংহতি জোরদারকরণ প্রভৃতি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে সরকার জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ঘোষণা করে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার জাতীয় ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড গঠন করে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে সরকার বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ প্রণয়ন করে। পাশাপাশি সরকার বাংলাদেশ কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন আইন ২০১৯ এবং ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (সংশোধন) আইন ২০২২ প্রণয়ন করে।

উল্লেখিত দলিলের কোনো ক্ষেত্রেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ বাস্তবতা আমলে নেওয়া হয়নি। কোনো কোনোটিতে 'ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী' নামে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পর্যটন শিল্প বিকাশ ও উন্নয়ন এবং তাদের হস্তশিল্প ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্যুভেনির প্রস্তুত ইত্যাদি কথা বলা হলেও তাতে কোথাও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব ও উপকার/বেনিফিট অর্জন, পর্যটন উদ্যোগের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি গ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় পার্বত্য চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা উল্লেখপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা ইত্যাদির কথা উল্লেখ নেই। স্থানীয়/আদিবাসীর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবনধারা, ভূমি অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও যথাযথ বিবেচনায় রেখে পর্যটন শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের কোনো বিধান রাখা হয়নি। ইকো-ট্যুরিজমের কথা বলা হলেও পরিবেশ ক্ষতি না করে কিভাবে ইকো-ট্যুরিজমের উদ্যোগ নেওয়া হবে, পরিবেশ কিভাবে রক্ষা করতে হবে, ইকো-ট্যুরিজম কিভাবে আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-বান্ধব হবে ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো কিছুই উক্ত পর্যটন নীতিতে উল্লেখ নেই।

বরঞ্চ সম্প্রতি সেনাবাহিনী ও বিজিবির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে যত্রতত্র পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, পর্যটনের নামে ইচ্ছেমত ব্যাপক এলাকা জবরদখল এবং গত ১০ আগস্ট ২০১৪ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৫টি পর্যটন স্পট হস্তান্তর ও পর্যটকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি আলামত সরকার কর্তৃক আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের হাতিয়ার হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় এই পর্যটন খাতকে ব্যবহার করার সুস্পষ্ট উদাহরণ বলে অনেকের অভিমত।

উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলি উন্নয়নের যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটিটি রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় প্রাথমিকভাবে ১৫টি স্থান (জীবন নগর, ডিম পাহাড়, নীলগিরি, চিম্বুক পাহাড়, শৈলপ্রপাত, নীলাচল, পর্যটন কমপ্লেক্স, জীবতলি লেইক সাইড রিসোর্ট, আরণ্যক লেকসাইড রিসোর্ট, সুভলং, রিসোর্ট ইসিবি সাজেক, আলুটিলা, বাঘাইহাট, গিরিশোভা) নির্বাচন করে।

বলাবাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটন বিষয়ে যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেখানে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ মূল ভূমিকা গ্রহণ করার কথা সেখানে উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এই প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাকে প্রকৃতপক্ষে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৪২ নং ধারা অনুযায়ী হস্তান্তরিত বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ

কর্তৃক পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার বিধান এর সঙ্গেও আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার এই সিদ্ধান্তসমূহের কোনো সামঞ্জস্য আছে বলে বিবেচনা করা যায় না।

তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি পার্বত্য চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আহূত এক সভায় পর্যটন নিয়ে সরকারের মাস্টার প্লানের (মহাপরিকল্পনা) অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় ৯৬টি পর্যটন স্থান (টুরিস্ট স্পট) চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এইসব স্থানসমূহ আবার আটটি অঞ্চলে ভাগ করা হবে। সরকার তার ইচ্ছেমত তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য একটি ব্যাপক মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। গত ১১ ডিসেম্বর ২০২২ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অধীন প্রথম সাব-কমিটির সপ্তম সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটন বিষয়ে মাস্টার প্ল্যান নিয়ে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি ও মীর মুশতাক আহমেদ রবি ছাড়াও বান্দরবান সেনা রিজিয়নের কম্যান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: জিয়াউল হক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা মারমা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মোহাম্মদ জাবের উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

উন্নয়ন সম্ভাবনা বনাম উন্নয়ন আগ্রাসন

পর্যটন শিল্পের অন্যতম সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে (১) প্রাকৃতিক, (২) সাংস্কৃতিক, (৩) মানবিক ও (৪) পুঁজি ইত্যাদি উপাদানকে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে জলবায়ু বৈচিত্র্যতা, হ্রদ, ঝর্ণা, জলপ্রপাত, বন-জঙ্গল, ফল-ফুল, বন্যপ্রাণী (পশু-পক্ষী-মাছ), পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র সৈকত, গুহা, পাথর-খনিজ, ফসিল ইত্যাদি রয়েছে। সাংস্কৃতিক সম্পদের মধ্যে ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থাপনা ও স্থান, ধর্মীয় স্থান, জাতিগত ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা, পূজা-পার্বণ, উৎসব, ঐতিহ্যগত ক্রীড়া ইত্যাদি এবং মানবিক সম্পদের মধ্যে আদিবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, আচার-ব্যবহার, আপ্যায়ন নৈপুন্যতা, বুনন ও হস্তশিল্প, চারুকলা, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, পালা-গীত, খাদ্যপ্রণালী ইত্যাদিকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যেতে পারে, পর্যটন শিল্প বিকাশের সবকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান রয়েছে। ফলে পার্বত্য চুক্তির পরবর্তী সময়ে পাহাড়ি-বাঙালি স্থানীয় অনেক উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে পর্যটন সহায়ক বিভিন্ন রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন শুরু করে যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে উন্নয়ন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। কিন্তু সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করা, চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন কার্যকর না করা, আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ে সৃষ্ট বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর না করা, চুক্তির আলোকে স্থানীয় পর্যটন বিষয়টি হস্তান্তর এবং পরিচালনা না করার কারণে বর্তমানে পর্যটন বিষয়টি বিশেষ করে সামগ্রিকভাবে জুম্মদের জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র না হয়ে তাদের জাতিগত অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা, বন ও ভূমির উপর তাদের প্রথাগত অধিকার, ঐতিহ্যবাহী জীবন-জীবিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে সরকার কর্তৃক চুক্তির শর্ত বরখেলাপ এবং সরাসরি সামরিক বাহিনী ও বহিরাগত গোষ্ঠী কর্তৃক পর্যটন বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ লাভ করায় এই উদ্বেগজনক বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে।

পর্যটন কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত ভূমিগুলো হচ্ছে জুম্মদের মৌজা ও জুমভূমি যেখানে আদিবাসীরা বংশপরম্পরায় প্রথাগতভাবে জুম চাষ ও বাগান-বাগিচা সৃষ্টি করে আসছে। বন, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং এসব এলাকায় জুম চাষ, বাগান-বাগিচা গড়ে তোলা, মৌসুমী ক্ষেত-খামারে জুম্মদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জুম্মদের জীবন-জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা, তাদের বাস্তুভিটা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য বিপন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য।

আদিবাসী জুম্মদের ভূমি বেদখল, উচ্ছেদ ও ক্ষতিগ্রস্ত করে নির্মিত ও নির্মাণাধীন পর্যটন কেন্দ্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নিম্নরূপ:

নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র

সেনাবাহিনীর ব্যবসায়িক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান 'সেনা কল্যাণ ট্রাস্ট' বান্দরবানের ওয়াইজংশন, চিম্বুক চূড়া এলাকা, কাপ্রু পাড়া এলাকায় নীলগিরি নাম দিয়ে ভূমি দখল করে। সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত বান্দরবানের 'নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র' এর জন্য দলিল অনুযায়ী নির্ধারিত জায়গার পরিমাণ ১৬ একর। কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ, বাস্তবে এই পর্যটন কেন্দ্রের দখলে রয়েছে অন্তত ৬০ একর ভূমি। আরও অভিযোগ রয়েছে, সেনাবাহিনী কর্তৃক রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, শপিং সেন্টার ইত্যাদি স্থাপনের জন্য চিম্বুক পাহাড়ের ডলা ম্রো পাড়া (জীবন নগর), কাপ্রু ম্রো পাড়া (নীলগিরি), চিম্বুক ষোল মাইল, ওয়াই জংশন (১২ মাইল),

রুমার কেওক্রাডং পাহাড়ের কেওক্রাডং চুড়া ইত্যাদি এলাকায় বসবাসরত হতদরিদ্র ও সার্বিকভাবে অনগ্রসর জুম্মদের বিপুল পরিমাণ জুমভূমি বেদখলের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এসমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে যুগযুগ ধরে এই এলাকার ম্রো ও মারমা জনগোষ্ঠীর ৬টি গ্রামের প্রায় ২০০ পরিবার ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। একইভাবে একই চিম্বুক রেঞ্জ আলীকদম লামা সড়কের ক্রাউডং পাহাড়ে ২১ কিলোমিটার থেকে ২৬ কিলোমিটারে প্রায় ৬ কিলোমিটার এলাকা সেনাবাহিনী সংরক্ষিত এলাকা সাইনবোর্ড দিয়ে রেখেছে। সেখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ১৯৮০ এর দশকে অশান্ত পরিস্থিতির সময় ঐ এলাকায় উচ্ছেদ কুলিং ম্রো পাড়াটির পুনঃস্থাপনেও বাঁধা দেওয়া হচ্ছে।

আরো জানা গেছে, চিম্বুক পাহাড়ের কাপ্রু ম্রো পাড়া এলাকায় বিলাসবহুল নীলগিরি অবকাশ যাপন কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য স্থাপিত নীলগিরি সেনাক্যাম্পের কর্তৃপক্ষ ও বান্দরবানের ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের কর্মকর্তারা কাপ্রু ম্রো পাড়ার নীলগিরি হতে জীবন নগর পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে স্থানীয়দের কোনো প্রকার উদ্যান বাগান ও অন্যান্য কাজ করতে দিচ্ছেন না। সেই বিশাল ভূমি (আনুমানিক ৬০০ একর) সেনাবাহিনীর নামে নেওয়া হয়েছে বলে সেনা কর্মকর্তারা দাবি করছেন।

চিম্বুক পাহাড়ে পাঁচতারা হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ প্রকল্প

স্থানীয় জুম্মদের ক্ষতিগ্রস্ত করে নির্মাণাধীন সাম্প্রতিককালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত পর্যটন স্থাপনা হচ্ছে বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড় এলাকার বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ প্রকল্প। এটি নির্মিত হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেনাবাহিনী ও বিতর্কিত সিকদার গ্রুপ (আরএন্ডআর হোল্ডিংস) এর যৌথ বিনিয়োগে নির্মাণাধীন একটি বিলাসবহুল প্রকল্প।

আদিবাসী ম্রো অধ্যুষিত এই এলাকার স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, এই প্রকল্পের ফলে ম্রোদের আনুমানিক ১০০০ একর ভোগদখলীয় ও চাষের ভূমি বেদখল হওয়ার আশংকা রয়েছে। যার ফলে আমাদের ৬টি পাড়া সরাসরি উচ্ছেদের মুখে পড়বে এবং ১১৬টি পাড়ার আনুমানিক ১০ হাজার বাসিন্দার ঐতিহ্যবাহী জীবিকা, চাষের ভূমি, ফলজ বাগান, পবিত্র জায়গা, শশ্মান ঘাট ও পানির উৎসগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া ম্রোদের সংরক্ষিত পাড়াবন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য অচিরেই ধ্বংস হবে।

এ পর্যন্ত ম্রো সম্প্রদায়ের জনগণ উক্ত প্রকল্প বাতিলের দাবিতে চিম্বুক থেকে বান্দরবান সদর পর্যন্ত লংমার্চসহ বহুবার মিছিল, সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছেন এবং সরকারের সকল স্তরের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। ম্রোদের এই ন্যায্য দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে তিন পার্বত্য জেলার অন্যান্য জুম্মরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করেছেন। এই দাবি ও আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাগরিক সমাজের উদ্যোগে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গত ২ নভেম্বর ২০২২ এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন (সিএইচটি কমিশন) বান্দরবানের পার্বত্য জেলায় সেনাবাহিনী ও সিকদার গ্রুপ কর্তৃক আটটি গ্রামের আদিবাসী ম্রো জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদের মুখে ঠেলে দিয়ে ফাইভ-স্টার (পাঁচ তারকা) হোটেল নির্মাণের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং অবিলম্বে উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পটি বাতিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যেকোনো পর্যটন প্রকল্পের জন্য স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির ভিত্তিতে সমাজের জন্য অধিকতর উদ্বেগমুক্ত স্থান নির্বাচনের আহ্বান জানায়। কমিশন উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১০৭ এবং আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রসহ ইহার আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতাসমূহ শ্রদ্ধা করতে বাংলাদেশ বাধ্য। এইসব মানবাধিকার আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীসমূহকে তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ব্যতিরেকে তাদের ভূমি থেকে অপসারণ করা যাবে না।

গত ১৮ নভেম্বর ২০২০ আদিবাসী ম্রোদের জায়গা-জমি দখল ও উচ্ছেদ করে সিকদার গ্রুপ এবং সেনা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক যৌথভাবে পাঁচ তারকা হোটেল ও পর্যটন স্থাপনা নির্মাণের উদ্যোগে হিউম্যান রাইটস্ ফোরাম বাংলাদেশ উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানায় এবং অবিলম্বে উক্ত পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ বন্ধ এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার দাবি জানায়। তারা 'এটা বাংলাদেশের সংবিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির লঙ্ঘন' বলে উল্লেখ করে।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ জেনেভায় জাতিসংঘের ৮ জন বিশেষজ্ঞ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিতর্কিত উক্ত পর্যটন রিসোর্ট বন্ধ করার আহ্বান। তারা বলেন, বাংলাদেশের উচিত পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃহদাকারের পর্যটন রিসোর্ট নির্মাণ বাতিল করা। কারণ ইহা আদিবাসী ম্রো জাতিগোষ্ঠীকে তাদের ঐতিহ্যগত

ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতির হুমকি সৃষ্টি করছে। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরেও কয়েকজন জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ একটি যৌথ বার্তায় বাংলাদেশ সরকার এবং আরএন্ডআর হোল্ডিংস লিমিটেড ও ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের নিকট তাদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন বলে জানা যায়।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ দেশের ৫৯ জন বিশিষ্ট নাগরিক চিম্বুক পাহাড়ে আদিবাসী ম্রোদের ভূমিতে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ বন্ধের দাবি জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সেনাপ্রধান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চিঠি প্রেরণ করেন।

গত ২ মার্চ ২০২১ ঢাকার শাহবাগে ম্রোদের দাবির পক্ষে এবং চিম্বুকে পাঁচতারকা হোটেল ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণের নামে ম্রো আবাসভূমি বেদখলের প্রতিবাদে দেশের প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, উন্নয়ন সংস্থা, আদিবাসী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এর উদ্যোগে সংহতি সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

জানা গেছে, এ পর্যন্ত জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব চিম্বুক পাহাড়ে ফাইভ স্টার হোটেল ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশ সরকারের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু এরপরও সেনাবাহিনী ও সিকদার গ্রুপ তাদের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, ইতোমধ্যে সেখানে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহ লাইন, অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের রাস্তা নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। আর ওই পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ভেতরে প্রবেশ এবং এর পাশ দিয়ে বা আশেপাশে ম্রোরাসহ সাধারণ মানুষের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জানা গেছে, উক্ত এলাকায় এখন সবসময় সেনা সদস্য মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। কোনো জুম্ম সেদিকে চলাচল করলেই তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে।

ডিম পাহাড় পর্যটন কেন্দ্র

আলিকদম-থানচি সড়কে কথিত 'ডিমপাহাড়' এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। রংরাং (ক্রাউডং) পাহাড়ের উপর দিয়ে অতি সম্প্রতি সেনাবাহিনী আলিকদম-থানচি আন্তঃউপজেলা সড়ক নির্মাণ শেষ করেছে। প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ জুলাই ২০১৫ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ সড়কটি উদ্বোধন করেন। বর্তমানে সেনাবাহিনী আলিকদম-থানচি সড়কের ডিম পাহাড়ের প্রায় ৬/৭ কিলোমিটার ব্যাপী এলাকায় 'সংরক্ষিত প্রশিক্ষণ এলাকা' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। এই পাহাড়কে চাকমারা 'রংরাং' আর মারমারা 'ক্রাউডং' নামে ডাকে। মারমাদের 'ক্রাউ' অর্থ ডিম আর 'ডং' অর্থ পাহাড়। 'ক্রাউডং'কে বাংলা অনুবাদ করে সেনাবাহিনী এ পাহাড়কে 'ডিম পাহাড়' নামে বাঙালিকরণ করেছে। আলিকদম উপজেলার সাঙ্গু মৌজা ও তৈনফা মৌজা এবং থানচি উপজেলার নাইক্ষ্যং মৌজার সর্বসাকুল্যে ৫০০ একর জায়গা এই পর্যটন পরিকল্পনার আওতায় নেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। এই এলাকায় ম্রো জনগোষ্ঠীর ১২টি গ্রামের ২০২ পরিবার এই পর্যটন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জানা গেছে, বান্দরবান জেলার আলিকদম-থানচি মধ্যবর্তী পাহাড়ি এলাকায় ১৫০টি পরিবারের অন্তত ৫০০ জন লোক নিরাপত্তাতার অভাবে মায়ানমারে দেশান্তরিত হয়েছে।

অনিন্দ্য পর্যটন কেন্দ্র

এছাড়া রুমা উপজেলায় আদিবাসী বম জনগণকে উচ্ছেদ করে স্থাপন করা হয়েছে অনিন্দ্য পর্যটন কেন্দ্র। এই উপজেলার সেপ্রু মৌজাধীন কথিত জীবননগর নামক এলাকায় ৫০০ একর মতো পাহাড়ভূমি সেনাবাহিনী দখলে রেখেছে। এতে তিনটি গ্রামের কমপক্ষে ১২৯ পরিবার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

সাজেক পর্যটন কেন্দ্র

সেনাবাহিনী ও বিজিবির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলার অন্যতম পাহাড়ি ও জুম্ম অধ্যুষিত এলাকা সাজেক পাহাড়ে রুইলুই ভ্যালিতে নির্মাণ করা হয়েছে বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র। বলা হচ্ছে, এই পর্যটন কেন্দ্র দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। এজন্য সেনাবাহিনী ও বিজিবির উদ্যোগে নির্মাণ করা হয়েছে বিলাসবহুল কটেজ, সুদৃশ্য সড়কসহ বিভিন্ন ব্যয়বহুল অবকাঠামো। জানা যায়, কোটি টাকা ব্যয়ে সেনাবাহিনীর তৈরি কটেজের নাম দেওয়া হয় থ্রিস্টার কটেজ আর বিজিবির তৈরি কটেজের নাম দেওয়া হয় রুনময়। এই পর্যটন কেন্দ্রের ফলে ইতিমধ্যে পাঁচটি পরিবার উচ্ছেদ করা হয় এবং সেনাবাহিনী তাদের জন্য টিনের বেড়া দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করে দেয় বলে জানা যায়। চিড়িয়াখানার মতো পর্যটকদের দেখার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে। এই পর্যটন কেন্দ্রের ফলে সন্নিকটস্থ দু'টি গ্রামের আরো ৬৫টি জুম্ম পরিবার উচ্ছেদের শিকারে পরিণত হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া এই পর্যটন কেন্দ্রের ফলে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও জনসমাগমের প্রেক্ষিতে সাজেকের বনজ সম্পদ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপর ইতিমধ্যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হতে শুরু করেছে বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিযোগ।

অপরদিকে, সাম্প্রতিককালে সেখানে কোটি টাকা খরচ করে একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, যা সাজেকের মতো জুম্ম অধ্যুষিত এলাকায় এই ধরনের মসজিদ নির্মাণ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ইসলামিকরণের সামিল বলে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সীমান্ত সড়ক সংলগ্ন আকর্ষণীয় স্থানগুলো পর্যটনের জন্য জবরদখল

বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃক ৩৮৬০.৮২ কোটি টাকা ব্যায়ে ১ম পর্যায়ে সীমান্ত সড়ক ও সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং স্থানীয় জনগণ ও নেতৃত্বের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ছাড়াই শত শত জুম্ম পরিবারের শত শত একরের জুমভূমি, মূল্যবান ফলজ ও বনজ বাগান-বাগিচা, বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করা হচ্ছে এবং হচ্ছে। এতে শুধু সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে না, বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন সেনা ও বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে এবং সীমান্ত সড়কের পাশে যেখানে আকর্ষণীয় ও পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থান মনে করছে সেখানেই সেনাবাহিনী ও বিজিবি 'সংরক্ষিত এলাকা' ঘোষণা করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিচ্ছে বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেনাবাহিনী কোনো কোনো স্থানে সীমান্ত সড়কের অতিরিক্ত জায়গায়ও সাইনবোর্ড টাঙিয়ে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করছে ব্যাপক পর্যটন ব্যবসার উদ্দেশ্য নিয়ে। যেমন- পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই রাঙামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের সীমান্ত সংযোগ সড়ক সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকার জুম্ম অধ্যুষিত গাছবান গ্রামটি উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছে। ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বিলাইছড়ি-বরকল এলাকার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শনে গেলে তিনিই উক্ত ৯ জুম্ম পরিবারকে তাদের আবাসস্থল থেকে উঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান বলে জানান গাছবান সেনা ক্যাম্পের ২৬ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর এর ক্যাপ্টেন মারুফ।

সেনাবাহিনীর চাপে ইতোমধ্যে উক্ত গ্রামের ২৬ পরিবারের মধ্যে ১৭ পরিবার অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং বাকি ৯ পরিবারকেও সেনাবাহিনী কর্তৃক সেখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়ছে। অপরদিকে জুম্মদের উচ্ছেদ করা হলেও সড়কের পাশে নতুন সেনা ক্যাম্প এবং বড় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। গত ১ মার্চ ২০২৩ দুপুর আনুমানিক ১২:০০ টার দিকে সেনাবাহিনীর ৩৪ বীর বেঙ্গলের গাছবান সেনা ক্যাম্পের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আহমেদ ও ওয়ারেন্ট অফিসার গোবিন্দের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল গাছবান গ্রামে গিয়ে চিবুক্যে চাকমা ও বসু চাকমা নামে দুই জুম্ম গ্রামবাসীর দুটি দোকান ভেঙে দেয়। উক্ত ঘটনার পর সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আহমেদ আরও দুই সেনা সদস্য সঙ্গে নিয়ে বাত্যে লাল চাকমার গ্রামবাসীর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

গাছবান সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা জুম্ম গ্রামবাসীদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ওই ৯ পরিবারকে জুম চাষেও নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। সেনা সদস্যরা তাদের ট্রাক্টর দিয়ে মাটি কেটে এনে জুমের জন্য নির্ধারিত জায়গার উপর সেই মাটি ঢেলে দিয়েছে। এতে চার পরিবারের জুমচাষ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গাছবান ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মারুফ গ্রামে গিয়ে গ্রামের কেউ জুমে আগুন দিতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়ে আসেন। ক্যাপ্টেন মারুফ আরও বলেন, 'এখানে আমি তিনমাস থাকবো, দেখবো তোমরা কিভাবে জুমে আগুন দাও।' তারপর তিনি গ্রামবাসীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ গাছবান সেনা ক্যাম্পের ২৬ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর এর ক্যাপ্টেন মারুফ ও সুবেদার মো: আহম্মেদ ফারুয়া ইউনিয়নের গাছবান পাড়া এলাকার কার্বারি (গ্রাম প্রধান) সহ ৯ জুম্ম পরিবারকে নিয়ে এক সভা ডেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিজেদের বাড়িঘর ও জিনিসপত্র নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সেনাবাহিনী সীমান্ত সড়ক নির্মাণের নামে জুম্মদের ধনসম্পদ ধ্বংসসহ স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করছে এবং পর্যটন ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় জায়গাগুলো নিজেদের দখলে নিচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় সংরক্ষিত এলাকা বা সেনাবাহিনীর জায়গা বলে সাইনবোর্ডও স্থাপন করছে।

পর্যটন নিয়ে জুম্ম নাগরিক মতামত

মানবাধিকার কর্মী ও ব্লগার জন ত্রিপুরা তার এক লেখায় উল্লেখ করেন, বাংলাদেশি সামরিক বাহিনী জুম্ম আদিবাসীদের জমি 'ট্যুরিজম' উন্নয়নের নামে দখল করে নিয়েছে। সেনাবাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন এবং রাষ্ট্রীয় যন্ত্রাদিগুলি আদিবাসী স্থান ও স্থানীয় এলাকাগুলির নাম ইসলামি ও বাঙালি নামে পরিবর্তন করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'কুরুডং' নামের স্থানটি 'ডিম পাহাড়' নামে নামকরণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিলগিরি পর্যটন স্থান এর জন্য প্রায় ৬০০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। এছাড়া, চন্দ্র পাহাড় অঞ্চলে তাদের ৫০০ একর জমিরও বেশি জমি রয়েছে। এটি রিপোর্ট করা হয়েছে যে, প্রায় ৫০০ সদস্যের অবাঙালি (জুম্ম) জাতিসত্তার প্রায় ১৫০ জন সদস্যই বান্দরবানের আলিকদম ও থানচি এলাকা থেকে মায়ানমারে চলে গেছে, কারণ তারা তাদের জীবনযাত্রার

জায়গায় ক্রমবর্ধমান অনিশ্চিত মনে করে। তিনি আরও বলেন, বান্দরবান জেলা প্রশাসন বান্দরবান সদরের টাইগারপাড়ার নিকটবর্তী নিলাচল পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। নীলাচল পর্যটন কেন্দ্র আদিবাসী জনগণের ঐতিহ্যবাহী জুমভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত পর্যটন কেন্দ্র আদিবাসী মানুষের ঐতিহ্যবাহী জমিতে প্রতিষ্ঠিত করা হলেও জুম্ম গ্রামবাসী এই পর্যটন কেন্দ্র থেকে সুফলের কোনো অংশ পাচ্ছে না। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধনী) আইন ১৯৮৯ লঙ্ঘন করে, জেলা প্রশাসন এই কেন্দ্রটি চালাচ্ছে।

২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে সমকালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মংসানু চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটনশিল্প গড়ে উঠুক, এটা আমরাও চাই। সেটা কীভাবে গড়ে উঠবে, কোন প্রক্রিয়ায় হবে, এই পর্যটন শিল্পের ফলে স্থানীয়রা কতটুকু লাভবান হবে তা বিবেচনায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকায় পর্যটন হতে হবে সেখানকার পরিবেশ ও জনবান্ধব।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি জোয়াল লিয়ান বম বলেন, পার্বত্যাঞ্চলে যেসব পর্যটন গড়ে উঠেছে তা প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করে গড়ে উঠেছে। পর্যটকরা আসেন পাহাড়ের সৌন্দর্যের সঙ্গে এখানকার আদিবাসীদের সংস্কৃতি দেখতে। তাই আমাদের নীতি হতে হবে পর্যটনের নামে আদিবাসীদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ধ্বংস করা চলবে না। পর্যটনের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়দের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক পর্যটন উন্নয়নের বিরোধিতা করে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, পর্যটন বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন। জেলা পরিষদের এখতিয়ারকে উপেক্ষা করে পর্যটন করা চলবে না। জুম্মদের জায়গা-জমির ওপর পর্যটন স্পট, রিসোর্ট, মোটেল নির্মাণে সিদ্ধহস্ত তারা। তার দাবি, সাজেকে পর্যটন গড়তে গিয়ে রুইলুই এলাকার দুটি গ্রামের ৬৫টি জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মঙ্গল কুমার চাকমা ও সজীব চাকমা কর্তৃক লিখিত 'আদিবাসী অঞ্চলে পর্যটন ও উন্নয়ন: আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা' এক প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম গণতান্ত্রিক নীতি হচ্ছে স্থানীয় জনগণের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি গ্রহণ। অথচ বাংলাদেশ সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক হিসেবে দাবি করলেও, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার হওয়া সত্ত্বেও, সর্বোপরি আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্বাচনী অঙ্গীকার করলেও এই সরকার দেশের আদিবাসীদের অধিকারকে পদদলিত করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মতামতকে উপেক্ষা করে আদিবাসীদের জাতিগত অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির পরিপন্থীমূলক পর্যটন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে যা কখনোই গণমুখী বলে বিবেচিত হতে পারে না।

তারা এতে আরও বলেন, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পর্যটন শিল্প সংক্রান্ত যে কোনো কার্যক্রম হওয়া উচিত আদিবাসীদের বিশেষ প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি ও জীবনধারা, ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও বিশেষ আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের জাতিগত বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে এ জাতীয় কোনো পর্যটন কর্মকাণ্ড বা উদ্যোগ যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈচিত্রময় প্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন যে কোনো পর্যটন ভাবনা বা কর্মকাণ্ড মানবিক চেতনার পরিচায়ক হতে পারে না। কিছু কিছু মহল রয়েছে যারা আদিবাসীদের প্রকৃত সমস্যা ও তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারাকে বিবেচনায় আনেন না। ফলে পর্যটন নিয়ে এখানে প্রায়ই যা করা হচ্ছে, তা সুষম উন্নয়ন তো নয়ই, বরং তা বৈষম্যমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বর্তমানে উন্নত দেশে বিশেষত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানীয় জনগণের অধিকার, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়ে এবং ভূ-প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় জনগণ, বন ও পরিবেশ বান্ধব 'ইকো-ট্যুরিজম' এর কথা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পর্যটনের ক্ষেত্রেও ইকো-ট্যুরিজমকে প্রাধান্য দিতে হবে। বস্তুত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পর্যটন হতে হবে আদিবাসী জনগণের অংশদারিত্বের ভিত্তিতে ও তাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ২০২৩ সালের (জানুয়ারি-জুন) অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ও ভঙ্গুর অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দীর্ঘ ২৫ বছরেও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকার একনাগাড়ে সাড়ে ১৪ বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও সরকার কর্তৃক ২০১৪ সাল থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা, উপরন্তু একের পর এক চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত শ্বাসরুদ্ধকর ও বিস্ফোরন্মুখ। বলতে গেলে, চুক্তির পূর্ববর্তী সময়ের মতোই বর্তমানেও জুম্মদের উপর একপ্রকার অবাধে চলছে আগ্রাসন, ভূমি বেদখল, স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ, সামরিক দমন-পীড়ন-অভিযান, হত্যা, গুম, মিথ্যা মামলা ও জেল-জুলুম, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, অনুপ্রবেশ, জুম্মদের সংখ্যালঘুকরণ, সাম্প্রদায়িক হামলা, নারীর উপর সহিংসতা ইত্যাদি মানবতাবিরোধী ও জুম্মদের জাতিগতভাবে বিলুপ্তকরণের প্রক্রিয়া।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে জুম্মসহ স্থায়ী অধিবাসীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণ, সকল অস্থায়ী সামরিক ক্যাম্প প্রত্যাহারসহ 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসনের অবসান, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব ভূমিতে পুনর্বাসন, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান, বিশেষ শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল উন্নয়ন সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করার কথা থাকলেও সেখানে এর কোনো কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি।

সম্প্রতি ১৭-২৮ এপ্রিল ২০২৩, নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরামের ২২তম অধিবেশনে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা 'চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে জাতিসংঘের মতো বিশ্ব ফোরামে অসত্য তথ্য তুলে ধরেছিলেন। অথচ চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে, যা বিভিন্ন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ফলাফলেও উঠে এসেছে। ফলে চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহসহ এখনো চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা হয় আংশিক বাস্তবায়িত নয়তো সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার ও জনসংহতি সমিতি এই ব্যবধান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে নিরসন করা যেতে পারে বলে বিবেচনা করা যায়। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরামের উক্ত অধিবেশনের গৃহীত রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পার্মানেন্ট ফোরামের উক্ত আহ্বানে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার এখনো কোনো সাড়া প্রদান করেনি। অথচ জাতিসংঘের এ ধরনের আহ্বানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সরকারের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

গত ৯ মার্চ ২০২৩ কুয়াকাটায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী সভাগুলির মতো ৭ম সভায় দেখা গেছে, চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়নের কোনো অগ্রগতি নেই। ফলে সরকারের অসহযোগিতা ও গড়িমসির কারণে বর্তমানে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিও অথর্ব সংস্থায় পরিণত হতে বসেছে।

সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনী পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সকল স্তরের নেতাকর্মীসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জুম্ম জনগণকে 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত', 'চাঁদাবাজ' ইত্যাদি তকমা দিয়ে অপরাধীকরণ করছে। তারই অংশ হিসেবে জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত অধিকারকর্মী ও জনগণকে সুপরিকল্পিতভাবে অবৈধ গ্রেফতার, বিচার-বহির্ভূত হত্যা, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে আটক, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণ, ওয়ারেন্ট ছাড়া ঘরবাড়ি তল্লাশি ও

ঘরবাড়ির জিনিসপত্র তছনছ, মারধর, হয়রানি ইত্যাদি ফ্যাসিবাদী ও মানবাধিকার বিরোধী কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। অপরদিকে সরকার, বিশেষ করে সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআইসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক জুম্মদের মধ্য থেকে সুবিধাবাদী, তাঁবেদার ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের দিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাদেরকে চুক্তির পক্ষের জনগণ ও চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনী একদিকে এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে লালন-পালন করে ও মদদ দিয়ে এলাকায় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে, অপরদিকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাসী দমনের নামে জনসংহতি সমিতিসহ জুম্ম জনগণের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে ও সন্ত্রাসী তৎপরতার দায়ভার জনসংহতি সমিতির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

শুধু তাই নয়, সরকার ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী নিজেরাই উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নামে সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ, বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, নতুন নতুন সেনা, বিজিবি ও এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপন ও ক্যাম্প সম্প্রসারণ, রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, অস্থানীয়দের নিকট জুম্মদের প্রথাগত জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি ইজারা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদের প্রথাগত ভূমি বেদখল করে তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করছে ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে এবং এলাকার জীব-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক ধ্বংসসাধন করছে। চুক্তি অনুযায়ী যেখানে জুম্মদের চিরায়ত ভূমি ও ভূখণ্ডের অধিকার নিশ্চিত হওয়ার কথা সেখানে তারা প্রতিনিয়ত চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী এসব উন্নয়ন আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় জুম্ম জনগণের মানবাধিকারসহ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার আজ ক্রমাগত পদদলিত করা হচ্ছে এবং তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চরম হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। জুম্মদের স্বাভাবিক জীবনধারা আজ প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

২০২৩ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যুদের দ্বারা ১১৩টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে এবং এসব ঘটনায় ১,৩৫৭ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়, ৮০টি বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের শিকার হয় এবং এলজিইডি কর্তৃক ৩০ পরিবারের ফসলি জমি নষ্ট করা হয়।

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

২০২৩ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১১৩টি ঘটনার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ৬০টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৩১১ জন মানবাধিকার শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ১৮ জনকে গ্রেফতার, ১৫ জনকে সাময়িক আটক, ১২২ জনকে মারধর ও আহত, মিথ্যা মামলার শিকার ৪০ জন, ২৭টি গ্রামে সামরিক অভিযান পরিচালনা, ১০০ জনের অধিক নিরস্ত্র ও নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে কেএনএফের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সময় মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার, ১৭ পরিবারকে উচ্ছেদ ও ৯ পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি, ২টি নতুন ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেয়া গেল-

এসব ঘটনাবলীর অন্যতম হচ্ছে ২১ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১৬ দিনব্যাপী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিলাইছড়ির পার্শ্ববর্তী জুরাছড়ি উপজেলার ১৩টি গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় এক হয়রানিমূলক সামরিক অভিযান পরিচালনা করার ঘটনা। এই অভিযানে সেনা সদস্যরা স্থানীয় জুম্মদের ব্যাপক হয়রানি, বাড়িতে তল্লাশিসহ, বিনামূল্যে ইচ্ছেমত জুম্মদের গৃহপালিত গরু, ছাগল, মোরগ-মুরগি ও চাল ভোজন করে।

অন্যদিকে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কর্তৃক গত ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ক্রোকের আদেশ দেখিয়ে মিথ্যা মামলার শিকার জনসংহতি সমিতির স্থানীয় চারজন কর্মী পরিবার থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উক্ত ওসি চার পরিবারের কাছ থেকে মোট ৬১ হাজার টাকা আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সেনাবাহিনীর রাঙ্গামাটি জেলাধীন ফারুয়া ইউনিয়নস্থ গাছবান সেনা ক্যাম্পের ২৬ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর-এর ক্যাপ্টেন মারুফ ও সুবেদার মো: আহম্মেদ ফারুয়া ইউনিয়নের গাছবান পাড়া এলাকার কার্বারিসহ (গ্রাম প্রধান) এক সভা ডেকে ৯ জুম্ম পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে নিজেদের বাড়িঘর ও জিনিসপত্র নিয়ে স্ব স্ব আবাসস্থল থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বিলাইছড়ি-বরকল এলাকার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শনে গেলে উক্ত জায়গায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনিই উক্ত গ্রামের ৯

জুম্ম পরিবারকে তাদের আবাসস্থল থেকে উঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান বলে জানান ক্যাপ্টেন মারুফ।

বান্দরবানের জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) দুই নেতা গত ১৫ মার্চ ২০২৩ সন্ধ্যা ৭:৩০ টার দিকে জেল থেকে বের হওয়ার পরপরই সেনাবহিনী কর্তৃক জেলগেট থেকে আবার গ্রেপ্তারের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী দুই ছাত্রনেতা হলেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি থুইমং প্রু মারমা (টিএম প্রু মারমা) ও কেন্দ্রীয় সদস্য থুইনুমং মারমা।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক জোরপূর্বক রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নে শিজকমুখ সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে নির্মিত সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের অবশেষে গত ২৫ মার্চ ২০২৩ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। তবে, সেনাবাহিনী সেনা ক্যাম্পের জায়গাটি বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটির কাউকে বুঝিয়ে না দিয়ে ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের অধীনে শিজক মুখ বিজিবি ক্যাম্পের নিকট হস্তান্তর করেছে বলে জানা যায়।

এপ্রিল মাসে লংগদু উপজেলার ৪নং বগাচতর ইউনিয়নের অন্তর্গত চিবেরেগা এলাকার আদিবাসীদের ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে 'নোয়ারাম সাহিত্য সংসদ'-এর একটি শাখা কার্যালয় নির্মাণে বিজিবি, রাজনগর জোন, গুলশাখালী, লংগদু এর নিয়ন্ত্রণাধীন 'চাল্যাতুলি ক্যাম্প' কম্যান্ডার কার্যালয়টি নির্মাণ না করার জন্য বাধা সৃষ্টি করে।

গত ২ এপ্রিল ২০২৩ কক্সবাজার ব্যাটেলিয়ন (৩৪ বিজিবি) কর্তৃক গরু পাচারের মিথ্যা অভিযোগ এনে একজন তঞ্চঙ্গ্যা নারীকে আটকসহ গ্রামবাসীদেরকে পাইকারিভাবে মারধরের পর উল্টো বিজিবির পক্ষ থেকে জেসিও ৯৭৪৯ বিএম রেজাউল করিম বাদী হয়ে ৯ জন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীসহ অজ্ঞাতানামা ৩০-৪০ জনের বিরুদ্ধে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় এক মিথ্যা মামলা দায়ের করেন।

গত ১৬ মে ২০২৩ কেএনএফের এ্যাম্বুশে পড়ে সেনাবাহিনীর দুইজন জওয়ান নিহত ও তিনজন আহত হওয়ার পর রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সেনাবাহিনী গণহারে সাধারণ জুম্ম গ্রামবাসীকে পোর্টার হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে এবং সশস্ত্র সংঘর্ষে তাদেরকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ জনের অধিক জুম্মকে সেনাবাহিনী পোর্টার হিসেবে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

২০২৩ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১১৩টি ঘটনার মধ্যে সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক ২৯টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ১,০৩০ জন ও ২৩টি গ্রামের অধিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ১৫ জনকে হত্যা, ৬ জনকে মারধর, ১১ জনকে অপহরণ, ২২ জনকে আটক, ২ জনকে আটক করার পর পুলিশের কাছে সোপর্দ, ১৯৫ বম ও মারমা পরিবারের প্রায় এক হাজার গ্রামবাসী উচ্ছেদ (গ্রাম ছাড়া) এবং ১৭টি গ্রামের অধিবাসীদের নানা ধরনের হয়রানি ও উচ্ছেদের হুমকি প্রদান ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিম্নে দেয়া গেল–

গত ১১ জানুয়ারি ২০২৩ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের থলিপাড়া থেকে সেনাবাহিনী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা মিলে এক নিরীহ জুম্মকে আটক করে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে পুলিশের নিকট হস্তান্তরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৮ জানুয়ারি বমপার্টির ভয়ে পাইন্দু ইউনিয়নের মুয়ালপি পাড়া থেকে কমপক্ষে ৪৫ পরিবারের ১৭০ জন মারমা গ্রামবাসী উচ্ছেদ হয়ে রুমা সদরে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া প্রাংসা পাড়া, ইলি চান্দা পাড়া, ক্যকটাই পাড়া, ক্রোংক্ষ্যং পাড়াসহ রুমার প্রায় ১২টি পাড়ার লোকজন ৩দিন ধরে আতঙ্কে নিজেদের গ্রাম ছেড়ে পাশ্ববর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারাম এলাকার ১০টি গ্রামের জুম্ম অধিবাসীদের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা যায়, গত ৩ মে ২০২৩ গঙ্গারাম এলাকার উক্ত ১০ গ্রামের মুরুব্বিদের নিয়ে ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসীরা বাঘাইহাট এলাকার করল্যাছড়ি নামক স্থানে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে এই হুমকি দেয়।

সেনা মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনা হচ্ছে গত ৬ এপ্রিল ২০২৩ রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের খামতাং পাড়ায় সেনাবাহিনীর নির্দেশে সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) কর্তৃক ৮ জন বম গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা। এরপর ৮ মে ২০২৩ রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের পাইক্ষ্যং পাড়ার রিজার্ভ এলাকায় সেনামদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা ব্রাশ ফায়ার করলে ঘটনাস্থলেই বম সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি নিহত এবং অপর একজন আহত হয়।

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল

২০২৩ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১১৩টি ঘটনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যু কর্তৃক ১২টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ১৮টি পরিবার ও ৯৫ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ২ জনকে হত্যা, একজনকে মারধর, ২ জন জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি জবরদখল এবং ১৮টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা গেল–

ভূমিদস্যু ও লিজ কোম্পানী 'লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' কর্তৃক লামা উপেজেলার সরই ইউনিয়নের রেংয়েন কার্বারী পাড়ায় গত ২ জানুয়ারি রাত ১:০০ ঘটিকায় লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের দায়িত্বরত দেলোয়ার, নুরু ও মহসিনের নেতৃত্বে রাবার বাগানের শ্রমিক ও ৪ ট্রাক বহিরাগত ভাড়াটে লোকসহ প্রায় ১৫০ জনের অধিক বহিরাগত লোক মিলিত হয়ে সরই ইউনিয়নের রেংয়েন কার্বারী পাড়ার ম্রো গ্রামবাসীদের ৯টি ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট চালায়।

উল্লেখ্য যে, গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের লাংকম ম্রো কার্বারি পাড়া, জয়চন্দ্র ত্রিপুরা কার্বারি পাড়া এবং রেংয়েন ম্রো কার্বারি পাড়ার অধিবাসীদের ৩৫০ একর জুম ভূমি, ফলজবাগান ও গ্রামীণ বনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ২৬ এপ্রিল ২০২২ হামলার পর এ যাবৎ কমপক্ষে এক ডজনের অধিক বার হামলা এবং ৪টি ষড়যন্ত্রমূলক সাজানো মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় উল্টো হামলা ও ভূমি জবরদখলের শিকার লাংকম ম্রো ও মথি ত্রিপুরাকে জেলে যেতে হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের তদন্ত টিমসহ দেশের নাগরিক সমাজ সরইয়ের তিন জুম্ম গ্রামবাসীর নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের ভূমি রক্ষার জন্য সুপারিশ করলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে ভূমি বেদখলকারী লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষে ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নে মুসলিম বাঙালি সেটেলার কর্তৃক জোরপূর্বক এক জুম্ম গ্রামবাসীর ফলজ বাগানসহ ভূমি বেদখল করা হয়েছে। বেদখলকৃত উক্ত জায়াগায় বাঙালি সেটেলাররা ইতোমধ্যে একাধিক বাড়িও নির্মাণ করেছে। ভূমি বেদখলের শিকার জুম্ম গ্রামবাসীর নাম প্রাণময় চাকমা (৪২), পীং- অমর কান্তি চাকমা, গ্রাম- পণ্ডিত পাড়া, ভূষণছড়া ইউনিয়ন। প্রায় ৭/৮ বছর পূর্বে ফলজ বাগান সৃজন করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রাণময় চাকমা উক্ত জায়গাটি তার চাচা যতীন চন্দ্র চাকমার কাছ থেকে ক্রয় করেন। ক্রয় করার পরপরই তিনি জায়গাটিতে ফলজ বাগান সৃজন করে এবং বাড়ি নির্মাণ করে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

কিন্তু গত জানুয়ারি মাসে ভূষণছড়া সেটেলার এলাকার বাসিন্দা মো: জাহাঙ্গীর, পীং- সারোয়ার তার দলবল নিয়ে জায়গাটি তার দাবি করে জোরপূর্বক বেদখল করে। জায়গার মূল মালিক প্রাণময় চাকমাসহ জুম্ম প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করলে বেদখলকারী মো: জাহাঙ্গীরও নিজেকে জায়গার মালিক দাবি করে বিভিন্ন ভূয়া দলিল দেখায়। এরপর প্রাণময় চাকমা ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট ভূমি নিয়ে এই বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জানান। ইউপি চেয়ারম্যান এ নিয়ে উভয়পক্ষকে নিয়ে একটি সালিশ এর আয়োজন করেন। এসময় চেয়ারম্যান যে যেখানে আছে সেখানে থাকার নির্দেশ দেন।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

২০২৩ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১১৩টি ঘটনার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষ কর্তৃক নারীর উপর ১২টি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ১১ জন নারী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে একজনকে হত্যা, ৬ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণ, ৩ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা এবং ২ জন নারী ও শিশুকে অপহরণ ও পাচারের চেষ্টার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

বিগত ছয় মাসে ১১ জন আদিবাসী জুম্ম নারী ও শিশু হত্যা, অপহরণ ও যৌন সহিংসতার শিকার হলেও ১২টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ২টি ঘটনার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি ১০টি ঘটনার কমপক্ষে ২৪ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। উল্লেখ্য, এ যাবত জুম্ম নারী ও শিশুর ওপর যত সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তার কোনোটিরই সুষ্ঠু বিচার হয়নি। এই বিচারহীনতার কারণে অপরাধীরা পার পেয়ে বার বার এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। ফলে জুম্ম নারীরা আজ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে চলাফেরা করতে বাধ্য হচ্ছে।

সংবাদ প্রবাহ

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

সাজেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক নতুনজয় কার্বারিকে গ্রেফতার

রাঙামাটির সাজেক ইউনিয়নের কার্বারি এসোসিয়েশনের সভাপতি নতুনজয় কার্বারিকে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক করা হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি ২০২৩ সকাল ৯টার সময় বাজার যাওয়ার পথে উজোবাজার এলাকায় সেনা চেকপোস্টে তাকে আটক করা হয়। এরপর দীর্ঘক্ষণ সেখানে রাখার পর দুপুরে তাকে বাঘাইহাট জোনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জনগণের ব্যাপক চাপের মুখে পরে বিকাল ৪টার দিকে সেনাবাহিনী নতুনজয় কার্বারিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর ১৬ দিনব্যাপী অপারেশন

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১৬ দিনব্যাপী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিলাইছড়ির পার্শ্ববর্তী জুরাছড়ি উপজেলায় এক হয়রানিমূলক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে। এই অভিযানে সেনাবাহিনী জুরাছড়ি উপজেলাধীন ১৩টি গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় টহল ও তল্লাশি অভিযান চালায়। এই অভিযানে সেনা সদস্যরা স্থানীয় জুম্মদের ব্যাপক হয়রানি, বাড়িতে তল্লাশিসহ বিনামূল্যে ইচ্ছেমত জুম্মদের গৃহপালিত গরু, ছাগল, মোরগ-মুরগি ও চাল ভোজন করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, সেনাবাহিনী এ সময় ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধকে শীতের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আটক রাখে এবং স্থানীয় জুম্ম গাছ বাগানের মালিক ও ব্যবসায়ীর ৬,৬১৬টি সেগুন গাছের গুড়ি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জব্দ করে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। সেনা নির্যাতনের ভয়ে গ্রামবাসী অনেকেই তীব্র শীতের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আরো জানা যায়, অভিযানের সময় সেনা সদস্যদের কর্তৃক মৈদুং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বেলতলা ও আমতলা এলাকায় জুম্মদের বাড়িতে ছাগল, মুরগি, যা সামনে পায় তা ইচ্ছেমতো বিনা পয়সায় খেয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া মৈদুং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বেলতলা গ্রামের সত্যবান চাকমা (৫০), ইন্দ্রবান চাকমা (৫৫), বিচ্ছে নাগা চাকমা ও পন্দক চাকমা নামে চার জনের বাড়িতে অবস্থান করে তাদের বাড়ির ধান মেশিনে মাড়াই করে ইচ্ছেমতো খেয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

বিলাইছড়ি ও জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর দিনব্যাপী অপারেশন

গত ১১ জানুয়ারি ২০২৩ সকালে রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় বিলাইছড়ি সেনা জোনের জনৈক লেফটেন্যান্টের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনাদল বিলাইছড়ির ঢেবার মাধা নামক গ্রামে যায়। এই সেনা সদস্যরা তাদের হাতে থাকা একটি মানচিত্র অনুসারে গ্রামের ও আশেপাশের বিভিন্ন রাস্তাগুলিতে ঘোরাফেরা ও পর্যবেক্ষণ করার পর বিলাইছড়ি সেনা জোনে ফিরে যায় বলে জানা যায়।

অপরদিকে প্রায় একই সময়ে সীমান্তবর্তী জুরাছড়ি উপজেলার শীলছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে সেনাবাহিনীর একটি দল বিলাইছড়ির বটতলী মোনে (পাহাড়) এসে বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান গ্রহণ করার পর আবার সেনা ক্যাম্পে চলে যায়। এদিকে বিলাইছড়ির ধুপশীল সেনা ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল শালবাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং তক্তানালা সেনা ক্যাম্প, ফারুয়া সেনা ক্যাম্প, শুক্করছড়ি সেনা ক্যাম্প ও তাংকৈতাং সেনা ক্যাম্প থেকেও যৌথভাবে প্রায় ১২০ জনের একটি সেনাদল লতা পাহাড় এলাকায় অবস্থান নেয় বলে খবর পাওয়া গেছে।

রাঙ্গামাটিতে একজন জুম্মকে আটক ও তার থেকে দুই লক্ষ টাকা ছিনতাই

সেনাবাহিনী কর্তৃক গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৩ মধ্যরাত আনুমানিক রাত ১২ টার সময় রাঙ্গামাটি জেলাধীন সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়ন এলাকা থেকে এক নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে অন্যায়ভাবে আটক ও বাড়িতে তল্লাশি করা এবং নগদ প্রায় পৌনে দুই লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম ভাগ্যধন চাকমা (৪২), পীং-বিন্দু লাল চাকমা, গ্রাম- দোগেইয়্যা পাড়া, ১নং ওয়ার্ড, মগবান ইউনিয়ন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত প্রায় ১২:০০ টার দিকে সেনাবাহিনী ভাগ্যধন চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে বাড়ির লোকজনকে ঘুম থেকে তুলে বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায় এবং বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। এসময় ভাগ্যধন চাকমার জমানো ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা সেনা সদস্যরা ছিনিয়ে নেয় এবং এর পরপরই ভাগ্যধন চাকমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জীবতলী সেনা ক্যাম্পের দিকে আটক করে নিয়ে যায়। আরো

জানা যায়, আটকের পরদিন ১৫ জানুয়ারি বিকাল ৩টার দিকে রাঙ্গামাটি সদর কোতোয়ালী থানা থেকে একদল পুলিশ ভাগ্যধন চাকমার বাড়িতে গিয়ে তদন্ত চালায় এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে।

পাহাড়ি-বাঙালি বিভেদ সৃষ্টির জন্য সেনাবাহিনী কর্তৃক জুরাছড়ি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি গঠন

গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক শান্তি-শৃঙ্খলার নামে রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার যক্ষ্মাবাজারের বাঙালি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পাঁয়তারার অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেনাবাহিনীর ২ অদ্বিতীয় বনযোগীছড়া সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্নেল জুলফিকলী আরমান বিখ্যাত বেশ কিছুদিন ধরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে 'জুরাছড়ি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি' গঠন করার জন্য জুরাছড়ি সদরের যক্ষ্মাবাজারের বাঙালি মুদি দোকানদারদের চাপ প্রয়োগ করে চলেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাঙালি ব্যবসায়ী আরো বলেন, এই সংগঠনের কাজ কী বা এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী তাও আমাদেরকে পরিষ্কার করে কিছুই জানানো হচ্ছে না। তিনি এই প্রচেষ্টা পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এইসব নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্তই হবে।

লংগদুতে বিজিবি কর্তৃক একজন জুম্মকে হয়রানি ও জিজ্ঞাসাবাদ

গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার গুলশাখালী ইউনিয়নে বিজিবির এক জোন কম্যান্ডার স্থানীয় এক চাকমার বিয়ে অনুষ্ঠান চলাকালে বরের বাবাকে ডেকে হয়রানিমূলক নানা জিজ্ঞাসাবাদ ও গালিগালাজ করা হয়েছে। সেদিন ছিল গুলশাখালী ইউনিয়নের শান্তিনগর গ্রামের বাসিন্দা কালাচান চাকমার ছোট ছেলের বিবাহের দিন। বিবাহ অনুষ্ঠান চলাকালে বিকাল আনুমানিক ৩:৩০ টার দিকে অনুষ্ঠানস্থলের পার্শ্ববর্তী শান্তিনগর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তিনটি পিক-আপ ও ৭/৮টি মোটরবাইক যোগে বিজিবি'র ৩৫/৪০ জনের একটি দল নিয়ে উপস্থিত হন ৩৭ বিজিবি'র রাজানগর ব্যাটালিয়নের জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্নেল শাহ মোঃ শাকিল আলম (পিএসসি)। বিদ্যালয় মাঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্নেল শাহ মোঃ শাকিল আলম বরের বাবা কালাচান চাকমাকে সেখানে ডেকে পাঠান। কালাচান চাকমা সেখানে উপস্থিত হলে জোন কম্যান্ডার তাকে নানা অপ্রাসঙ্গিক, হুমকিমূলক ও হয়রানিমূলক কথা বলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

সাজেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক একজন জুম্ম গ্রেফতার

গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক লক্ষ্মী বিকাশ চাকমা (২১) নামে এক নিরীহ জুম্মকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের শিকার যুবকটি খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের জোড়া ব্রিজ এলাকার মেদেয়ে চাকমার ছেলে। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর। তিনি সাজেকের মাচালং-এর ৬নং এলাকায় একজনের বাড়িতে দিন মজুর হিসেবে কাজ করেন।

জানা যায়, ঘটনার দিন ১৮ জানুয়ারি লক্ষ্মী বিকাশ চাকমা ব্র্যাকে চাকরিরত একজন ব্যক্তির কাগজপত্র নিয়ে মারিশ্যা থেকে মাচালং বাজার আসলে সেনাবাহিনী তাকে কোনো কারণ ছাড়াই গ্রেফতার করে। পরে বিকাল ৩ টার সময় সেনাবাহিনী উক্ত কাগজপত্রসহ তাকে মাচালং থানায় হস্তান্তর করে। পরদিন ১৯ জানুয়ারি বিকাল ৫:০০ টার দিকে সাজেক থানার পুলিশ গ্রেফতারকৃত লক্ষ্মী বিকাশ চাকমাকে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করেছে বলে জানা যায়।

রামগড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীর বিক্ষোভের সময় ব্যানার কেড়ে নেয় বিজিবি সদস্যরা

গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদসহ সদস্যবৃন্দের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের জন্য খাগড়াছড়ি আসার পথে রামগড়ে এলাকার জনসাধারণ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবি জানিয়ে ব্যানার-প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে মানববন্ধন করেন। এ সময় কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার জন্য লোকজন এগিয়ে গেলে কমিশনের গাড়ি বহরের পিছনে থাকা বিজিবি'র গাড়ি থেকে একদল বিজিবি সদস্য নেমে এসে মানববন্ধনের ব্যানার কেড়ে নিয়ে যায় এবং মানববন্ধন ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার চেষ্টা করে।

চন্দ্রঘোনা থানা ওসি কর্তৃক চার জেএসএস সদস্য থেকে ৬১ হাজার টাকা আদায়

গত ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কর্তৃক ক্রোকের আদেশ দেখিয়ে মিথ্যা মামলার শিকার জনসংহতি সমিতির স্থানীয় চারজন কর্মী পরিবার থেকে টাকা

আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উক্ত ওসি কর্তৃক চার পরিবারের কাছ থেকে মোট ৬১ হাজার টাকা আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভুক্তভোগী থোয়াই শৈ নু কার্বারির পরিবার ২১ হাজার টাকা, মেইফামং মারমার পরিবার ২০ হাজার টাকা, থুইসাচিং মারমার (তিনি জেএসএস কর্মী মংখ্যাইচিং মারমার ছোট ভাই) পরিবার ১০ হাজার টাকা এবং মংশৈপ্রু মারমার পরিবার ১০ হাজার টাকা ওসি'র নিকট জমা দিতে বাধ্য হয় বলে জানা যায়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রাত আনুমানিক ১১ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ির বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন যক্ষা বাজার সেনা ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন মোশাররফ এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল বনযোগীছড়া ইউনিয়নের পানছড়ি গ্রাম থেকে তিন নিরীহ গ্রামবাসীকে আটকের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভুক্তভোগী তিন গ্রামবাসীর হলেন- (১) সুভাষ বিজয় চাকমা, পীং-অশ্বিনী কুমার চাকমা, গ্রাম- ছোট পানছড়ি; (২) অমর বিকাশ চাকমা, পীং-অশ্বিনী কুমার চাকমা, গ্রাম- ছোট পানছড়ি ও (৩) মনঅ চাকমা, পীং-রজনী চাকমা, সাং-আইমাছড়া ইউনিয়ন, বরকল উপজেলা। তবে প্রায় ১১ ঘন্টা ক্যাম্পে আটক রাখার পরদিন ৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টার দিকে অমর বিকাশ চাকমা ও মনঅ চাকমাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও সুভাষ বিজয় চাকমাকে জুরাছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক পর্যটনের জন্য বিলাইছড়িতে এক জুম্ম গ্রাম উচ্ছেদের নির্দেশ

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সেনাবাহিনীর রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নস্থ গাছবান সেনা ক্যাম্পের ২৬ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর এর ক্যাপ্টেন মারুফ ও সুবেদার মো: আহম্মেদ ফারুয়া ইউনিয়নের গাছবাগান পাড়া এলাকার কার্বারি (গ্রাম প্রধান)সহ এক সভা ডেকে ৯ জুম্ম পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে নিজেদের বাড়িঘর ও জিনিসপত্র নিয়ে স্ব স্ব আবাসস্থল থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। যদি না গেলে বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া ও জ্বালিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আরো জানা যায়, গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বিলাইছড়ি-বরকল এলাকার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শনে গেলে তিনিই উক্ত ৯ জুম্ম পরিবারকে তাদের আবাসস্থল থেকে উঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান বলে জানান ক্যাপ্টেন মারুফ। উক্ত গ্রামে সেনাবাহিনী একটি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, সীমান্ত সড়ক ও সংযোগ সড়ক নির্মাণকালে সেনাবাহিনী আকর্ষণীয় জায়গাগুলো দখল করে নিচ্ছে ভবিষতে সেনাবাহিনী কর্তৃক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য- এমন অভিযোগ রয়েছে।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক টহল অভিযান

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সকাল আনুমানিক ৯ টার দিকে বিলাইছড়ি সেনা জোন হতে বীর ৩২ বেঙ্গলের জনৈক মেজরের নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি সেনাদল প্রথমে কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বাঙালহাবা গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর সেখান থেকে ২০ জনের একটি সেনাদল পরিহলা মোনে (পাহাড়) গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এছাড়া ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সকালের দিকে বিলাইছড়ি সেনা জোন হতে ২০ জনের আরো একটি সেনাদল বাঙালহাবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে যোগ দেয়। এরপর সেখান থেকে খাদ্যসামগ্রী, কিছু শ্রমিক নিয়ে আরো একটি সেনাদল পরিহলা মোনের দিকে যায়।

অপরদিকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মেরাংছড়া সেনা ক্যাম্প থেকেও ২০ জনের একটি সেনাদল তাগলকছড়া মোনে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এসময় সেনা সদস্যরা যেদিকে গেছে সেখানে স্থানীয় গ্রামবাসীদের থামিয়ে জেএসএস সন্ত্রাসীরা কোথায়, তারা চাঁদা চাইতে আসে কিনা, তারা কোথায় অবস্থান করে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে হয়রানি করে বলে জানা যায়।

কাইন্দ্যায় সেনাবাহিনী কর্তৃক টহল অভিযান

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিকাল আনুমানিক ৩টায় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের মরিচ্যাবিল সেনা ক্যাম্পের কম্যান্ডার জনৈক ক্যাপ্টেন ও সার্জেন্ট মো: লোকমানের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনাদল পার্শ্ববর্তী কাইন্দ্যা এলাকায় টহল অভিযানে যায়। এসময় সেনাদলটি ঐ এলাকার একটি প্রত্যাহারকৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় প্রায় দুই ঘন্টা অবস্থান করে। উল্লেখ্য, কাইন্দ্যা পাড়ার এই সেনা ক্যাম্পটি পার্বত্য চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের পরে প্রত্যাহার করা হয়।

এরপর ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সকালে উক্ত সেনাদলটির কম্যান্ডার স্থানীয় গ্রামের মুরুব্বিরা যাতে এইদিন সকাল ১০/১১ টার মধ্যে বসন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করে তার নির্দেশ পাঠান। সেনা কম্যান্ডারের নির্দেশ

অনুযায়ী, ওই এলাকার প্রাক্তন ইউপি সদস্য সঞ্চয় চাকমা, মহেন্দ্র লাল কার্বারি (গ্রাম প্রধান) ও সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য শেফালী চাকমা বসন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেনা কম্যান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে যান। এসময় সেনা কম্যান্ডার 'ওই এলাকায় সন্ত্রাসী আসে কিনা, চাঁদা সংগ্রহ করে কিনা, অবস্থান গ্রহণ করে কিনা' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে এইসব জুম্ম মুরুব্বিদের হয়রানি করে। এসময় সেনা কম্যান্ডার 'উক্ত পরিত্যক্ত সেনা ক্যাম্পে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনী কর্তৃক যে একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি যাতে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া না হয় তার নির্দেশ দিয়ে যান।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়ি তল্লাশি

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রাত আনুমানিক ৮টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই'এর একটি দল জুরাছড়ি ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বালুখালীমুখ গ্রামে গিয়ে প্রীতিপূর্ণ চাকমা, পীং-কামিনী রঞ্জন চাকমা নামে এক নিরীহ জুম্মর বাড়িতে ব্যাপক হয়রানিমূলক তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় সেনা ও ডিজিএফআই'এর সদস্যরা বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে বাড়ির লোকদের হয়রানি করে। এসময় সেনা সদস্যরা প্রীতিপূর্ণ চাকমাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'বিকেলে সন্ত্রাসীরা তোমার দোকানে যে টাকা জমা দিয়ে গেছে সেই টাকাগুলো কোথায়?' বলে প্রশ্ন করে হয়রানি করে এবং বিভিন্ন হুমকিমূলক কথা বলে চলে যায় বলে জানা যায়।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর দোকানে তল্লাশি

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২ টার সময় রাঙ্গামাটি বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের শুকনোছড়া এলাকায় বাঘাইহাট সেনা জোন থেকে ১০/১২ জনের একটি সেনাদল শুকনোছড়া গ্রামে গিয়ে প্রথমে সোনাধন চাকমা (৪৫) এর দোকানে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। কিন্তু সেখানে কোনো কিছু না পেয়ে সেখান থেকে চলে যাওয়ায়র সময় সেনা সদস্যরা নবনির্মিত শুকনোছড়া প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডটি খুলে নিয়ে যায়।

ফারুয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের দোকান, বাড়ি ও জুমক্ষেত ধ্বংস

গত ১ মার্চ ২০২৩ দুপুর আনুমানিক ১২:০০ টার দিকে সেনাবাহিনীর ৩৪ বীর বেঙ্গলের গাছবান সেনা ক্যাম্পের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আহমেদ ও ওয়ারেন্ট অফিসার গোবিন্দের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল গাছবান গ্রামে গিয়ে চিবুক্যে চাকমা (৩৫), পীং- লাল মন চাকমা ও বসু চাকমা (৩০), পীং- মনি চাকমা নামে জুম্মদের দুটি দোকান ভেঙে দেয় এবং বাত্যে লাল চাকমা(২৫),পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা নামে একজন নিরীহ জুম্ম-এর ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। একইসঙ্গে কার্বারি শুভময় চাকমা (৪৫), পীং- মণি চাকমা, অমর বিজয় চাকমা (২৫), পীং- ফরক ধন চাকমা, বাত্যে লাল চাকমা (২৫), পীং- বুদ্ধলীলা চাকমা ও বুদ্ধলীলা চাকমা (৬৫), পীং- অজ্ঞাত নামে ৪টি জুম্ম পরিবারের কাটা জুমে ট্রাক্টর নিয়ে মাটি এনে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এছাড়া সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নে সীমান্ত সংযোগ সড়ক সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকার জুম্ম অধ্যুষিত গাছবান গ্রামটি দীর্ঘদিন ধরে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ওই গ্রামের ২৬ পরিবারের মধ্যে ১৭ পরিবার অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং বাকি ৯ পরিবারকেও সেনাবাহিনী কর্তৃক সেখান থেকে চলে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

নান্যাচর ও বিলাইছড়িতে নতুন ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা

গত ২ মার্চ ২০২৩ থেকে রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলার নান্যাচর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের ১৮ মাইল (ডাকবাংলা সংলগ্ন) থেকে প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গায় নতুন ক্যাম্প স্থাপনের জন্য নান্যাচর জোনের একদল সেনা অবস্থান নেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে গত ৩ মার্চ ২০২৩ বিলাইছড়ির ফারুয়া ইউনিয়নের মেরাংছড়া সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক হাবিলদার মেজরের নেতৃত্বে ৩২ বীর রেজিমেন্টের ১২ জনের একদল সেনা সদস্য ফারুয়া ইউনিয়নের নাড়াইছড়ির ভরোত্তছড়ার মুখ এলাকায় হয়রানিমূলক টহল অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা মৃত মহেশ চন্দ্র চাকমার বন্দোবস্তিকৃত টিলা ভূমি পরিদর্শন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-পূর্ব সময়ে ঐ স্থানে একটি এপিবিএন ক্যাম্প ছিল। চুক্তির পরে উক্ত ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়। প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের উক্ত জায়গায় একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপনের জন্য সেনা সদস্যরা জায়গাটি পরিচিহ্নিত করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের উক্ত জায়গার ওয়ারিশসূত্রে মালিক হচ্ছেন মৃত মহেশ চন্দ্র চাকমার তিন ছেলে জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা (৫০), শরবিন্দু চাকমা (৪৭) ও

অমর বিকাশ চাকমা (৩৮)। উক্ত জায়গাতে বর্তমানে সেগুন বাগান রয়েছে বলে জানা যায়।

ফারুয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম এলাকায় হয়রানিমূলক অভিযান

গত ৩ মার্চ ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ধূপশীল ক্যাম্প ও ফারুয়া ক্যাম্পের ৩২ বীর রেজিমেন্টের জনৈক দুই সুবাদারের নেতৃত্বে ২২ জন করে দুইটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সেনাবাহিনী ফারুয়া ইউনিয়নের লতা পাহাড় এলাকায় হয়রানিমূলক টহল অভিযান চালানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। এ সময় দুইদিন ধরে পাংখো পাড়া ও মারমা পাড়ায় টহল প্রদান করে সেনা সদস্যরা। দুই গ্রামের জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে ডেকে ধূপশীল ক্যাম্পের সুবেদার হুমকির সুরে নির্দেশ দেন যে, গ্রামে সন্ত্রাসী আসলে অবশ্যই ধূপশীল ক্যাম্পে খবর দিতে হবে অন্যথায় গ্রামবাসীদেরকে সমস্যার মুখোমুখী হতে হবে।

সুবলঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন জুম্মকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে আটক ও মারধর

গত ৫ মার্চ ২০২৩ ভোর রাত আনুমানিক ২টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের মেজর মারুফ এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ২ বেঙ্গলের একটি দল পার্শ্ববর্তী সুবলং-এ গিয়ে বাড়ি ঘেরাও করে তিন জুম্ম গ্রামবাসীকে ঘুম থেকে জাগায়। এরপর গ্রামবাসীদের একত্র করে একটি দেশীয় বন্দুক গুঁজে দিয়ে তাদেরকে সেনা জোনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী তিন গ্রামবাসী হলেন- (১) শান্তশীল চাকমা বলী (৪৬), পীং-মৃত রঞ্জন বিকাশ চাকমা, গ্রাম-হাজাছড়া, ৬নং ওয়ার্ড, সুবলং ইউনিয়ন, (২) জ্ঞানশীষ চাকমা কালাবো (২৬), পীং-অশ্বিনী কুমার চাকমা, গ্রাম-হাজাছড়া, ৬নং ওয়ার্ড, সুবলং ইউনিয়ন ও (৩) সজীব চাকমা গাবালা (২৬), পীং-পঞ্চচরণ চাকমা, গ্রাম-কিল্যাছড়া, ৩নং ওয়ার্ড, সুবলং ইউনিয়ন। জানা যায়, সেনা সদস্যরা বনযোগীছড়া সেনা জোনে উক্ত তিন গ্রামবাসীকে বেদম মারধরের পর প্রায় দীর্ঘ ১২ ঘন্টা আটকাবস্থায় রাখা এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করার পর বিকেল ২ টার দিকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

বরকলে বিজিবি কর্তৃক কম দামে জুম্মদের কাছ থেকে জোরপূর্বক হলুদ ক্রয়

গত ৫ মার্চ ২০২৩ বিজিবি কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের হরিণা এলাকায় জোরপূর্বক ও সস্তায় জুম্মদের কাছ থেকে শুকনো হলুদ ক্রয় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি বিজিবি কর্তৃক নির্ধারিত কম দামে বিজিবি ক্যাম্পে গিয়ে হলুদ না দিলে জুম্ম হলুদ বিক্রেতাদের বাজারে হলুদ বিক্রি করতে দেবে না বলেও বিজিবি সদস্যদের কর্তৃক হুমকি দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, বর্তমানে প্রতি মণ শুকনো হলুদের বাজার দর ৪০০০ হতে ৪,৫০০ টাকা। কিন্তু বিজিবি সদস্যরা কিনে নিচ্ছে প্রতি মণ ৩০০০-৩৫০০ টাকায় এবং সেই হলুদ ক্যাম্পে বিনা পারিশ্রমিকে পৌঁছে দিতে হয়েছে।

জানা যায়, গত ২ মার্চ ২০২৩ বরকলের ভূষণছড়ার ১২ বিজিবি ছোট হরিণা জোনের জোন কম্যান্ডার মো: ফেরদৌস (৫০) ও ভূষণছড়া বিজিবি ক্যাম্পের বিআইপি মো: জাহাঙ্গীর এর নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য ভূষণছড়া এলাকার জুম্ম হলুদ চাষী ও ব্যবসায়ীদের ডেকে কথা বলেন। এসময় বিজিবি কম্যান্ডার তাদের ক্যাম্পে ১৫ মণ শুকনো হলুদ পৌঁছিয়ে দিতে জুম্ম হলুদ চাষী ও ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেন এবং হলুদ না দিলে অসুবিধা হবে বলেও উল্লেখ করেন। অপরদিকে একই দিন বড় হরিণা বিজিবি ক্যাম্পের দায়িত্বরত বিআইপি মো: জিয়া (৩৮) ভালুক্যাছড়ি এলাকায় টহল অভিযানে গিয়ে জুম্মদের কাছ থেকে ১৫ মণ শুকনো হলুদ সংগ্রহ করে তাদের দিয়েই সেই হলুদ ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। এরপর বিজিবির সদস্যরা মণ প্রতি ৩৫০০ টাকা দিলে জুম্ম হলুদচাষীরা তা নিতে না চাইলে, বিজিবি সদস্যরা জোর করে সেই টাকা নিতে বাধ্য করেন।

দীঘিনালায় সেনাবাহিনী কর্তৃক একজন জুম্মকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে আটক

গত ৬ মার্চ ২০২৩ দিবাগত গভীর রাত আড়াইটার সময় খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের জারুলছড়ি হেডম্যান পাড়া থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রেম রঞ্জন চাকমা (৫২), পীং- রেবতি রঞ্জন চাকমা নামে একজনকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে আটকের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনার রাতে আটককৃত প্রেম রঞ্জন চাকমা গ্রামের এক মৃত ব্যক্তির সাপ্তাহিক ক্রিয়া (ধর্মীয় অনুষ্ঠান) উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় কীর্তন গানের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দিবাগত রাত আড়াইটার সময় দীঘিনালা সেনা জোন ও বাবুছড়া সাব-জোন হতে গাড়িযোগে একদল সেনা সদস্য ওই কীর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাকে ধরে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। এর আগে সেনারা বাড়িতে তার পুত্রবধুর রুমের বিছানায় একটি অস্ত্র রেখে দেয়। প্রেম রঞ্জনকে বাড়িতে নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রটি তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করার নাটক করে সেনা সদস্যরা। পরে সেনারা অস্ত্রসহ ছবি তুলে তাকে দীঘিনালা সেনা জোনে নিয়ে যায়।

বান্দরবানে তিন উপজেলার বম পাড়ায় আবারো সেনা অপারেশন

গত ১৩ মার্চ ২০২৩ বিকাল থেকে বান্দরবানের থানচি, রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় সেনা অপারেশন করা হয়। এই লক্ষ্যে থানচি উপজেলার সীমান্ত সড়ক সংলগ্ন এলাকা ও রুমা উপজেলার রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের বম পাড়াগুলোতে সেনাবাহিনীর আলিকদম সেনাজোনের ৩১ বীর এবং বিজিবি বলিপাড়া জোনের ৩৮ ব্যাটালিয়ন, রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়ন ও এর তৎসংলগ্ন এলাকার বম পাড়াগুলোতে রুমা সেনাজোনের ২৮ বীর এবং রোয়াংছড়ি এলাকার বম পাড়াগুলোতে বান্দরবান সদর জোনের ৫ ইবিআর-কে মোতায়েন করা হয়। এই অপারেশনের ফলে উল্লেখিত এলাকাগুলোর জনমনে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম ছাত্রকে মারধর

গত ১৪ মার্চ ২০২৩ সকাল ৯.৩০টার দিকে বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ি সদর উপজেলায় উশৈমং মারমা (২৪), পীং: উক্যাচিং মারমা নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক এক নিরীহ মারমা ছাত্র সেনাবাহিনীর বেধরক মারধর ও অপমানের শিকার হয়। সেনাবাহিনীর মারধরের ফলে ওই মারমা ছাত্রের হাতে ও পিঠে গুরুতর জখমের সৃষ্টি হয়।

বান্দরবান জেল গেইট থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই পিসিপি সদস্যকে পুনঃগ্রেফতার

গত ১৫ মার্চ ২০২৩ সন্ধ্যা ৭:৩০ টার দিকে বান্দরবানের জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) দুই সদস্য জেল থেকে বের হওয়ার পরপরই সেনাবহিনী কর্তৃক জেলগেট থেকে আবার গ্রেপ্তারের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী দুই ছাত্র হলেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি থুইমং প্রু মারমা (টি এম প্রু মারমা) ও কেন্দ্রীয় সদস্য থুইনুমং মারমা। টি এম প্রুর মারমার বাড়ি থানচি'র হেডম্যান পাড়া এবং থুইনুমং মারমার বাড়ি রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মে ২০২২, দুপুর আনুমানিক ২:০০ টার দিকে বান্দরবান-রাঙ্গামাটি সড়কে বান্দরবান সদরের সুয়ালক ইউনিয়ন এলাকার চেমিডলু পাড়া সেনাক্যাম্পের সামনে থেকে সেনাসদস্যরা উক্ত দুই ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করে। ছাত্রনেতারা এসময় রাঙ্গামাটি শহরে অনুষ্ঠিতব্য পিসিপি'র ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২৬তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মোটর সাইকেল যোগে রাঙ্গামাটিতে যাচ্ছিলেন।

বিলাইছড়িতে দুই গ্রুপ সেনা সদস্য কর্তৃক তল্লাশি অভিযান

গত ১৭ মার্চ ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ির ধুপশীল সেনা ক্যাম্পের টুআইসি মেজর রেজার নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি সেনাদল শালবাগান হয়ে লতাপাহাড়ের পাংখোয়া পাড়ায় গিয়ে টহল দেয়। অপরদিকে একই সময়ে ফারুয়া সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে একটি সেনাদল লতাপাহাড়ের মারমা পাড়ায় গিয়ে টহল দেয়। এক পর্যায়ে ওই দুটি সেনাদল পাংখোয়া পাড়া ও মারমা পাড়া উভয় গ্রামের ঘরে ঘরে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় সেনা সদস্যরা গ্রামবাসীদের 'অস্ত্র আছে কিনা, সন্ত্রাসী আসে কিনা ইত্যাদি' নানা হয়রানিমূলক প্রশ্ন করেন। এছাড়া সেনা সদস্যরা তাদের অনুমতি ছাড়া গ্রামের কোনো লোকজন কোথাও যেতে পারবে না বলে নির্দেশ প্রদান করেন।

ফারুয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬ গ্রামবাসীকে মারধর

গত ১৯ মার্চ ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য লতা পাহাড় এলাকায় মারমা গ্রামের ৬ গ্রামবাসীকে বিনা অপরাধে মারধর করেন। ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা হলেন- ১. গ্রামের কার্বারি উহ্লা প্রু মারমা (৫৫), পীং-থুই চানু মারমা, ২. গ্রামের কার্বারি মিদু মারমা (৫১), পীং-হ্লাব্রেচাই মারমা, ৩. থুইচা প্রু মারমা (৩৫), পীং-সক্রা অং মারমা, ৪. উহ্লা অং মারমা (৩৫), পীং-রুই পা উ মারমা, ৫. কন্যাবাবু তঞ্চঙ্গ্যা (৩০), পীং-অর্জুন তঞ্চঙ্গ্যা ও ৬. অনিল তঞ্চঙ্গ্যা, পীং-অর্জুন তঞ্চঙ্গ্যা।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনীর তল্লাশি অভিযান

গত ২২ মার্চ ২০২৩ রাত ১টার দিকে রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি সদরের দীঘলছড়ি সেনা জোনের জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ৩২ বীর-এর ৩৫ জনের একটি সেনাদল পার্শ্ববর্তী কুতুবদিয়া এলাকার জুম্ম গ্রামে টহল অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা দুই তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীর বাড়ি ঘেরাও করে বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায় এবং 'গ্রামে সন্ত্রাসী আসে কিনা, তারা সন্ত্রাসীর সঙ্গে যোগসাজস করে চাঁদা আদায় করে কিনা ইত্যাদি' নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে ও ভয় দেখিয়ে গ্রামবাসীদের হয়রানি করে। ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা হলেন- (১) লাসিং তঞ্চঙ্গ্যা (৪০), পীং-রাঙ্গাচান তঞ্চঙ্গ্যা ও (২) মঙ্গল সেন তঞ্চঙ্গ্যা, পীং-নিরাঙ্গ তঞ্চঙ্গ্যা।

সার্বোয়াতলী বৌদ্ধ বিহারের জায়গা থেকে প্রত্যাহৃত সেনাক্যাম্পের জায়গা বিজিবির নিকট হস্তান্তর

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক জোরপূর্বক রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নে শিজকমুখ সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে নির্মিত সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের অবশেষে গত ২৫ মার্চ ২০২৩ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। তবে সেনাবাহিনী সেনা ক্যাম্পের জায়গাটি ঐ জায়গার মালিক বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটির কাউকে বুঝিয়ে না দিয়ে ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের অধীনে শিজক মুখ বিজিবি ক্যাম্পের নিকট হস্তান্তর করেছে বলে জানা যায়।

গত ২৫ মার্চ ২০২৩ দুপুর আনুমানিক ১২:৩০ টায় উক্ত শিজকমুখ সেনা ক্যাম্পের সেনাবাহিনী গোলাবারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজসরঞ্জামসহ তাদের জিনিসপত্র নিয়ে কাউকে কিছু না বলে পার্শ্ববর্তী দুরছড়ি বাজার সেনা ক্যাম্পে চলে যায় বলে জানা যায়। যাওয়ার সময় সেনা ক্যাম্পের প্রধান ফটকে ক্যাম্পের নামও মুছে দিয়ে যায়। কিন্তু ক্যাম্পের জন্য নির্মিত বিভিন্ন বাড়ি-ঘর, সেন্ট্রি পোস্ট ইত্যাদি কোনো স্থাপনা ভেঙে নিয়ে যায়নি। এরপর গত ২৭ মার্চ ২০২৩ সকাল আনুমানিক ১০:৩০ টার দিকে লংগদু উপজেলার ৩৭ বিজিবি রাজানগর জোনের অধীন শিজকমুখ বিজিবি ক্যাম্প থেকে জনৈক নায়েক সুবেদার এর নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য সেখানে গিয়ে সংরক্ষিত এলাকা লেখা একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া যায়।

আইমাছড়ায় প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গায় ঘরবাড়ি ভাঙতে নিষেধ

গত ২৭ মার্চ ২০২৩ রাঙামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার আইমাছড়ার মদন পাড়ায় জুম্মদের জায়গা বেদখল করে নির্মিত নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প থেকে সকল সেনা, বিজিবি ও পুলিশ সদস্যদের বেলা আনুমানিক ২ টার দিকে প্রত্যাহার করা হলেও ক্যাম্প কম্যান্ডার সুবেদার মো: মোমিন বরকলের ১৬৪নং সাইচাল মৌজার হেডম্যান সেপম চাকমাকে ডেকে উক্ত পরিত্যক্ত ক্যাম্পের কোনো ঘরবাড়ি ভেঙে না ফেলতে নির্দেশ দিয়ে যায়। জানা যায়, গত ২৭ মার্চ ২০২৩ বেলা আনুমানিক ২ টার দিকে উক্ত ক্যাম্পের সকল সেনা, বিজিবি ও পুলিশ সদস্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র নিয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী জুরাছড়ি উপজেলার সেনা জোন হেডকোয়ার্টার্সে চলে যায়। এসময় তারা স্থানীয় ২০ গ্রামবাসীকেও শ্রমিক হিসেবে নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর তল্লাশি অভিযান, ৫ জনকে হয়রানি, ২টি বাড়ি তল্লাশি

গত ২৮ মার্চ ২০২৩ রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি উপজেলাধীন ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়নের ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে যথাক্রমে চুমোচুমি ও চকপতিঘাট গ্রামে ২ বীর বনযোগীছড়া জোন ও জোনের অধীন যক্ষা বাজার আর্মি ক্যাম্প ও ১৬১০ ক্যাম্প এবং জোন সদর হতে জোন উপ অধিনায়ক মেজর মো: শফিকুল পিএসসির নেতৃত্বে একদল সেনা বনযোগীছড়া ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের চুমোচুমি গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালায়। এ সময় সেনা সদস্যরা রাসেল চাকমা (২১), পীং- নন্দিলাল চাকমা ও রাজু চাকমা (১৯), পীং- দয়াল চাকমাসহ সর্বমোট ৫ জনকে বিকাল ৩ ঘটিকার সময় তাদের নিজ বাড়ি হতে ১৬১০ ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায় এবং ব্যাপক হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে জানা যায়। জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুমিত চাকমা, পলাশ চাকমা, পন চাকমা, বম চাকমা, বরুন চাকমা এবং সুবর্ণ চাকমারা কোথায় থাকে এবং সন্ত্রাসীরা কোথায় ইত্যাদি।

গত ২৯ মার্চ ২০২৩ রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি বনযোগীছড়া ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে সকাল হতে না হতেই ভোর ৪ ঘটিকার সময় সেনাসদস্যরা চকপতিঘাট গ্রামটি চারিদিক থেকে ঘিরে রেখে নির্মল চাকমা, পীং- মতিলাল চাকমা ও বরুন চাকমা, পীং- প্রেমলাল চাকমা দুটি বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর তল্লাশি অভিযান, ১টি বাড়ি তল্লাশি ও ৬ জনকে হয়রানি

গত ৩০ মার্চ ২০২৩ জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন শীলছড়ি সেনা ক্যাম্পের জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে ১৯ জনের একটি সেনাদল জুরাছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের শীলছড়িমোন পাড়া গ্রামে টহল অভিযানে গিয়ে একপর্যায়ে দুপুর ১:০০ টার দিকে সেনাদলটি উক্ত গ্রামের শান্তি জীবন চাকমার বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়।

এসময় সেনাদলটি শান্তি জীবন চাকমার বাড়িতে বেড়াতে আসা একই গ্রামের ৬ প্রতিবেশিকে ধরে সেখান থেকে ঘিলাতলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। তখন সেখানে অবস্থানরত বনযোগীছড়া সেনা জোনের মেজর এহতে শামসুল হক উক্ত ৬ গ্রামবাসীকে বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে হয়রানি করেন এবং প্রায় তিন ঘন্টা আটক রাখেন। ভুক্তভোগী ৬ গ্রামবাসী হলেন- (১) শান্তি জীবন চাকমা, পীং- নিলচন্দ্র চাকমা, (২) সুনীল চাকমা, পীং- সম্রাট চাকমা, (৩) ডানিয়েল চাকমা, পীং- শান্তশীল চাকমা, (৪) অমর চাকমা, পীং- অজ্ঞাত, (৫) নাম অজ্ঞাত ও (৬) নাম অজ্ঞাত।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে সাজেকে সীমান্ত সড়কের ক্ষতিগ্রস্তদের বিক্ষোভ

গত ৩১ মার্চ ২০২৩ দুপুরের দিকে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের উদয়পুর এলাকায় সাজেকের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীর ব্যানারে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। বিব্রকান্তি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ব্যবসায়ী আলোময় চাকমা, সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার মোহন লাল চাকমা, স্থানীয় গ্রামের কার্বারি বুদ্ধি রঞ্জন চাকমা, ললিত কার্বারি, উদয় রঞ্জন চাকমা প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার অন্যান্য এলাকার ন্যায় বাঘাইছড়ি উপজেলার ১৬৮নং কংলাক মৌজা ও ১৬৭নং রুইলুই মৌজার অন্তর্গত সাজেক ইউনিয়নের উদয়পুর জংশন থেকে উত্তরে ১০ কিলোমিটার ও দক্ষিণে ১০ কিলোমিটার সাজেক আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত সীমান্ত সড়ক নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও পরিতাপের বিষয় যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় নেতৃত্ব ও অধিবাসীদের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনা ও পূর্বসম্মতি ব্যতিরেকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীর কোনোরূপ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করেই সরকার ও সেনাবাহিনীর ২০ ইসিবি এই সীমান্ত সড়ক নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে বিজিবি কর্তৃক ৩ জুম্মকে আটক, ১ জনকে মারধর

গত ১ এপ্রিল ২০২৩ বিকাল ৪ টার সময় বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের তুমব্রু এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডের বাইশপাড়ি গ্রামের তিনজন তঞ্চঙ্গ্যা নারী মাঠ থেকে গরু নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে বাইশপাড়ি বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা পথরুদ্ধ করে গরু পাচারকারী আখ্যা দিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এসময় দুইজনকে বাইরে রেখে ঐসুঙু তঞ্চঙ্গ্যাকে (১৬) ক্যাম্পের ভিতর নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন চালায় বিজিবির সদস্যরা।

ঘটনার পর আনুমানিক ৪:৩০ টার দিকে তিন জুম্ম গ্রামবাসী ঐসুঙু তঞ্চঙ্গ্যার উপর নির্মম নির্যাতনের কারণ জানতে গেলে ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা ঐ তিন জন জুম্ম গ্রামবাসীকে মারধর করে পাঠিয়ে দেয়। পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে ক্যাম্পের সকল বিজিবি সদস্যরা গ্রামে এসে জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর সন্ত্রাসী কায়দায় অতর্কিত হামলা চালায়। এতে প্রায় ১০০ জন জুম্ম গ্রামবাসী আহত হয় এবং একজনের অবস্থা আশংকাজনক বলেও জানা যায়। উক্ত ঘটনার পর উল্টো জুম্ম গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে বিজিবি কর্তৃক মিথ্যা মামলা দায়ের করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২ এপ্রিল ২০২৩ কক্সবাজার ব্যাটালিয়ন (৩৪ বিজিবি) এর পক্ষ থেকে জেসিও ৯৭৪৯ বিএম রেজাউল করিম বাদী হয়ে জুম্মদের বিরুদ্ধে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় এই মিথ্যা মামলা দায়ের করেন।

লংগদুতে সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি সাহিত্য সংগঠনের অফিস স্থাপনে বাধা

সম্প্রতি লংগদু উপজেলার ৪ নং বগাচতর ইউনিয়নের অন্তর্গত চিবেরেগা এলাকার আদিবাসীদের ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে 'নোয়ারাম সাহিত্য সংসদ' এর একটি শাখা কার্যালয় নির্মাণে বিজিবি, রাজনগর জোন, গুলশাখালী, লংগদু এর নিয়ন্ত্রণাধীন চাল্যাতুলি ক্যাম্প কম্যান্ডার কার্যালয়টি নির্মাণ না করার জন্য বাধা সৃষ্টি করে। কার্যালয়টি নির্মাণের জন্য যে জায়গাটি নির্ধারণ করা হয়েছে সেটি পুনং চান চাকমা, পিতা- পূর্ণ কুমার চাকমা, হোল্ডিং জ-১৭ এর নামে বন্দোবস্তকৃত এবং এর পার্শ্বে একটি বৌদ্ধ বিহার, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও বৌদ্ধ বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি খেলার মাঠ রয়েছে। বস্তুত জুম্মদের মালিকানাধীন ঐ জায়গা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক বেদখলের উদ্দেশ্যেই এই বাধা প্রদান করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত ১ এপ্রিল ২০২৩ উক্ত জোনের দায়িত্বরত এডি মো: হাফিজুর রহমান সশরীরে এসে গ্রামের মুরুব্বীদের ডেকে

কার্যালয়টি নির্মাণ না করার জন্য নিষেধ করেন এবং কার্যালয় নির্মাণ করার জন্য 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লংগদু'র অনুমতি পত্রসহ 'জোন কম্যান্ডার, ৩৭ বিজিবি, রাজনগর জোন' বরাবরে একটি আবেদন করার পরামর্শ দেন।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক হেডম্যান থেকে জোরপূর্বক স্বাক্ষর আদায়

রাঙামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুম্যা ইউনিয়নের গন্ডাছড়া মৌজার হেডম্যান সুংঙুর পাংখোয়াকে সীমান্ত সড়কের জায়গা ও এর আশেপাশের ভূমি সরকারি খাস জমি হিসেবে উল্লেখ করে সেনাবাহিনীর তৈরিকৃত একটি সনদপত্রে স্বাক্ষর দিতে নির্দেশ পাঠায়। এছাড়াও দুমদুম্যা ইউনিয়নে অবস্থিত গাছবাগান সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার সাইফুল উক্ত বক্তব্য সম্বলিত সনদপত্র শীর্ষক একটি কাগজ ১৫০নং দুমদুম্যা মৌজার হেডম্যান ও কার্বারিদের পাঠিয়েছেন এবং তাদের এতে স্বাক্ষর দিতে হবে বলে নির্দেশ পাঠিয়েছেন বলে জানা যায়। সীমান্ত সড়ক নির্মাণকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক জোরপূর্বক ও বেআইনিভাবে স্থানীয় হেডম্যানদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনীর তল্লাশি অভিযান

গত ৪ এপ্রিল ২০২৩ রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি সদরের দীঘলছড়ি সেনা জোনের কম্যান্ডিং অফিসার (সিও) লেঃ কর্নেল মোঃ আহসান হাবিব নাসিম পিপিএম, পিএসসি ও টুআইসি মেজর ডাঃ রেজার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ৩২ বীর এর ৭০/৭৫ জনের একটি সেনাদল পাংখোয়া জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মালুম্যা পাংখোপাড়া এবং তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মালুম্যা তঞ্চঙ্গ্যা পাড়ায় তল্লাশি অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা উক্ত দুই গ্রামের প্রতিটি ঘরে তল্লাশি অভিযান চালায় এবং বাড়ির লোকদের অবৈধ অস্ত্র আছে কিনা, কে কি কাজ করে, কোথায় থাকে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে ও নানা কথাবার্তা বলে হয়রানি করে। ঐদিন সারারাত সেনা সদস্যরা গ্রামসমূহে অবস্থান করে পরদিন ৫ এপ্রিল সকাল ৯টা/১০টার দিকে সেখান থেকে সেনা ক্যাম্পে চলে যায়।

বিজু উৎসবের মুখে সেনাবাহিনী কর্তৃক বিলাইছড়িতে তল্লাশি অভিযান

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জাতীয় উৎসবের প্রাক্কালেও রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়িতে বিভিন্ন জুম্ম গ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক অব্যাহতভাবে টহল অভিযান পরিচালনা করা এবং এসব অভিযানে জুম্ম গ্রামবাসীদের মারধর, তল্লাশি, হয়রানি করা ও এক গ্রামবাসীকে জেলে পাঠানোর অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ৬ এপ্রিল ২০২৩ বিলাইছড়ি উপজেলার ৪নং ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বার সুমন তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫), পীং-লাতুসেন তঞ্চঙ্গ্যা ফারুয়া গেলে এক পর্যায়ে ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা সুমন তঞ্চঙ্গ্যাকে বাজার থেকে সেনা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। সেনা সদস্যরা সুমন তঞ্চঙ্গ্যাকে বেদম মারধর করে। এভাবে প্রায় ৩ ঘন্টা ক্যাম্পে আটক রাখার পর সুমন তঞ্চঙ্গ্যাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গত ৮ এপ্রিল ২০২৩ ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য নতুন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৪৮) নামে ফারুয়া বাজারের এক ঔষধ দোকানদারকে সেনা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করে। ক্যাম্পে একদিন আটক রাখার পর সেনা সদস্যরা বিলাইছড়ি থানা থেকে পুলিশ ডেকে এনে নতুন কুমার তঞ্চঙ্গ্যাকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

গত ১০ এপ্রিল ২০২৩ ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের তক্তানালা সেনা ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য উলুছড়ি এলাকায় টহল অভিযানে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে সেনাদলটি তক্তানলা গ্রাম থেকে অপু তঞ্চঙ্গ্যা (৬০) ও শান্ত তঞ্চঙ্গ্যা (৪০) নামে দুই গ্রামবাসীকে জোর করে একই গ্রামের অনিল তঞ্চঙ্গ্যা (৪৮)-এর বাড়িতে নিয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে ব্যাপক মারধর করে। নির্যাতনের শিকার হলেন– ৪নং ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বার সুমন তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫), অপু তঞ্চঙ্গ্যা (৬০), শান্ত তঞ্চঙ্গ্যা (৪০), অনিল তঞ্চঙ্গ্যা (৪৮)।

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম ছাত্রকে আটক

গত ৮ এপ্রিল ২০২৩ রাত ১০:৩০ টার সময় খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের ২নং প্রকল্প গাছবান এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৯ম শ্রেণির ছাত্র টোকেলসা ত্রিপরা (১৫), পিতা- কমল ত্রিপুরা ও দোকানদার সুখেন্দু ত্রিপুরাকে (৩৬) পিতা- ধীরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা নিজ নিজ বাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে অস্ত্র ও চাঁদা আদায়ের রশিদ বই গুঁজে দিয়ে তাদেরকে খাগড়াছড়ি সদর থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। এ সময় সেনাবাহিনী সদস্যদের সঙ্গে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) দলের জলসা ত্রিপুরা (২৫) ছিল বলে এলাকাবাসীর মাধ্যমে জানা যায়।

লংগদুতে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ গুলিতে এক জুম্ম নারী আহত

রাঙামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার লংগদু সেনা জোনের আওতাধীন করল্যাছড়ি সেনা সাব-জোনের সেনা ও আনসার বাহিনীর প্রশিক্ষণ গুলিতে নন্দিতা চাকমা (২০), স্বামী-বিষ্ণু

চাকমা, গ্রাম-করল্যাছড়ি, আটরকছড়া ইউনিয়ন, লংগদু নামে এক অন্তঃসত্তা জুম্ম নারীর আহত হওয়া খবর পাওয়া যায়। আহত জুম্ম নারীর ডান পাছায় গুলিটি বিদ্ধ হয় বলে জানা যায়।

জানা যায়, গত ১৬ এপ্রিল ২০২৩ সকাল ৮টা থেকে তেজস্বী বীর লংগদু সেনা জোনের আওতাধীন করল্যাছড়ি সাব-জোনের সেনা ও আনসার সদস্যদের একটি দল তাদের একটি ফায়ারিং স্পটে গুলিবর্ষণ প্রশিক্ষণ (টার্গেট শুটিং) করছিল। এর কিছুক্ষণ পরে নন্দিতা চাকমা তার জুমের কাজ শেষ করে ফায়ারিং স্পট থেকে অন্তত ৩০০ গজ দূরত্বে বাড়ির পথে ফিরছিল। এমন সময় সেনা ও আনসার সদস্যদের ছোঁড়া গুলি নন্দিতা চাকমার পায়ে উপরের অংশে এসে বিদ্ধ করে। এতে ঘটনাস্থলেই পড়ে যায় নন্দিতা চাকমা। পরে আহত নন্দিতা চাকমাকে লংগদু সদরের মাইনীমুখ ন্যাশনাল হাসপাতালে নিয়ে অস্ট্রোপসার করে গুলি বের করা হয় বলে জানা যায়।

পানছড়িতে সেনাবাহিনী ও সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক এক জুম্মকে আটক

গত ২৮ এপ্রিল ২০২৩ ভোর ৩ টার সময় খাগড়াছড়ির পানছড়ির সদর সাব জোন থেকে দু'টি গাড়িযোগে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য দুইজন ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীকে সঙ্গে নিয়ে পানছড়ি সদর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের আলীচান কার্বারি পাড়ায় হানা দিয়ে মিন্টু চাকমা (৩৭), পীং- মৃত আলীচান চাকমা (কার্বারি) ও নয়ন্টু চাকমা (২৪), পীং- গুণদ্বীপ চাকমাকে পানছড়ি সাব জোনে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে ধরে নেওয়ার পর মিন্টু চাকমাকে ছেড়ে দিলেও নয়ন্টু চাকমাকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে পানছড়ি থানায় সোপার্দ করা হয়।

লংগদুতে বিজিবি কর্তৃক এক জুম্মকে গ্রেফতার ও বাড়ি তল্লাশি

রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার ছোট মাহিল্যা এলাকায় গত ১ মে ২০২৩ বিকাল আনুমানিক ৩ টার দিকে স্থানীয় বিজিবি ও পুলিশ কর্তৃক জীবন বিকাশ চাকমা (২৫), পীং- সম্ভু মনি চাকমা (৬০) নামে একজন গ্রামবাসীকে যড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেপ্তার ও বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ১ মে ২০২৩ বিকাল আনুমানিক ৩ টার দিকে লংগদু উপজেলার ৩৭ বিজিবির রাজানগর জোনের একদল বিজিবি সদস্য কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে ছোট মাহিল্যা গ্রামে গিয়ে সম্ভু মনি চাকমার (৬০) বাড়ি ঘেরাও করে এবং বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। প্রায় আধা ঘন্টা যাবৎ তল্লাশি চালিয়ে বাড়িতে কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পায়খানা ঘরের চাল থেকে কিছু গাঁজা পাওয়া গেছে মর্মে অভিযোগ তুলে বিজিবি ও পুলিশ সদস্যরা সম্ভু মনি চাকমার ছেলে জীবন বিকাশ চাকমাকে আটক করে বিজিবি জোনে নিয়ে যায়। পরে সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বিজিবি সদস্যরা জীবন বিকাশ চাকমাকে লংগদু থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে।

বাঘাইছড়িতে বিজিবি কর্তৃক অবৈধভাবে এক জুম্ম গ্রামবাসীর সেগুন কাঠ ও পালিত গরু জব্দ

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতলী ইউনিয়নের চুড়াখালীতে বিজিবি কর্তৃক অন্যায়ভাবে স্থানীয় জুম্ম ব্যবসায়ীদের সেগুন কাঠ ও দেশিয় গরু জব্দ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে পরে গরুগুলো ফেরত দেওয়া হলেও কাঠগুলো ফেরত দেওয়া হয়নি বলে জানা যায়।

গত ৭ মে ২০২৩ রাত আনুমানিক ৭ টার দিকে ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের সহকারী জোন কম্যান্ডার মেজর মোহাম্মদ হাফিজ হোসেনের নেতৃত্বে রাজনগর জোন ও চুড়াখালী বিজিবি ক্যাম্প হতে ৫০-৬০ জনের বিজিবির একটি দল জুম্ম অধ্যুষিত চুড়াখালী গ্রামে টহল অভিযানে যায়। এসময় বিজিবি কম্যান্ডার মেজর মোহাম্মদ হাফিজ হোসেন ৩৭নং আমতলী ইউনিয়নের শ্রমিক লীগের সভাপতি বেলাল হোসেনকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, মেজর মোহাম্মদ হাফিজ হোসেন ও শ্রমিক লীগের সভাপতি বেলাল হোসেনের যোগসাজসে এই টহল অভিযান চালানো হয়।

বিজিবির উক্ত টহল দলটি চুড়াখালী গ্রামে গিয়ে স্থানীয় জুম্ম কাঠ ব্যবসায়ী দীপায়ন চাকমার বৈধ মালিকানাধীন প্রায় ৩০০ ফুট সেগুন কাঠ অন্যায়ভাবে জব্দ করে। দীপায়ন চাকমা সম্প্রতি উক্ত সেগুন গাছ ক্রয় করেন নবপেড়াছড়া গ্রামের অধিবাসী শান্তশীল চাকমার নিজস্ব সেগুন বাগান থেকে। এছাড়াও বিজিবি সদস্যরা এসময় জুম্মদের তিনটি দেশিয় গরু জব্দ করেন। পাবলাখালী গ্রামের বাসিন্দা নিরঞ্জন চাকমা ও তার দুই বন্ধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঐ তিনটি গরু কিনেছিলেন পার্শ্ববর্তী বরকলের হরিণা থেকে। জানা যায়, বিজিবি সদস্যরা 'অবৈধভাবে পাচার করা হচ্ছে' এমন অভিযোগ তুলে জুম্মদের উক্ত কাঠ ও গরুগুলো জব্দ করেন।

বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর, জব্দকৃত কাঠ ও গরুর মালিকরা খেদারমারা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মেম্বার শুভদেব চাকমাকে নিয়ে চুড়াখালী বিজিবি ক্যাম্পে গিয়ে বিজিবি কম্যান্ডারের সঙ্গে দেখা করেন এবং উক্ত কাঠ ও গরুগুলো বৈধভাবে কেনা বলে উল্লেখ করেন। এসময় বিজিবি কর্তৃপক্ষ গরুগুলো মালিকদের ফেরত দিলেও সেগুন কাঠগুলো ফেরত দেয়নি বলে জানা যায়।

এরপর গত ৮ মে ২০২৩ বিকাল আনুমানিক ৪ টার দিকে রাজনগর জোন ও চুড়াখালী বিজিবি ক্যাম্প থেকে একদল

বিজিবি সদস্য রাঙ্গামাটি জেলাস্থ বাঘাইছড়ি সারোয়াতলী এলাকায় গিয়ে টিকেল চাকমা নামের স্থানীয় এক জুম্মর কাছ থেকে ২০০-৩০০ ফুট সেগুন কাঠ জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া যায়।

বাঘাইছড়িতে বিজিবি কর্তৃক রোগী দেখতে যাওয়ার সময় এক জুম্ম ডাক্তারকে তল্লাশি

গত ৮ মে ২০২৩ সকালের দিকে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার চুড়াখালী বিজিবি ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা গর্ভবর্তী নারীর জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে আসার সময় সুগতি চাকমা নামে এক জুম্ম ডাক্তারকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে হয়রানি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, সারোয়াতলী ইউনিয়নের চিবিতবাগান এলাকায় এক গর্ভবতী জুম্ম নারী হঠাৎ গুরুতর অসুস্থতা বোধ করলে বাড়ির লোকেরা একজন ডাক্তার আনতে যান। ওই ডাক্তারকে আনার সময় মাঝপথে রাঙাপাহাড় নামক স্থানে তল্লাশি চৌকিতে বিজিবি সদস্যরা ডাক্তারকে দীর্ঘক্ষণ আটক করে রাখে এবং তল্লাশি চালায়।

লংগদুতে স্বামী পরিত্যক্ত এক জুম্ম নারীকে বাড়ি নির্মাণে বিজিবির বাধা

রাঙামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার ৪নং বগাচতর ইউনিয়নে ৯ নং মারিশ্যাচর মৌজার চিবেরেগা গ্রামে জুম্মর নামে রেকর্ডভুক্ত (বন্দোবস্তীকৃত) জায়গায় অসহায় এক জুম্ম নারী বসতবাড়ি নির্মাণ করতে গেলে লংগদুর ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্নেল শাহ মোঃ শাকিল আলম (পিএসসি) বাধা দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী নারীর নাম চম্পা চাকমা (৪৫)। তিনি গ্রামের ভূমিহীন ও স্বামী পরিত্যক্ত অসহায় এক নারী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লংগদুর ৯নং মারিশ্যাচর মৌজায় চিবেরেগা গ্রামে পুনং চান চাকমা, পিতা- ধঙ্গ চাকমা এর নিজ নামে হোল্ডিং নং আর-১৪ এর আওতায় ২.০০ (দুই) একর পাহাড় ভূমি বন্দোবস্তী রয়েছে। পুনং চান চাকমা ইতোমধ্যে উক্ত জায়গা থেকে এলাকার শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ০.৬০ (ষাট শতক) একর জায়গা 'চিবেরেগা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়' এর নামে দান করেন। অবশিষ্ট ১.৪০ (এক একর ও চল্লিশ শতক) একর জায়গা স্থিতি রয়েছে।

পুনং চান চাকমা সম্প্রতি তার অবশিষ্ট জায়গার একটা অংশে চম্পা চাকমাকে সাময়িকভাবে বসবাস করার জন্য বসতবাড়ি নির্মাণ করার অনুমতি দেন। জায়গার মালিকের সম্মতিক্রমে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় চম্পা চাকমা সম্প্রতি বসতবাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

এক পর্যায়ে বাড়িটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে গেলে পার্শ্ববর্তী চাল্যাতুলি বিজিবি ক্যাম্পের ক্যাম্প কম্যান্ডার মোঃ আনোয়ার সেখানে এসে 'জোন কমান্ডারের আদেশ' এর কথা বলে বাড়িটি নির্মাণে বাধা প্রদান করেন এবং জোন কম্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

বান্দরবানে সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ পোর্টারদেরকে যুদ্ধে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ

বান্দরবান জেলার রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়িতে কেএনএফ বিরোধী অভিযানে সেনাবাহিনী নিরস্ত্র নিরীহ জুম্ম পোর্টারদেরকে জোরপূর্বক মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। জুম্ম পোর্টারদের এভাবে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহারের ফলে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে পোর্টার হিসেবে কর্মরত এক ত্রিপুরা নিহত ও কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

গত ১৬ মে ২০২৩ কেএনএফের এ্যাম্বুশে পড়ে সেনাবাহিনীর দুইজন জওয়ান নিহত ও তিনজন আহত হওয়ার পর রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সেনাবাহিনী গণহারে সাধারণ জুম্ম গ্রামবাসীকে পোর্টার হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে এবং যুদ্ধে তাদেরকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এ পর্যন্ত রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের পাসিং পাড়া থেকে ১৭ জন ও এমটিএস গ্রাম থেকে ৩২ জনসহ প্রায় ১০০ জনের অধিক জুম্মকে সেনাবাহিনী পোর্টার হিসেবে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

গত ১৭ মে ২০২৩ সেনাবাহিনীর একটি দল রুমা উপজেলার রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নে একটি সেনা অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সেনাদলটি রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন জুম্ম গ্রামবাসীকে মালামাল বহন ও বিভিন্ন কাজের জন্য জোরপূর্বক পোর্টার হিসেবে তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করে এবং তাদেরকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য অভিযানের অগ্রভাগে থাকতে বাধ্য করে থাকে। সেনা অভিযানের এক পর্যায়ে বিকাল আনুমানিক ৩টার দিকে সেনাদলটি রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের সলৌপি পাড়া সংলগ্ন এক পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলে হঠাৎ মাইন বিস্ফোরণ ঘটে। এসময় দুই জুম্ম পোর্টার এবং একজন সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়। এরপর আহত ৩ জনকে প্রথমে থানচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দায়িত্বরত এক ডাক্তার

গুরুতর আহত জুয়েল ত্রিপুরাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে গুরুতর আহত আব্রাহাম ত্রিপুরাকেও ডাক্তারের পরামর্শে বান্দরবান সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নিহত পোর্টারের নাম জুয়েল ত্রিপুরা (২৬), পীং-গুলিহা ত্রিপুরা, গ্রাম-বাসিরাম পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, ৩নং রেমাক্রি-প্রাংসা ইউনিয়ন, রুমা উপজেলা। অপর আহত জুম্ম পোর্টার হলো আব্রাহাম ত্রিপুরা (২৯), পীং-শচীন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রাম-বাসিরাম পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, ৩নং রেমাক্রি-প্রাংসা ইউনিয়ন, রুমা উপজেলা।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক তল্লাশি অভিযান

গত ২৪ মে ২০২৩ সকাল আনুমানিক ৯ টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলার ৭ বীর বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন যক্ষ্মাবাজার সেনা ক্যাম্প থেকে ৪০ জনের একটি সেনাদল ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের বারিসগোলা নামক এলাকায় সেনা অভিযান পরিচালনা করে।

এই সেনাদলের অফিসার ও সৈনিক সবাই মাথায় হেলমেট পরিহিত অবস্থায় ছিল এবং তাদের পরিহিত ইউনিফর্ম থেকে সকলের নামফলক সরিয়ে রাখা হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা যায়। অপরদিকে, একই দিনে সকালে পার্শ্ববর্তী উপজেলা বিলাইছড়ির ৩২ বেঙ্গল দীঘলছড়ি সেনা জোন হতে অপর একটি সেনাদল উক্ত অভিযানে যোগ দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। বিলাইছড়ির সেনাদলটি সকাল ১০ টা নাগাদ জুরাছড়ির দুমদুম্যা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বরকলক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান করে।

জুরাছড়িতে নামের মিল থাকায় একজন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী জেল-হাজতে

একটি হত্যা মামলায় তালিকাভুক্ত অভিযুক্ত আসামীর নামের সঙ্গে মিল থাকায় রাঙামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার নিরীহ এক জুম্ম রাঙামাটির কারাগারে বন্দী রয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভুক্তভোগী ওই জুম্মর নাম চিক্কা চাকমা (৫৮), পীং-মৃত জ্বলন্ত বিকাশ চাকমা, মাতা- মৃত জ্ঞান লক্ষী চাকমা, গ্রাম- বালুখালী মুখ, ১৩৩নং জুরাছড়ি মৌজা, জুরাছড়ি উপজেলা। চিক্কা চাকমা পেশায় একজন কৃষক। অপরাধী না হয়েও পুলিশ ও আদালতের ভুলের কারণে গত ২২ মে ২০২৩ থেকে তিনি কারাগারে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

গত ১০ এপ্রিল ২০২০ উপজেলার বনযোগীছড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য হেমন্ত চাকমাকে অজ্ঞাত একদল দুর্বৃত্ত গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনায় নিহতের পিতা লোকবিধু চাকমা বাদী হয়ে জুরাছড়ি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলাটিতে অভিযুক্তের তালিকায় চিক্কা চাকমা নামে এক ব্যক্তিকেও রাখা হয়। কিন্তু সেই চিক্কা চাকমার সুনির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা ও পরিচয় উল্লেখ ছিল না। এদিকে তদন্ত শেষে পুলিশ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে গত ১৩ এপ্রিল ২০২৩ আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। সেই তালিকার ১২ নম্বরে চিক্কা চাকমার নাম রাখা হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৭ মে ২০২৩ তারিখ হত্যা মামলার বাদী লোকবিধু চাকমা (৬২) আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত এক হলফনামার মাধ্যমে উক্ত চিক্কা চাকমা তার ছেলের হত্যা ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় এবং এই চিক্কা চাকমা জামিনে মুক্তি বা মামলা হতে খালাস পেলে তার আপত্তি থাকবে না বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তারপরও আদালত তাকে জামিনে মুক্তি না দিয়ে জেলে প্রেরণ করে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি পৌর এলাকা থেকে দুই জুম্মকে আটক

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শহর এলাকা থেকে পৃথকভাবে সেনাবাহিনী ও যৌথ বাহিনী কর্তৃক দুই আদিবাসী জুম্মকে আটক করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। গত ২৯ মে ২০২৩ বিকাল আনুমানিক ৪ টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল রাঙ্গামাটি শহরের বনরূপা সমতাঘাট এলাকা থেকে রেবতি চাকমা (৫৫), পীং-সুরেশ চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। রেবতি চাকমার বাড়ি রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বন্দুকভাঙা ইউনিয়নের কুড়ামারা গ্রামে।

অপরদিকে, গত ২৭ মে ২০২৩ সকাল ৮ টার দিকে যৌথ বাহিনীর একটি দল রাঙ্গামাটি শহরের ভেদভেদি এলাকার নিজ বাড়ি থেকে সিদ্ধার্থ চাকমা (৬০), পীং- মৃত মধু সুধন চাকমা নামে অপর এক ব্যক্তিকে আটক করে বলে জানা যায়। এইদিন বিকাল ২:৩০ টার দিকে যৌথ বাহিনী হাতকড়া পরা অবস্থায় সিদ্ধার্থ চাকমাকে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পানছড়ির সীমানা পাড়াবাসীর পালিত গরুগুলোকে 'ভারতীয় গরু' বলে বিজিবি কর্তৃক জব্দের চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলাস্থ পানছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম সীমানা পাড়া থেকে বিজিবি কর্তৃক গ্রামবাসীদের গৃহপালিত গরু 'ভারতীয় গরু' বলে জোরপূর্বক জব্দ করার চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ৫ জুন ২০২৩ সকালে বিজিবির ডাইন চন্দবাড়ী ক্যাম্প থেকে একদল বিজিবি সদস্য পানছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম ধুধুকছড়া সীমানা পাড়ায় আসে। এ সময় তারা 'ভারতীয় গরু' বলে কয়েকজন গ্রামবাসীর পালিত গরু জব্দ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকার নারী-পুরুষসহ সকলে মিলে বিজিবি'র এমন অন্যায় কাজের প্রতিবাদ জানায় এবং প্রতিরোধ করে। পরে এলাকাবাসীদের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে বিজিবি সদস্যরা গরুগুলো রেখে ক্যাম্পে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ঘরবাড়ি তল্লাশি

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার ৪ জুন ২০২৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:৩০ টার দিকে মাইনি জোনের অধীন ৩ বীর-এর আওতাধীন দুরছড়ি বাজার সেনা ক্যাম্পের ১৫ জনের একটি দল একটি ট্রলার বোট যোগে সারোয়াতুলি ইউনিয়নের দক্ষিণ খাগড়াছড়ি নৌ-ঘাটে আসে। সেখান থেকে তারা উত্তর খাগড়াছড়ি গ্রামে গিয়ে জুম্মদের বাড়ি-ঘরে ব্যাপক তল্লাশি চালায়।

এসময় সেনা সদস্যরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে জুম্মদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি কার্ড), জন্ম সনদপত্রসহ ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ সব দলিল দেখাতে বলে। কয়েক জন নারী-পুরুষকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ২-৩ ঘন্টাব্যাপী তল্লাশি অভিযান চালিয়ে সেনা সদস্যরা ২৩ জন জুম্মদের মোবাইল নাম্বার এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার নিয়ে যায়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের বান্দরবানে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু ও খাগড়াছড়ি জেলা থেকে সেনামদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের ৫০ জনের একটি সশস্ত্র দল বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। গত ৬ জুন ২০২৩ রাতে বা পরদিন সকালে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এসব সন্ত্রাসীদের বান্দরবানে নিয়ে গিয়েছিল বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়।

গত ৫ জুন ২০২৩ বিকাল আনুমানিক ৪ টার দিকে লংগদু উপজেলার ১নং আটরকছড়া ইউনিয়নের করল্যাছড়ি এলাকা থেকে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের ২০-২২ জনের একটি সশস্ত্র দল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২টি জীপ গাড়িতে করে খাগড়াছড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। খাগড়াছড়ি থেকে আরও ২৫-৩০ জন ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী সদস্য নিয়ে অন্তত ৫০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী বান্দরবানে নিয়ে যাওয়া হয় বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়।

সাংগু মৌজায় একতরফাভাবে বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলাধীন সাংগু মৌজার লামায় জুম্মদের ৫,৭৬০ একর জমিতে সাংগু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং পবম (শা-৩) ১১/৯৩/১৯০ তারিখ ৭/৩/১৯৯৬ মূলে প্রথম দফায় ৫,৭৬০ একর জমিতে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি করে। সেই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০১০ সাল পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বন অধিশাখা-২ স্মারক নং পবম/বন শা-২/০২ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ১৩/২০১০/২১২ তারিখ ৪/৬/২০১০ বাস্তবায়নে পুনঃরায় প্রজ্ঞাপন জারি করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন জুম্ম এলাকাবাসী। উক্ত আদেশ বাতিল ও পাড়াবাসীদের উচ্ছেদ থেকে রক্ষার দাবিতে ১৪ জুন ২০২৩ বান্দরবান প্রেস ক্লাব চত্বরে মানববন্ধন আয়োজন ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

বিলাইছড়ি ও জুরাছড়ি ব্যাপক সেনা অভিযান

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বিলাইছড়ি ও জুরাছড়ি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ও বিশেষ এক সেনা অভিযান পরিচালিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। উক্ত সেনা অভিযানে অংশগ্রহণের লক্ষে গত ১৫ জুন ২০২৩ বিলাইছড়ি সদরের ৩২ বীর দীঘলছড়ি সেনা জোন থেকে ২০-২৫ জনের একটি সেনাদল বিলাইছড়ি উপজেলার ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের তাগলকছড়া মোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ১৫-২০ জনের অপর একটি সেনাদল একই ইউনিয়নের বাঙালকাবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান গ্রহণ করে।

অপরদিকে একই লক্ষ্য নিয়ে জুরাছড়ি উপজেলার মৈদুং ইউনিয়নের ফকিরাছড়া সেনা ক্যাম্পেও আনুমানিক ২০০ জনের একটি সেনাদল অবস্থান গ্রহণ করে। এই সেনাদলটি সেখান থেকে বিভক্ত হয়ে জুরাছড়ি-বিলাইছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী ফকিরাছড়া হিজিং (সংকীর্ণ পথ) এবং বিলাইছড়ি উপজেলার ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের নলকাবাছড়া মারমা পাড়া পর্যন্ত টহল ও তল্লাশি অভিযান চালায় বলে জানা যায়।

এদিকে বিলাইছড়ি উপজেলার শিলছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে ৫০-৬০ জনের একটি সেনাদল বিলাইছড়ি-রাঙামাটি সদরের কাইন্দা এলাকা ও জুরাছড়ি সীমান্তের বড় মোন অর্থাৎ কালো

পাহাড়ে অবস্থান নেয়। এছাড়া ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ধুপশীল সেনা ক্যাম্প থেকে অর্ধশতাধিক সেনা সদস্য দীঘলছড়ি মোনে অবস্থান করে।

মগবান ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান

গত ১৪ জুন ২০২৩ রাঙামাটির সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের মরিচ্যা বিল সেনা ক্যাম্প ও জীবতলি ইউনিয়নের গবঘোনা সেনা ক্যাম্প থেকে মোট ৪৮ জনের একটি সেনা দল মগবান ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের গরগজ্যাছড়ি এলাকায় সেনাবাহিনীর মহড়া ও টহল অভিযানে খবর পাওয়া যায়। তবে পরদিন ১৫ জুন ২০২৩ সেনাবাহিনীর দুটি দলই স্ব স্ব ক্যাম্পে ফিরে যায় বলে জানা গেছে।

অপরদিকে গত ১৬ জুন ২০২৩, সকাল ১১টার দিকে মরিচ্যা বিল সেনা ক্যাম্প হতে সুবেদার রিয়াজ-এর নেতৃত্বে আবারও ২০ জনের একটি সেনাবাহিনীর টহল দল কাইন্দ্যা ব্রিজে এসে পৌঁছায়। বৃষ্টির কারণে ব্রিজের আশেপাশের দোকানে অবস্থান করে সেনা সদস্যরা। বৃষ্টি থামানোর পর আনুমানিক ২টার দিকে কাইন্দ্যা সাগরবান্দা নামক স্থানে যায়। তারপর বিকাল ৫টার দিকে এগজ্যাছড়ি-দুত্তাং হয়ে পাংখোংয়া পাড়া সেনা ক্যাম্পের উদ্দেশ্য রওনা দেয় উক্ত টহল দলটি।

রাঙ্গামাটি সদর ও নান্যাচারে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান

অন্যদিকে একইদিন ১৯ জুন ২০২৩, সকাল ১০:৩০ কার দিকে সুবলং সেনা ক্যাম্প ও রাঙামাটি সেনা জোন হতে যৌথভাবে দুটি ট্রলার যোগে ৬০-৭০ জনের আরেকটি সেনাবাহিনীর টহল দল বালুখালী ইউনিয়ন পরিষদের ভাঙ্গা বিল্ডিং এ অবস্থান করে। তার পরদিন ২০ জুন সকাল ৯:৩০ টার দিকে উক্ত সেনাবাহিনীর টহল দল হতে ১৫ থেকে ২০ জনের একদল সেনা কাইন্দ্যা মূখ পাড়ায় টহল দেয়। সেখানে অবস্থানের পর বেলা ২ টার দিকে টহল দলটি ভাঙ্গা বিল্ডিং-এ ফিরে যায়। অন্যদিকে গত ২০ জুন ২০২৩, জীবতলী ইউনিয়নের গবঘোন সেনা ক্যাম্প ও কাপ্তাই সেনা জোন হতে যৌথভাবে ৫০ থেকে ৬০ জনের আরো একদল সেনা জীবতলী ইউনিয়নের রেংক্ষ্যং বাজার এলাকায় টহল অভিযান চালায়।

এদিকে ১৯ জুন ২০২৩, সকাল ৯ টার দিকে রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার ২নং নান্যাচর ইউনিয়নের সেনা জোনের জনৈক মেজর ও জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জনের একটি সেনাবাহিনীর টহল দল ছয়কুড়ি বিল পাড়ায় তল্লিতল্পা সহ টাবু টাঙিয়ে অবস্থান নেয়। সেনাবাহিনীর এই টহল দলটি ৫ দিন পর্যন্ত উক্ত স্থানে অবস্থান করে এলাকায় টহল দেয়। এরপর ২০ জুন ২০২৩, সকাল ১০ টার দিকে নান্যাচর সেনা জোন নিয়ন্ত্রিত ৫নং বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের খারিক্ষ্যং সেনা ক্যাম্প থেকে ২৫ থেকে ৩০ জনের একটি সেনা দল কান্দবছড়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। এরপর বিদ্যালয়টি বন্ধ থাকায় বিকাল ৩ টার দিকে ক্যাম্পে ফিরে চলে যায়।

ফটিকছড়িতে র‍্যাব কর্তৃক ২ জনকে গ্রেপ্তার

গত ১৬ জুন ২০২৩ চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার গাজির দীঘি এলাকা থেকে একটি পিস্তল ও গুলিসহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৭। আটক দু'জনই খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বাসিন্দা। আটককৃতরা হলো- অভি চাকমা ওরফে বিজয় (১৯), পিতা- সুশীল চাকমা, গ্রাম- রান্যামাছড়া, দুল্যাতলী ইউনিয়ন, লক্ষ্মীছড়ি ও কৃতি বিকাশ চাকমা (২৪), পিতা- সাধন চাকমা, গ্রাম- মেম্বার পাড়া, দুল্যাতলী ইউপি, লক্ষ্মীছড়ি। আটককৃতদের মধ্যে কৃতি বিকাশ চাকমা লক্ষ্মীছড়ি বাজারে মোটর সাইকেল গ্যারেজে কাজ করে। তার পিতা সাধন চাকমা দুল্যাতলী ইউনয়ন পরিষদের একজন মেম্বার বলে জানা যায়।

কাপ্তাইয়ের রাইখালীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই নিরীহ জুম্মকে আটক

গত ২৪ জুন ২০২৩ রাত ৮:০০ টার দিকে সেনাবাহিনীর দুইটা গাড়িযোগে কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগর পাড়া গিয়ে বাসিং মং মারমার নিজস্ব দোকান ঘেরাও করে। কোনো কিছু বলে ওঠার আগে বাসিং মংকে চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় সেনাবাহিনী। বাসিংমং মারমা পেশায় একজন দোকানদার। পাশাপাশি তিনি ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেল চালিয়ে জীবনধারণ করেন।

এর পরের দিন ২৫ জুন ২০২৩ একই এলাকায় আবারও অংসি মং মারমা নামে আরেক জুম্ম দোকানদারকে আটক করে নিয়ে যায় সেনাবাহিনী। আটককৃত দুজনকে চোখ বাঁধা অবস্থায় গাড়িতে করে নিয়ে যায় সেনাবাহিনী।

আইন মোতাবেক ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে আদালতে হাজির না করে সেনাবাহিনী অবৈধভাবে ৩/৪ দিন পর্যন্ত কাপ্তাই সেনা ক্যাম্পে আটকে রাখে। অবৈধভাবে ক্যাম্পে আটকে রাখার পর অস্ত্র গুঁজে দিয়ে উক্ত দুজনকে সেনাবাহিনী ২৮ জুন ২০২৩ সকালে চন্দ্রঘোনা থানায় কাছে সোপর্দ করে এবং সাথে সাথে তাদেরকে রাঙামাটি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেড আদালতে হাজির করা হয়।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

মিজোরামে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে গিয়ে এক বম পাদ্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

গত ৪ জানুয়ারি ২০২৩ কেএনএফ ও সেনাবাহিনীর চাপের মুখে বান্দরবানের রুমা উপজেলার রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের দুর্গম এলাকা থেকে মিজোরামে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করতে গিয়ে দুর্গম পাহাড়ি পথ পাড়ি দেওয়ার সময় বম জনগোষ্ঠীর সমখুপ বম (৮১) নামে একজন খ্রীষ্টান পাদ্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তিনি ট্রাইবাল ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ বাংলাদেশ-এর পাস্টর হিসেবে ১৯৭৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্বরত ছিলেন।

জানা যায় যে, জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে রুমার রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের দুর্গম এলাকা থেকে সমখুপ বমসহ বম জনগোষ্ঠীর একদল গ্রামবাসী মিজোরামে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণের জন্য মিজোরাম-বাংলাদেশ সীমান্তে যান। কিন্তু মিজোরামে প্রবেশ করতে না পারায় তারা পুনরায় স্ব স্ব গ্রামে ফিরে আসার উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। স্ব স্ব গ্রামে ফেরার পথে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার ভেতরে পৌঁছলে ৪ জানুয়ারি পাদ্রী সমখুপ বমের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

গুইমারায় সেনা-মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) কর্তৃক দুই গ্রামবাসীকে মারধর

গত ১০ জানুয়ারি ২০২৩ সন্ধ্যা ৭টার সময় খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা বাজার থেকে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) দলের নবীন চাকমার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সদস্য ৭টি মোটর সাইকেল যোগে গুইমারা সদর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বাইল্যাছড়িতে গিয়ে কোনো কারণ ছাড়াই গ্রামের বাসিন্দা ইয়ক্যা চাকমা (৩২), পিতা-মৃত লক্ষ্মীধন চাকমা ও বিকম ত্রিপরা, পিতা-মৃত সুশংকর ত্রিপুরাকে মারধর করে।

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী ও সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক এক জুম্মকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার

গত ১১ জানুয়ারি ২০২৩ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের থলিপাড়া থেকে সেনাবাহিনী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা মিলে এক নিরীহ জুম্মকে আটক করে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। আটক ব্যক্তির নাম নব রতন ত্রিপুরা (৪৫), পিতা- চন্দবসু ত্রিপুরা, গ্রাম-পুনর্বাসন পাড়া, মাইসছড়ি ইউনিয়ন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।

জানা যায়, ঘটনার রাতে ভুক্তভোগী নব রতন ত্রিপুরা থলি পাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যান। রাত ৯টার দিকে সেনাবাহিনীর বিজিতলা সাব জোন থেকে সাদা পোশাকধারী ৩ জন সেনা সদস্য ও ২ জন ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সদস্য সেখানে গিয়ে কোনো কারণ ছাড়াই তাকে আটক করে বিজিতলা সাবজোনে নিয়ে যায়। রাতভর আটক রেখে নির্যাতনের পরদিন ১২ জানুয়ারি সকালে তাকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। চন ত্রিপুরা, পিতা-কালিবন্ধু ত্রিপুরা নামে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের একজনকে চিনতে পেরেছে বলে গ্রামবাসীরা জানায়।

রুমায় বমপার্টি কর্তৃক ইসলামি জঙ্গীদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ৩ জন চিহ্নিত

ইসলামি জঙ্গী সংগঠন 'জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া'র সদস্যদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রশিক্ষক বা ওস্তাদ হিসেবে কাজ করছে বমপার্টি নামে খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর চারজন সামরিক সদস্য। কেএনএফের এই চারজন প্রশিক্ষক হলেন- (১) লালমুনঠিয়াল বম, যিনি নিজেকে কর্নেল সলোমান এবং কেএনএফের তথ্য ও গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন; (২) ভাঙচুংলিয়ান বম, যিনি কেএনএফের সাধারণ সম্পাদক ও সামরিক শাখার কেএনএ-এর প্রধান হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন; (৩) লালমুন সাং বম, যিনি 'পাদন' ছদ্মনাম ব্যবহার করে থাকেন এবং কেএনএ-এর একজন কম্যান্ডার হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন; এবং (৪) দিদার ওরফে চম্পাই, তবে তার সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানা যায়নি।

রুমায় কেএনএফ কর্তৃক দুই গ্রামবাসীকে মারধর

সেনা-মদদপুষ্ট বমপার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর সন্ত্রাসী কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রুমা উপজেলায় পৃথক দুই ঘটনায় দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী আটক ও ব্যাপক মারধরের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আটক ও মারধরের শিকার দুই জুম্ম হলেন- (১) সিংলুম লিয়ান লুসাই, পীং-উ টেইয়ামিটিইয়া লুসাই, ঠিকানা-রুমা সদর এলাকা ও (২) লুম্যেঅং মারমা (৩২), পীং-ঙৈচিংমং মারমা, গ্রাম-মুয়ালপি পাড়া, রুমা সদর। সিংলুম লিয়ান লুসাই একজন স্থানীয় আদা ও হলুদ ব্যবসায়ী এবং লুম্যেঅং মারমা একজন সাধারণ জুমচাষী বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ বমপার্টি সন্ত্রাসীরা সিংলুম লিয়ান লুসাইকে রুমা সদর এলাকা থেকে ধরে তাদের আস্তানায় নিয়ে যায়। সেখানে দুইদিন আটক রেখে সিংলুম লিয়ান লুসাইকে ব্যাপক মারধর করা হয়। এরপর গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ বম পার্টি সন্ত্রাসীরা শারীরিকভাবে জখম অবস্থায় সিংলুম লিয়ান লুসাইকে ছেড়ে দেয়। অপরদিকে গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ বমপার্টি সন্ত্রাসীদের ২০ জনের একটি সশস্ত্র দল বাসত্লাং পাড়া থেকে মোটর সাইকেল যোগে রুমা সদর এলাকার মুয়ালপি পাড়ায় গিয়ে প্রথমে লুম্যেঅং মারমাকে খোঁজ করে। কিন্তু এসময় লুম্যেঅং মারমা বাড়িতে না থাকায় সন্ত্রাসীরা লুম্যেঅং মারমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পরে বিকেলে লুম্যেঅং মারমা জুম থেকে ফিরে আসলে সন্ত্রাসীরা তাকে ধরে ব্যাপক মারধর করে।

নান্যাচরে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) কর্তৃক তিন গ্রামবাসীকে অপহরণ

গত ২২ জানুয়ারি ২০২৩ বেলা ২টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর সদর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের তৈচাকমা মুখ পাড়া থেকে সেনামদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসী কর্তৃক এক কার্বারিসহ তিন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তবে একই দিন সন্ধ্যার দিকে অপহৃত গ্রামবাসীরা মুক্তি পেয়েছেন বলেও জানা যায়। অপহরণের শিকার ব্যক্তিরা হলেন- তৈচাকমা মুখ পাড়ার কার্বারি বন বিহারী খীসা (৪৫), সুশীল বিহারী খীসা (৫৫) ও অনয় দত্ত খীসা (৫০)।

জানা যায়, ঘটনার দিন জ্ঞান চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের একটি দল তৈচাকমা মুখ পাড়ায় আসে। আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রথমে গ্রামের কার্বারি বন বিহারী খীসা ও সুশীল বিহারী খীসার বাড়ি ঘেরাও করে এবং বাড়ির সকল সদস্যদের মোবাইল কেড়ে নেয়। এরপর সন্ত্রাসীরা কার্বারি বন বিহারী খীসা ও সুশীল বিহারী খীসাসহ অনয় দত্ত খীসা নামে আরও এক গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ইউপিডিএফ কর্তৃক একজন জুম্মকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে রনি চাকমা নামে একজনকে প্রথমে আটক করে ইউপিডিএফের প্রাক্তন সদস্য নতুন জয় চাকমা এবং ইউপিডিএফ সমর্থিত প্রাক্তন ইউপি সদস্য নতুন জয় চাকমা মাচালং থানায় সোপর্দ করার চেষ্টা করে। কিন্তু অপরাধের কোনো আলামত না থাকায় পুলিশ রনি চাকমাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। পরে থানা থেকে নিয়ে যাওয়ার পর দেশীয় তৈরি গাদাবন্দুক গুঁজে দিয়ে রনি চাকমাকে সেদিন সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকায় ইউপিডিএফের নতুন জয় চাকমারা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

রাজস্থলীতে মগপার্টি কর্তৃক এক জুম্মকে গুলি করে হত্যা

সেনা-মদদপুষ্ট মগপার্টি খ্যাত এমএলপি সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক রাঙ্গামাটির রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া থেকে সম্রাট চাকমা (৩২) নামে একজন নিরীহ জুম্মকে তুলে নিয়ে কাপ্তাই উপজেলার রাইখালীতে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে চলে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, সেদিন সেনাবাহিনীর একদল সদস্য কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের গংগ্রিছড়া এলাকায় আসে। এ সময় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মাহিন্দ্র গাড়িতে করে মগপার্টির সন্ত্রাসীরাও আসে।

রুমায় কেএনএফের হুমকিতে ১৫০ পরিবার গ্রাম ছাড়া

বান্দরবানের রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম থেকে বম ও মারমা গ্রামবাসীদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ইসলামি জঙ্গীগোষ্ঠী প্রশ্রয় প্রদানকারী বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীদের হুমকি দেয় এবং সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণের দোহাই দিয়ে এলাকায় গুলিবর্ষণ করা হবে বলে গ্রামবাসীদের হুশিয়ারি প্রদান করে।

গত ২৭ জানুয়ারি সকাল ১০:০০ ঘটিকা পাইন্দু ইউনিয়নের মুয়ালপি পাড়ার ভেতরে বমপার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে দূর থেকে গুলি বিনিময় হয়। এরপর ভয় পেয়ে পাইন্দু ইউনিয়নের বাসতালাই পাড়া থেকে ৪৫ পরিবার, আর্থা পাড়া থেকে ৭০ পরিবার, হ্যাপি হিল পাড়া থেকে ৩৫ পরিবারসহ আনুমানিক ১৫০ পরিবার বম জনগোষ্ঠী উচ্ছেদ হয়ে মুয়ালপি পাড়া, বেথেল পাড়া ও রুমা সদরে আশ্রয় নেয়।

২৮ জানুয়ারি বমপার্টির ভয়ে পাইন্দু ইউনিয়নের মুয়ালপি পাড়া থেকে কমপক্ষে ৪৫ পরিবারের ১৭০ জন মারমা গ্রামবাসী উচ্ছেদ হয়ে রুমা সদরে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া প্রাংসা পাড়া, ইলি চান্দা পাড়া, ক্যকটাই পাড়া, ক্রোংক্ষ্যং পাড়াসহ রুমার প্রায় ১২টি পাড়ার লোকজন ৩দিন ধরে আতঙ্কে নিজেদের গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন জঙ্গলে আশ্রয় নেয় বলে জানা যায়।

রুমায় কেএনএফ কর্তৃক একই পরিবারের ৫ বম গ্রামবাসীকে অপহরণ, ১ জনকে হত্যা

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সন্ধ্যার দিকে বান্দরবানের রুমা উপজেলার বগালেক থেকে বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ সন্ত্রাসীদের একটি সশস্ত্র গ্রুপ বগালেক এলাকায় স্থানীয় গীর্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালে প্রবেশ করে। এসময় সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে লালরামচনহ বম ওরফে লারাম বম, তার পিতা সাংলিয়াম বম, স্ত্রী নুজিং বম ও তার ছেলেসহ পাঁচজনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে অপহরণকারীরা অন্যান্যদের ছেড়ে দিলেও লারাম বমকে ছেড়ে দেয়নি। পরে তাকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

অপহরণের ৫ দিন পর গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলার রুমা সদর ইউনিয়নের বগালেক এলাকা থেকে বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক অপহৃত লালরামচনহ্ বমের লাশ উদ্ধার করা হয়। সদর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের হারমন পাড়ার পার্শ্ববর্তী একটি ঝর্ণার খাদে লারাম বমের লাশটি পাওয়া যায়। অপহরণকারীরা লারাম বমকে তার জিহ্বা কেটে দিয়ে, চোখ ছিদ্র করে এবং গলা কেটে দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

রুমা-বিলাইছড়িতে কেএনএফ কর্তৃক গ্রাম ছেড়ে দিতে গ্রামবাসীদের নির্দেশ

বান্দরবানের রুমা ও রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে বমপার্টি সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে গ্রামবাসীদেরকে হুমকি প্রদান, ৪ জন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীকে অপহরণ ও দুই দিন হয়রানির পর মুক্তি, অন্তত ২টি স্কুল দখল করে বমপার্টি সশস্ত্র সন্ত্রাসীর অবস্থান, ভয়ে অন্তত ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায় যে, বমপার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) নির্দেশ দিলে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়নের গঙ্গাছড়া (টাইগার পাড়া) থেকে পাড়ার কার্বারি (গ্রাম প্রধান) সহ ৪ জন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসী রুমার পাইন্দু ইউনিয়নের আর্থাহ পাড়ায় কেএনএফের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সন্ত্রাসীরা তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীদেরকে তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। দেখা করতে যাওয়া ৪ তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীকে দুইদিন পর্যন্ত আটকে রেখে হয়রানি করার পর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ছেড়ে দেয় বমপার্টির সন্ত্রাসীরা। ভুক্তভোগী গঙ্গাছড়ার গ্রামবাসীরা হলেন- পুরিহিত তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে কালিন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (৫৮), সুরঙ্গ তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে রুইধন তঞ্চঙ্গ্যা (৫৫), লজিয়ং তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে আলদ্বগা তঞ্চঙ্গ্যা (৪৬) ও জুগামন তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে নোইয়া তঞ্চঙ্গ্যা (৩৯)।

রুমায় বমপার্টি কর্তৃক গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে ৭টি মারমা গ্রামবাসীকে নির্দেশ

বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের মুয়ালপি পাড়ার আশেপাশের ৭টি মারমা পাড়ার মুরুব্বী ও কার্বারিদের নিয়ে মিটিং ডেকে বমপার্টি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা কর্তৃক হুমকির অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, গত ৫ মার্চ দুপুর ১২.০০ টার দিকে মুয়ালপি পাড়ার পার্শ্ববর্তী চাইনাগ্র পাড়া, উজানী পাড়া (নিউ), উজানী পাড়া (ওল্ড), নিয়ংখিয়ং পাড়া, সেগুন পাড়া এবং সেগুন পাড়া (নীচে) সহ প্রায় ৭টি মারমা পাড়ার মুরুব্বীদেরকে ডাকা হয়।

উক্ত মিটিঙে বমপার্টি সন্ত্রাসীরা মারমা গ্রামবাসীদেরকে নির্দেশ দেয় যে, গ্রামের কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো প্রতিপক্ষ সশস্ত্র গ্রুপে যোগ দিয়ে থাকলে তাদের তালিকা দিতে হবে এবং প্রতিপক্ষ সশস্ত্র গ্রুপ গ্রামে আসলে তাদেরকে খবর দিতে হবে। অন্যথায় চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে মারমা গ্রামের মুরুব্বিদের হুমকি প্রদান করে বমপার্টি সন্ত্রাসীরা।

রেইংখ্যং ভ্যালির অন্তর্গত গঙ্গাছড়া তঞ্চঙ্গ্যা পাড়াবাসীকে কেএনএফ নামক বমপার্টির চলমান হুমকির মধ্যে গত ৬ মার্চ ২০২৩ সেনাবাহিনীর একটি দল গঙ্গাছড়ায় টহল দিতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা পাড়াবাসীকে বলেছিল যে, তারা গ্রামবাসীদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না এবং পারবে বলেও তারা মনে করে না। অতএব নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে গ্রামবাসীদেরকে পরামর্শ দিয়েছে সেনা সদস্যরা। সেনাবাহিনীর এহেন পরামর্শে তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৭ মার্চ ২০২৩ গঙ্গাছড়া পাড়া থেকে ৬টি পরিবারের ৫১ জন গ্রামবাসী নিজেদের উদ্যোগে নিরাপদ এলাকায় সরে গেছে বলে জানা যায়।

মিজোরামে কেএনএফ কর্তৃক এক বম ব্যক্তিকে খুন

গত ১৯ মার্চ ২০২৩ বমপার্টির সন্ত্রাসীরা ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লংতলাই জেলার মংবুহ বম পাড়ার দিকে ধরে নিয়ে সাংলিয়ানজুয়াল বম ওরফে পাসেন বমকে (২৯) নৃশংসভাবে হত্যা করে বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া যায়। তবে কী কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে তা বিস্তারিত জানা যায়নি। হত্যার শিকার সাংলিয়ানজুয়াল বম ওরফে পাসেন বম এর বাড়ি বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার আর্থাহ পাড়ায় বলে জানা যায়।

রুমায় সেনাবাহিনী নির্দেশে সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক ৮ জন বমকে গুলি করে হত্যা

গত ৬ এপ্রিল ২০২৩ সকাল সাড়ে ৬:০০ টার সময়

সেনা-মদদপুষ্ট সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক)-এর ২০-২৫ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের খামতাং পাড়ায় প্রবেশ করে ফাঁকা গুলি ছুড়ে পাড়াবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পরে সন্ত্রাসীরা একে একে পাড়ার ২২ জনকে আটক করে রাখে।

পরে আটককৃত ২২ জনের মধ্য থেকে ১৫ জনকে ছেড়ে দেয় সেনা-মদদপুষ্ট সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা। বমপার্টি কর্তৃক হামলা চালানো হলে বন্দুকযুদ্ধে বমপার্টির একজন সশস্ত্র সদস্য নিহত হয় এবং রাগান্বিত হয়ে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা আটককৃত ৭ জনকে গুলি করে হত্যা করা করে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন– ১. ভান দু বম (৩৫), ২. সাং খুম বম (৪৫), ৩. সান ফির থাং বম (২২), ৪. বয়রেম বম (১৭) ৫. জাহিম বম (৪০), ৬. লাল লিয়ান ঙাক বম (৪৪) ও ৭. লাল ঠাজার বম (২৭)। এর মধ্যে ৬ জন জুরভারাং পাড়ার ও ১ জন পানখিয়াং পাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

রোয়াংছড়ি-রুমায় ভয়ে কয়েকটি গ্রামের গ্রামবাসীর পলায়ন

গত ৬ এপ্রিল ২০২৩ বান্দরবানের রোয়াংছড়ি ও রুমা উপজেলার সীমান্তবর্তী খামতাং পাড়ায় সেনামদদপুষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক ৮ জনকে নৃশংসভাবে হত্যার পর এলাকার বাসিন্দারা ভয়ে-আতঙ্কে জীবন বাঁচাতে নিজেদের বসতবাড়ি ছেড়ে ২০ পরিবারের ৬৪ জন রুমা সদরের বম সোশ্যাল কাউন্সিল হলরুমে এবং ৪৯ পরিবারের ১৯২ জন রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আশ্রয় কোনোর খবর পাওয়া যায়।

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড পাইংক্ষ্যং পাড়া থেকে শিশু ও বৃদ্ধসহ ৬২ পরিবারের ২১০ জন ওই স্কুলে আশ্রয় নেয়। প্রায় ৯-১০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছান তারা। স্কুলে আশ্রয় কোনো লোকদের কাছ থেকে জানা যায়, পাইংক্ষ্যং পাড়া থেকে কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ চাঁদের গাড়িতে করে ৯২টি বম ও ১টি মারমা পরিবার সকাল ১১ টায় রওনা দেয় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পাইংক্ষ্যং পাড়ার ৬২ পরিবারের ২১০ জনের একটি দল প্রথমে রোয়াংছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছায়। পাশের ক্যপ্লুং পাড়া থেকেও আরও ৪০-৫০ পরিবার পালিয়ে আসার কথা জানা যায়।

মহালছড়িতে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) কর্তৃক একজন যুবককে অপহরণ

গত ৯ এপ্রিল ২০২৩ সকাল সাড়ে ৯ টার সময় খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার ২৪ মাইল এলাকা থেকে সেনা মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসী কর্তৃক জুয়েল চাকমা (২০), পিতা-নিশী কুমার চাকমা, গ্রাম- রাঙ্গী পাড়া, ৭নং ওয়ার্ড, নান্যাচর সদর ইউনিয়ন নামে এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। অপহৃত ব্যক্তি একজন ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালক বলে জানা যায়। পরে বিকালে ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে সন্ত্রাসীরা তাকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

কাট্টলী এলাকাবাসী থেকে ইউপিডিএফ কর্তৃক মোবাইল ফোন ছিনতাই

গত ১২ এপ্রিল ২০২৩ প্রসিত নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার কাট্টলী এলাকার পাগলীছড়া, কিচিংছড়া ও কুকিছড়া গ্রামের অধিবাসীদের ব্যবহৃত সকল মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এ সময় উক্ত গ্রামগুলিতে কার্ফ্যু জারি করে সন্ধ্যার পূর্বেই স্ব স্ব বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়া গ্রামবাসীদের জন্য বাধ্যতামূলক নিয়ম জারি করেছে। সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে পথেঘাটে কাউকে দেখলে সোজা গুলি করবে বলে ঘোষণা দেয় তারা।

রুমায় কেএনএফ কর্তৃক দুই মারমা গ্রামবাসীকে অপহরণ

গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ রাতে সেনা-মদদপুষ্ট বম পার্টি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল রুমার মুয়ালপি পাড়ায় এসে মংনাক মারমা (৪২),পীং-ক্যচিং মারমা, গ্রাম- মুয়ালপি পাড়া, পাইন্দু ইউনিয়ন ও মংবাসিং মারমা (৩৬), পীং-শৌক্যউ মারমা, গ্রাম-ঐ নামে দুই গ্রামবাসীকে স্ব স্ব বাড়ি থেকে অপহরণ করে একই গ্রামের আশেপাশে একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।

এরপর সেখানে উক্ত দুই গ্রামবাসীকে সারারাত আটক রেখে এবং মারধর করে ১৮ এপ্রিল ২০২৩ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

ইউপিডিএফ কর্তৃক সাজেকে ১০ গ্রামের জুম্মদেরকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারাম এলাকার ১০ জুম্ম গ্রামের লোকদের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, গত ৩ মে ২০২৩ গঙ্গারাম এলাকার উক্ত ১০ গ্রামের মুরুব্বিদের নিয়ে ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসীরা বাঘাইহাট

এলাকার করল্যাছড়ি নামক স্থানে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় ইউপিডিএফ গ্রামের মুরুব্বিদের ভয় দেখিয়ে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে। এসময় ইউপিডিএফ এর পক্ষে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দুই পরিচালক অক্ষয় চাকমা ও আদর্শ চাকমা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

সভায় বিশেষ কিছু আলোচনা করা না হলেও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা গ্রামের মুরুব্বিদের এই বলে নির্দেশ দেয় যে, আগামী দুই মাসের মধ্যে স্ব স্ব গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে। যারা এই নির্দেশের বরখেলাপ করবে তাদেরকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে বলেও হুমকি প্রদান করে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা।

রোয়াংছড়িতে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) কর্তৃক ৩ বম গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা

বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলায় ৩ বম গ্রামবাসীকে সেনা মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, গত ৮ মে ২০২৩ দুপুরের দিকে রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের পাইক্ষ্যং পাড়ার রিজার্ভ এলাকায় ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা ব্রাশ ফায়ার করলে ঘটনাস্থলেই বম সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি নিহত হন এবং অপর একজন আহত হন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন- নেমথাং বম (৪৩), পীং- দোখার বম; লাল লিয়ান বম (৩২), পীং-লিয়ান থম বম ও সিমলিয়ান থাং বম (৩০) এবং আহত ব্যক্তির নাম মানসার বম।

নিহতদের সবাই রোয়াংছড়ির রোনিন পাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং নিহতদের মধ্যে নেমথাং বম রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন এবং লাল লিয়ান বম মোটর সাইকেল চালক বলে জানা যায়। ঘটনার সময় উক্ত ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরের দিকে যাচ্ছিলেন বলে জানা যায়। জানা গেছে, ভয়ে-আতঙ্কে ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন লাশ গ্রহণ করতে যায়নি। ফলে পুলিশের কাছ থেকে ৯ মে লাশ গ্রহণ করেন বম সোশ্যাল কাউন্সিলের নেতা লালজার বম।

এ নিয়ে বিগত এক মাসের ব্যবধানে দুই দফায় রোয়াংছড়িতে সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ১১ জন নিরীহ বম আদিবাসীকে হত্যা করা হল। ফলে ভুক্তভোগী পরিবার ও এলাকার জনগণের মধ্যে গভীর আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং আতঙ্কে অনেকেই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

সুবলঙে চাঁদাবাজি নিয়ে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সেটেলার মুসলিমদের মধ্যে মারামারি

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন সুবলং বাজারে গত ১২ মে ২০২৩ শুক্রবার সকালের দিকে চাঁদা উত্তোলন নিয়ে সেনামদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সেটেলার বাঙালিদের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও দ্বন্দ্ব এবং একপর্যায়ে মারামারি হয়েছে বলে জানা যায়। তবে পরে সেনাবাহিনীর মধ্যস্থতায় তা সমাধান হয় বলে জানা যায়।

জানা যায়, সুবলং সেনা ক্যাম্পের সেনাবাহিনীর নাকের ডগায় প্রকাশ্য দিবালোকে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীরা কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় অবস্থিত সুবলং বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা উত্তোলন করে আসছে। গত ১২ মে ২০২৩ সুবলং বাজারে গণতান্ত্রিক (ইউপিডিএফ) ও বরুণাছড়ি এলাকা থেকে আসা কয়েকজন সেটেলার মুসলিম মালামাল বিক্রেতার মধ্যে চাঁদা উত্তোলন নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক (ইউপিডিএফ) এর এক সদস্য জনৈক সেটেলারকে লাথি মেরে গণতান্ত্রিক (ইউপিডিএফ) সদস্যরা সেখান থেকে চলে যায়। এরপর সেটেলার বাঙালিরা জড়ো হতে থাকে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করে। বিষয়টির ব্যাপারে খবর পেলে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য ঘটনাস্থলে আসে এবং সেখান থেকে ৫ জন সেটেলার বাঙালিকে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

রুমায় কেএনএফ কর্তৃক ৪ জন শ্রমিককে অপহরণ

বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার বগালেক পাড়া থেকে বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মুখে আবারও চার নির্মাণ শ্রমিক অপহরণের শিকার। তবে পরে দুই জন শ্রমিককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। জানা যায়, বগালেক পাড়ায় একটি সেতুর নির্মাণকাজ করছিলেন ৯ জন শ্রমিক। গত ৯ জুন ২০২৩, সকাল আনুমানিক ৬টার দিকে শ্রমিকদেরকে অতর্কিতে বমপার্টির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। একপর্যায়ে সাব-কন্ট্রাক্টর রিপন হোসেন ও গ্রীনটেক কনস্ট্রাকশনের সাব কন্ট্রাক্টর আব্দুল আউয়ালসহ ইদ্রিস আলী ও জসিম উদ্দীন তাদের চারজনকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায় বমপার্টির সন্ত্রাসীরা। পরদিন ১০ জুন ২০২৩, সকালে রিপন হোসেন ও জসিম উদ্দীনকে ছেড়ে দিলেও মো: ইদ্রিস আলী ও আব্দুল আউয়াল বর্তমানে এখনো বমপার্টি সন্ত্রাসীদের হেফাজতে রয়েছে।

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল

বরকলে সেটেলার কর্তৃক একজন জুম্ম গ্রামবাসীর ফলজ বাগান জবরদখল

গত জানুয়ারি ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নে মুসলিম সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জোরপূর্বক প্রাণময় চাকমা (৪২), পীং-অমর কান্তি চাকমা, গ্রাম- পন্ডিতপাড়া, ভূষণছড়া ইউনিয়নে ফলজ বাগান সহ ভূমি বেদখল করার অভিযোগ পাওয়া যায়। ঐ বেদখলকৃত জায়গায় বাঙালি সেটেলাররা ইতোমধ্যে একাধিক বাড়িও নির্মাণ করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৭/৮ বছর পূর্বে ফলজ বাগান সৃজন করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রাণময় চাকমা উক্ত জায়গাটি তার চাচা যতিন চন্দ্র চাকমা, পীং-অভিমন্যু চাকমার কাছ থেকে ক্রয় করেন। ক্রয় করার পরপরই প্রাণময় চাকমা জায়গাটিতে ফলজ বাগান সৃজন করে এবং বাড়ি নির্মাণ করে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

কিন্তু গত জানুয়ারি মাসে ভূষণছড়া সেটেলার এলাকার বাসিন্দা মো: জাহাঙ্গীর, পীং- সারোয়ার তার দলবল নিয়ে জায়গাটি তার দাবি করে জোরপূর্বক বেদখল করে। জায়গার মূল মালিক প্রাণময় চাকমাসহ জুম্ম প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করলে বেদখলের চেষ্টাকারী মো: জাহাঙ্গীরও নিজেকে জায়গার মালিক দাবি করে বিভিন্ন দলিল দেখায়। জুম্ম গ্রামবাসীরা মো: জাহাঙ্গীরের এসব দলিল ভূয়া বলে দাবি করেন। এরপর প্রাণময় চাকমা ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট ভূমি নিয়ে এই বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জানান। ইউপি চেয়ারম্যান এ নিয়ে উভয়পক্ষকে নিয়ে একটি সালিশ এর আয়োজন করে। এসময় চেয়ারম্যান যে যেখানে আছে সেখানে থাকার নির্দেশ দেন।

লামায় রেংয়েন কার্বারি পাড়ায় আবার হামলা ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ

গত ২ জানুয়ারি রাত ১:০০ ঘটিকায় ভূমিদস্যু ও লিজ কোম্পানি 'লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' কর্তৃক বান্দরবান জেলার লামা উপেজলার সরই ইউনিয়নের রেংয়েন কার্বারি পাড়ায় লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের দায়িত্বরত দেলোয়ার, নুরু ও মহসিনের নেতৃত্বে রাবার বাগানের শ্রমিক ও ৪ ট্রাক বহিরাগত ভাড়াটে লোকসহ প্রায় ১৫০ জনের অধিক বহিরাগত লোক মিলিত হয়ে সরই ইউনিয়নের রেংয়েন কার্বারি পাড়ার ম্রো গ্রামবাসীদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়। এতে রেংয়েন কার্বারি পাড়ার চামরুম ম্রো, সিংচ্যং ম্রো, লাংনক ম্রো ও রিংইয়ং ম্রোসহ ম্রো গ্রামবাসীদের ৭টি ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং রেংইয়ুঙ ম্রো ও দুইঠ্যাঙ ম্রো-এর ২টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়। এছাড়া হামলাকারীরা ম্রো গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ৩টি মোবাইল, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি লুট করে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের লাংকম ম্রো কার্বারি পাড়া, জয়চন্দ্র ত্রিপুরা কার্বারি পাড়া এবং রেংয়েন ম্রো কার্বারি পাড়ার আদিবাসীদের ৩৫০ একর জুম ভূমি, ফলজবাগান ও গ্রামীণ বনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এতে লামার তিন গ্রামে জুম্মদের ৩৫০ একরের জুমভূমি, ফলজবাগান ও গ্রামীণ বনে অগ্নিসংযোগের ফলে ৩৯ পরিবারের ২০০ জন গ্রামবাসী জীবন-জীবিকা, খাদ্য ও পানীয় জলের সংকটের মুখে পড়ে, অন্যদিকে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুসহ প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভূমিদস্যু লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের অগ্নিসংযোগ, হামলা ও ষড়যন্ত্রমূলক অপকর্ম এখানেই থেমে থাকেনি। ২৬ এপ্রিল হামলার পর ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো কমপক্ষে ১১ বার হামলা এবং ৩টি ষড়যন্ত্রমূলক সাজানো মামলা দায়ের করা হয়।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার কর্তৃক এক ত্রিপুরা দোকানদারকে মারধর

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খাগড়াছড়ি মাটিরাঙ্গা উপজেলার বান্দরছড়া মৌজার গোমতি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের টাকারমণি পাড়ায় মুসলিম সেটেলার কর্তৃক প্রীতি ত্রিপুরা (২১) নামে এক জুম্ম দোকানদারকে ফোনে মেরে ফেলার হুমকি প্রদানের পরদিন মারধরের খবর পাওয়া যায়।

জানা যায় যে, ঘটনার দিন রাত ১২টায় মো. তাজু (৩০) নামে এক বহিরাগত সেটলার বাঙালি দোকানে গিয়ে সিগারেট খুঁজলে বিষয়টি স্বাভাবিক মনে না করে ভয়ে প্রীতি ত্রিপুরা তা দিতে অস্বীকার করেন। এরপর মো: তাজু (৩০) প্রীতি ত্রিপুরাকে ফোন করে হুমকি দিয়ে বলে যে, 'কাল সকালে দোকান খুললে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।' পরদিন ৮ ফেব্রুয়ারি সকাল আনুমানিক ৭ টার সময় প্রীতি ত্রিপুরা প্রতিদিনের মতো দোকান খুললে কিছুক্ষণ পর তাজু দোকানে এসে তাকে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই অতর্কিতভাবে কিল ঘুষি লাথি দিয়ে হামলা করে। এতে প্রীতি ত্রিপুরা শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতপ্রাপ্ত হন।

লামা রাবার কোম্পানির মামলায় লাংকম ম্রো গ্রেফতার

গত ৩০ মার্চ ২০২৩ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় লামা রাবার ভূমিদস্যু ইন্ডাস্ট্রিজ লি: কর্তৃক দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় বান্দরবান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিন চাইতে গিয়ে লাংকম ম্রো পাড়ার কার্বারি ও লামা সরই ভূমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সদস্য সচিব লাংকম ম্রো'কে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

লাংকম ম্রো, রংধজন ত্রিপুরা, রেংয়েন ম্রো, রিংরং ম্রো, দুইথং ম্রোসহ ৮ জন জামিনের জন্য বান্দরবান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিনের আবেদন জানান। মামলার শুনানি শেষে এক পর্যায়ে আদালতের হাকিম নাজমুল হোসেন রংধজন ত্রিপুরাসহ ৭ জনের জামিন মঞ্জুর করলেও লাংকম ম্রোর জামিন নাকচ করে দেন এবং লাংকম ম্রো'কে কারাগারে পাঠানোর আদেশ প্রদান করেন। আদালতের এহেন ভূমিকা নিয়ে ভুক্তভোগী ম্রো ও ত্রিপুরা গ্রামবাসী উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

সীগাল হোটেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নাইক্ষ্যংছড়িতে জুম্মদের ১৫০ একর জমি বেদখলের পাঁয়তারা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে স্কুল স্থাপনের ক্ষেত্রে নমনীয় বিষয় উপস্থাপন করে বহিরাগত সীগাল হোটেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'সীগাল বোর্ডিং স্কুল' স্থাপনের নামে জুম্মদের ১৫০ একর জুমভূমি বন্দোবস্তীর পাঁয়তারা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার মো: অহিদ উল্লাহ কর্তৃক ২৮ আগস্ট ২০২২ ইস্যুকৃত এক নোটিশ মূলে জানা যায় যে, নাইক্ষ্যংছড়ির সোনাইছড়ি ইউনিয়নের সোনাইছড়ি মৌজায় আন্তর্জাতিক মানের সীগাল বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠার নামে ১৫০ একর ভূমি বন্দোবস্তী পাওয়ার জন্য কক্সবাজারের হোটেল মোটেল জোনের সীগাল ব্রাঞ্চের সীগাল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চেয়ারম্যান মাসুম ইকবাল আবেদন করেছেন। জানা যায় যে, সোনাইছড়ি মৌজায় প্রস্তাবিত ১৫০ একর জমির মধ্যে লামা পাড়া, ক্যাং পাড়া, জুম খোলা ও চিংথোয়াই পাড়ায় মোট ৯৩টি জুম্ম পরিবার জুমচাষ, লেবু বাগান, সেগুন বাগান ও খামার সৃষ্টি করে বংশপরম্পরায় প্রথাগতভাবে ভোগদখল করে আসছে।

গত ৯ এপ্রিল ২০২৩ সকালে নাইক্ষ্যংছড়ি সদর উপজেলা চত্বরে 'সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ভুক্তভোগী জনসাধারণ' এর ব্যানারে নাইক্ষ্যংছড়িতে আদিবাসী জুম্মদের ভোগদখলীয় ১৫০ একর ভূমি বন্দোবস্তী ও বেদখলের প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে স্থানীয় ভুক্তভোগী জনগণের উদ্যোগে এক মানববন্ধন আয়োজন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

লংগদুতে এলজিইডি কর্তৃক জুম্মদের ফসল নষ্ট করে খাল খনন

গত ৪ এপ্রিল ২০২৩ সকাল ৮ টায় রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুর ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত যুবলক্ষী পাড়া গ্রামে (শান্তিনগর) এলজিইডি কর্তৃক ৩০টি জুম্ম কৃষক পরিবারের রোপনকৃত ফসল নষ্ট করে ২৪ ফুট প্রস্থ, ১০ ফুট গভীর ও ৬৪৪৯ মিটার দৈর্ঘ্য এই 'গুলশাখালী ছড়া' নামে একটি খাল খনন করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে ৩০টি জুম্ম কৃষক পরিবারের কমপক্ষে ১২/১৩ একর জমির ফসল নষ্ট হবে বলে এলাকাবাসী জানান। ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনা, মতামত, সম্মতি ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই এলজিইডি এই প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

লামায় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ, ৫১ জনকে আটক

গত ২৬ এপ্রিল ২০২৩ দুপুরে লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী সড়কের ইয়াংছা চেক পোস্ট এলাকা থেকে ৫১ জন রোহিঙ্গাকে পুলিশ ইনচার্জ আবুল হাসেম মির্জার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গাড়ি দুটিতে তল্লাশি চালিয়ে আটক করেছে। আটককৃতরা সবাই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে তারা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রিত শরণার্থী। আটক মো. করিম, রহমতুল্লাহসহ কয়েকজন জানান, কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে বের হয়ে বান্দরবানের বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগানে শ্রমিকের কাজ করতেন তারা। আরো জানা যায়, কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে শত শত

রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বান্দরবানের লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি সহ ৭টি উপজেলায় চুরি, ডাকাতি, খুন, চাঁদাবাজির ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, আবার অনেকে জেলার বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগান ও নির্মাণ কাজে শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে।

মহালছড়িতে মুসলিম সেটেলার কর্তৃক ৩ জুম্ম গ্রামবাসীর ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট

খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মানিকছড়ির পাঁচ একর নামক স্থানে সেনা-পুলিশের সহায়তায় মুসলিম সেটেলার কর্তৃক পাহাড়িদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী পাহাড়িরা হলেন- বিন্দু চাকমা (৪৫), সুমন চাকমা (২৪), দক্ষ চাকমা (৩৫) ও জ্ঞানময় চাকমা (৪২)।

জানা যায়, গত ৪ মে ২০২৩ রাত সাড়ে ৯টার সময় মো. রসুল আলী, জয়দার ও গোয়ামারাসহ অজ্ঞাত আরো বেশ কয়েকজন মুসলিম সেটেলার সেনা-পুলিশের সহযোগিতায় মানিকছড়ির পাঁচএকর নামক জায়গায় গিয়ে উক্ত ৪ জন পাহাড়ি গ্রামাবাসীর ঘর-বাড়ি ভেঙে দেয় এবং ঘরের জিনিসপত্র দা, কুড়াল, মোবাইল, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন ও নগদ প্রায় ৫২ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনার সময় উপস্থিত সেনা-পুলিশ সদস্যদের নির্দেশে সেটেলাররা পাহাড়িদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন।

পরদিন ৫ মে ২০২৩ সকালে মহালছড়ি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগী পাহাড়িদের ডেকে লুট করা মোবাইলগুলো ফেরত দিলেও অন্যান্য জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া হয়নি বলে ভূক্তভোগীরা জানিয়েছেন। এ সময় পুলিশ সহজ-সরল পাহাড়িদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে 'তারা (পাহাড়িরা) আর সেখানে ঘরবাড়ি তুলবে না ও জুম চাষ করবে না' এমন স্বীকারোক্তি নিয়ে ভিডিও ধারণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মাটিরাঙ্গায় সেটলার কর্তৃক জুম্মদের ৭টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

গত ১ জুন ২০২৩ সন্ধ্যা ৭ টার সময় খাগড়াছড়ি মাটিরাঙ্গা উপজেলার তবলছড়ি ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের লাইফু কার্বারি পাড়া এলাকায় সেটেলার বাঙালি মো. আজিজুল (৫০), পীং মৃত আমীর উদ্দীন, গ্রাম- হাজিপাড়া নেতৃত্বে ১০/১২ জন সেটেলার বাঙালি সংঘবদ্ধ হয়ে লাইফু কার্বারি পাড়ায় ৭টি জুম্ম গ্রামবাসীর ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। ভুক্তভোগী ব্যাক্তিরা হলেন- লাইফু কার্বারি পাড়ার চন্দ্র শিশি ত্রিপুরা (৬০), পীং- মৃত হংকর ত্রিপুরা, বিজয় ত্রিপুরা (২৮), পীং- ত্রিনয়ন ত্রিপুরা, বিপিন ত্রিপুরা (২৯), পীং- বর্ব শংকর ত্রিপুরা, জ্ঞান জ্যোতি ত্রিপুরা (৫২), পীং- বজেন্দ্র ত্রিপুরা, রহিম ত্রিপুরা (৪২), পীং- রমিনী কুমার ত্রিপুরা, দহ ত্রিপুরা (৪৪), পীং- হেরা কুমার ত্রিপুরা ও ধন ভূষণ ত্রিপুরা (৪৬), পীং- চন্দ্র হরি ত্রিপুরা।

লামায় সেটেলার কর্তৃক দুইজন জুম্ম গ্রামবাসীর বসতভিটা ও ফলজ বাগান জবরদখলের পাঁয়তারা

গত ১৩ জুন ২০২৩ বান্দরবানের লামা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে দুপুরে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের বগাইছড়ির গ্রামের বাসিন্দা মো. গিয়াস উদ্দিন ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ হোসাইন মামুনের বিরুদ্ধে এ সংবাদ সম্মেলন করেন দুর্গম পাহাড়ি রাজা ও গতিরাম পাড়ার লোকজন।

সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানা যায়, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে হরি চন্দ্র ত্রিপুরা হেডম্যান রিপোর্ট মূলে দুই একর প্রথম শ্রেণি ও তিন একর দ্বিতীয় শ্রেণির জমি আবাদ করে সেখানে খামার ঘরসহ বিভিন্ন ফলজ, বনজ গাছের বাগান সৃজন করে ভোগ করে আসছেন। একইভাবে পাশের ক্যাচিং ম্রোও ১১২নং হোল্ডিং মূলে তিন একর তৃতীয় ও দুই একর দ্বিতীয় শ্রেণির জমি আবাদ করে বসতঘর ও বিভিন্ন ফলজ বনজ বাগান সৃজন করে ভোগ করছেন। পাশেই বগাইছড়ি গ্রামের বাসিন্দা আবদুর রাজ্জাক নামের এক ব্যক্তির ২৫ একর রাবার প্লট রয়েছে।

কিন্তু আবদুর রাজ্জাকের মৃত্যুর পর ওয়ারিশ গিয়াস উদ্দিন ও মোহাম্মদ হোসাইন মামুন রাবার প্লটের কাগজ দেখিয়ে হরি চন্দ্র ত্রিপুরা ও ক্যচিং ম্রো এর বহু কষ্টে অর্জিত জমিগুলো জবর দখল করার চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষরা জমি জবর দখলে নিতে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে অতর্কিতভাবে ৯-১০ জন শ্রমিক লাগিয়ে হরি চন্দ্র ত্রিপুরা ও ক্যচিং ম্রো জমির ৩০০ কলা গাছসহ বিভিন্ন গাছের চারা কেটে দেন। এ ঘটনায় প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেও ভুক্তভোগীরা কোনো সুরাহা পায়নি।

একপর্যায়ে গত মে মাসে স্থানীয় হেডম্যান, কারবারি, ইউপি সদস্য ও গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধের বিষয়টি মিমাংসা হয়। কিন্তু মিমাংসিত বিষয়টিকে উপেক্ষা করে কিছুদিন যেতে না যেতেই শুধুমাত্র হয়রানির উদ্দেশ্যে গত ২৪ মে ২০২৩ ইউপি সদস্য হোসাইন মামুনের ছোট ভাই গিয়াস উদ্দিন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪৫ ধারায় একটি মামলা করেন।

কাপ্তাইয়ে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম আম বিক্রেতা সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার

রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার কাপ্তাই জেটিঘাট বাজারে গত ২৩ জুন ২০২৩ বিকাল ৪:৩০ টায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেতন তঞ্চঙ্গ্যা (১৭), পীং-মৃত শুসেন মুনি তঞ্চঙ্গ্যা নামে স্থানীয় এক জুম্ম আম বিক্রেতা বাজারের একদল মুসলিম বাঙালির সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। হামলায় মারধরের শিকার কেতন তঞ্চঙ্গ্যার মাথায় ও পায়ে জখমের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার বাড়ি কাপ্তাই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কিলাছড়ি গ্রামে।

ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন বিকাল ৪ টার দিকে দুইজন বাঙালি এসে কেতন তঞ্চঙ্গ্যা থেকে ৫ কেজি প্রতি ৪০ টাকা দরে কিনে। এর দুই ঘন্টা পর আমের ক্রেতা ওই দুই বাঙালি আবার সেখানে আসে এবং কেতন তঞ্চঙ্গ্যাকে বলে যে, আমগুলো তো সব পঁচা। এরপর ওই দুই বাঙালি জোর করে কেতন তঞ্চঙ্গ্যার আমগুলো ছিনিয়ে কোনোর চেষ্টা করলে কেতন তঞ্চঙ্গ্যা বাধা দেয়। এসময় ওই দুই বাঙালি কেতন তঞ্চঙ্গ্যাকে লাঠি ও ঘুষি দিয়ে মারতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, বাজারের আশেপাশে থেকে আরও ২০-২৫ জন মুসলিম বাঙালি এসে কেতনকে মারধর করতে থাকে। এসময় কেতনের এক বড় ভাই হামলাকারীদের থামানো চেষ্টা করলে হামলাকারীরা তাকেও মারধর করে। এরপর হামলাকারীরা কেতন তঞ্চঙ্গ্যাকে ধরে কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয়ে নিয়ে সেখানেও হামলাকারীরা কাঠের চেয়ার দিয়ে আঘাত করে কেতন তঞ্চঙ্গ্যার মাথায় ও পায়ে ব্যাপক জখমের সৃষ্টি করে।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

বান্দরবানে সেটেলার কর্তৃক এক তঞ্চঙ্গ্যা নারীকে ধর্ষণ

গত ৫ জানুয়ারি ২০২৩ বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নে এক সেটেলার বাঙালি যুবক কর্তৃক জোরপূর্বক তুলে কোনোর পর ভয় দেখিয়ে ৩৮ বছরের এক তঞ্চঙ্গ্যা গৃহবধুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার গৃহবধুর বান্দরবান সদরস্থ যৌথ খামার এলাকায় বাগানের পাশে একটি টং দোকান রয়েছে। ধর্ষণকারীর নাম জাহাঙ্গীর আলম। সে পেশায় একজন মহেন্দ্র গাড়ি চালক। জানা যায় যে, যৌথ খামার এলাকার ত্রিহুইলার মহেন্দ্র চালক জাহাঙ্গীর বেশ কিছুদিন ধরে নানাভাবে উত্যক্ত করে আসছিল। গত ৫ জানুয়ারি জাহাঙ্গীর আলম তার ত্রিহুইলার মহেন্দ্র গাড়িতে করে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী বন প্রপাত এলাকার মসজিদের পাশে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার কর্তৃক এক ত্রিপুরা গৃহবধুকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রাত সাড়ে ৭ টায় খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের চালিতা ছড়া নামক এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী ত্রিপুরা গৃহবধুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। ধর্ষণের চেষ্টাকারী সেটেলার বাঙালি মো: সাদ্দাম (২৮) সেনাবাহিনীর উদ্যোগে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ কাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে বলে জানা যায়। তার বাড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলায়।

জানা যায়, ঘটনার রাতে ভুক্তভোগী ঐ গৃহবধু জামিনী ছড়া গ্রামে রাধা কৃষ্ণ মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে নিজ বাড়িতে একা ঘুমিয়ে ছিলেন। সেটেলার মো: সাদ্দাম ভুক্তভোগী পাহাড়ি মেয়েটির বাড়ির পাশ দিয়ে দোকানে যাওয়ার সময় পানি খাওয়ার নাম করে পাহাড়ি গৃহবধুর বাড়িতে ঢুকে। এ সময় বাড়িতে গৃহবধুকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে গৃহবধূটি চিৎকার করলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা এগিয়ে আসে এবং ঘটনাস্থল থেকে মো. সাদ্দাম পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা তাকে আটক করে। পরে এলাকাবাসী ধর্ষণের চেষ্টাকারী মো. সাদ্দামকে চালিতা ছড়া বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে বিজিবি সদস্যদের হাতে সোপর্দ করে। বিজিবির সদস্যরা গ্রামবাসীদের সেখান থেকে চলে যেতে নির্দেশ দেন ও ধর্ষণের চেষ্টাকারী মো. সাদ্দামের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

লামায় সেটেলার কর্তৃক একজন মারমা নারীকে ধর্ষণ

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউপির হারগাজা এলাকায় এক আদিবাসী মারমা নারীকে ধর্ষণ করা হয়। ঘটনার দিন দুপুরে বাড়ির পাশের

জমিতে ভিকটিম শাক তুলতে যায়। এসময় উৎপেতে থাকা মো. কাউছার (৩৮) ভিকটিমকে মুখ চেপে ধরে পাশের জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ওই নারীকে জেলা সদর হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয়।

ঘটনার পর পরই ধর্ষক মো: কাউছারকে এলাকার লোকজন মারধর করলে সে কক্সবাজারের চকরিয়ায় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়। হাসপাতাল থেকে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের নিয়ে যাওয়ার পর পুলিশের কাছে হস্তান্তর না করে মো: কাউছারকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

পানছড়িতে সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম ছাত্রীকে অপহরণের পর পাচারের চেষ্টা

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে ৮ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক জুম্ম স্কুলছাত্রীকে (১৪) তুলে নিয়ে গিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ এবং এক পর্যায়ে অন্যত্র পাচারের চেষ্টা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন দুপুরের দিকে পানছড়ি উপজেলা সদরের রাঙাপানিছড়া গ্রামের ওই ছাত্রী তাদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী মালটা বাগানে গেলে এক ত্রিপুরা ছেলে ও চাকমা মেয়ে স্কুল ছাত্রীটির নাকে-মুখে চেতনানাশক স্প্রে প্রয়োগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক পরিয়ে দিয়ে ছাত্রীটিকে পানছড়ি বাজারের তালুকদার পাড়া এলাকায় এক বড়ুয়ার বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে ত্রিপুরা ছেলে ও চাকমা মেয়েটি স্কুল ছাত্রীটিকে জনি বড়ুয়া নামে এক মোটর সাইকেল ব্যবসায়ী ও কাজল বড়ুয়া নামে স্থানীয় এক দোকানদারের হাতে তুলে দেয়। এরপর জনি বড়ুয়া ও কাজল বড়ুয়া ওই বাড়িতে দরজা-জানালা বন্ধ করে ওই ছাত্রীকে আটক করে রাখে। পরে বিকাল আনুমানিক ৫ টার দিকে জনি বড়ুয়া ও কাজল বড়ুয়া ছাত্রীটিকে চিৎকার করলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ঐ রাতেই এক পর্যায়ে জনি বড়ুয়া ও কাজল বড়ুয়া ছাত্রীটির কক্ষে প্রবেশ করে জোরপূর্বক ছাত্রীটিকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সন্ধ্যায় জনি বড়ুয়া ও কাজল বড়ুয়া মোটর সাইকেল যোগে ছাত্রীটিকে উল্টাছড়ির একটি খালি গুদাম ঘরে নিয়ে গিয়ে সেখানে মো: সাকিব ও তার এক সহযোগীর হাতে তুলে দেয়। এর কিছুক্ষণ পর মো: সাকিব ও তার সহযোগী মিলে পালাক্রমে ছাত্রীটিকে ধর্ষণ করে। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮ টার দিকে মো: সাকিব ও তার সহযোগী ছাত্রীটিকে জখম অবস্থায় উল্টাছড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে পানছড়ি বাজারে একটি দোকানের পাশে ফেলে রেখে চলে যায়। চেতনানাশক ঔষধ প্রয়োগ ও উপর্যুপরি ধর্ষণের ফলে ছাত্রীটির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভেঙে পড়ে। পরে ওই ছাত্রীর দাদা প্রায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মুক্তা লাইব্রেরি থেকে ছাত্রীটিকে উদ্ধার করে ছাত্রীটির বাড়িতে নিয়ে যায়।

বরকলে সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম নারী ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৩ মার্চ ২০২৩ আনুমানিক ১১ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নে রাঙ্গামাটি-জুরাছড়ি জলপথে জুরাছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী 'স্বাগতম জুরাছড়ি' নামক স্থানের নিকটবর্তী সুবলং ইউনিয়নের মাইচছড়ি গ্রামে এক মুসলিম বাঙালি বোট চালক কর্তৃক এক আদিবাসী চাকমা নারী (২৫) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ধর্ষণের চেষ্টাকারী বোট চালকের নাম আবদুল মালেক (৫৫), পীং-বাচা মিয়া, ঠিকানা-রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি বলে জানা যায় ।

ঘটনার দিন ওই চাকমা পরিবারের গৃহবধুর স্বামী সুবলং বাজারে যাওয়ায় গৃহবধুটি একাই বাড়িতে অবস্থান করছিল। এমন সময় 'স্বাগতম জুরাছড়ি' নামক স্থানে বোট নিয়ে আসা চালক আবদুল মালেক চাকমা গৃহবধুটির ঘরে গিয়ে পানি চায়। এসময় বোট চালক আবদুল মালেক গৃহবধুটিকে একা পেয়ে ঝাঁপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

রাঙ্গুনিয়ায় বাঙালি ঋণগ্রহিতা কর্তৃক একজন জুম্ম নারী এনজিও কর্মী খুন

গত ৫ মার্চ ২০২৩ রাতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার বন্দুকভাঙা ইউনিয়নের বাসিন্দা এক জুম্ম নারী বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কর্মকর্তা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া এলাকায় বাঙালি ঋণগ্রহীতা কর্তৃক খুনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী নারীর নাম চম্পা চাকমা (২৬), পীং-শান্তিময় চাকমা, গ্রাম-ছাক্রাছড়ি, ২নং ওয়ার্ড, বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন। তিনি বেসরকারি সংস্থা 'পদক্ষেপ'-এ রাঙ্গুনিয়ার হোসনাবাদ শাখায় সহকারী ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ঘটনার সময় রাত আনুমানিক ৮:৩০ টার দিকে নিজ কার্যালয়ের সামনে চম্পা চাকমা অভিযুক্ত মো: এনামুল হক এনাম কর্তৃক গলায় ছুরিকাহত হয়ে মারাত্মকভাবে জখম হন। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও কর্তব্যরত ডাক্তার চম্পা চাকমাকে মৃত ঘোষণা করেন। উত্তর পারুয়া এলাকার পশ্চিম পাড়া গ্রামের বাসিন্দা মো: এনামুল হক এনাম (২৬) নামের এক রাঙ্গুনিয়ার ঋণগ্রহীতা এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

খাগড়াছড়িতে বাঙালি শিক্ষক কর্তৃক এক শিক্ষিকাকে ধর্ষণ

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ খাগড়াছড়িতে মো: হারুন-অর-রশিদ (৪০) নামে এক প্রাক্তন বাঙালি শিক্ষক কর্তৃক এক আদিবাসী নারী (৪৫) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ধর্ষক হারুন অর রশিদ তার বাসায় জোরপূর্বক আটকে রেখে বিকাল ৩:৩০ টা হতে রাত আনুমানিক ৮:০০ টা পর্যন্ত ধর্ষণ করে ও ধর্ষণের সময় মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে। ধর্ষকের হুমকির ভয় এবং লজ্জা ও অপমানের কারণে ভুক্তভোগী নারী এতোদিন ঘটনাটি প্রকাশ না করলেও, গত ১৪ মার্চ ২০২৩ তিনি নিজেই খাগড়াছড়ি সদর থানায় ধর্ষক মো: হারুন-অর-রশিদ এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন বলে জানা যায়।

রামগড়ে সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম ছাত্রীকে ধর্ষণ

গত ২৩ মার্চ ২০২৩ খাগড়াছড়ির রামগড়ের পাতাছড়া এলাকায় মো: শাহীন আলম ও মো: আলী নামে দুই সেটলার মোটর সাইকেল চালক কর্তৃক ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া একজন আদিবাসী জুম্ম স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করা হয়নি। উল্লেখ্য, এ নিয়ে গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে দেড় মাসের মধ্যে ৭ জন আদিবাসী জুম্ম নারী ও শিশু হত্যা ও যৌন সহিংসতার শিকার হয়। ৭টি ঘটনার মধ্যে মাত্র একটি ঘটনায় একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। বাকি ৬টি ঘটনায় জড়িত ৯ জন ব্যক্তি ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।

লংগদুতে সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম ছাত্রীকে অপহরণ

গত ২৩ মার্চ ২০২৩ ভোর রাতে রাঙামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার মাইনীমুখ ইউনিয়েনের বাসিন্দা মো: সাকিব হোসেন মান্না (২১) নামে এক মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও তার কয়েকজন সহযোগী কর্তৃক ১০ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক চাকমা কিশোরী (১৫) অপহরণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সেদিন মো: সাকিব হোসেন মান্না তার কয়েকজন সহযোগী নিয়ে উক্ত কিশোরীর বাড়িতে এসে কিশোরীকে তুলে নিয়ে যায়। ভুক্তভোগীর মা নিজেই বাদী হয়ে এই অপহরণের বিষয়ে গত ২৬ মার্চ ২০২৩ লংগদু থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগকারী তার অভিযোগপত্রে মো: সাকিব হোসেন মান্নাসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে এই অপহরণের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন। ভিকটিমের মা অভিযোগ দাখিল করলেও থানা কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগকে মামলা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেনি বলে জানা গেছে।

বিলাইছড়িতে এক রোহিঙ্গা কর্তৃক একজন বাক-প্রতিবন্ধী জুম্ম কিশোরীকে ধর্ষণ

গত ২৫ মে ২০২৩ সকাল ১১:৩০ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলায় ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের তাংকুইতাং পাড়ার এক রোহিঙ্গা মুসলিম কর্তৃক বাক-প্রতিবন্ধী জুম্ম কিশোরী (১৭) ধর্ষণের শিকার হয় বলে খবর পাওয়া যায়।

জানা যায়, ঘটনার দিন প্রতিদিনের মতো পরিবারের লোকজন জুমের কাজ করতে যায়। এ সুযোগে সেদিন ভুক্তভোগী জুম্ম কিশোরীকে বাড়িতে একা পেয়ে রোহিঙ্গা মুসলিম মো: হাসান হাত বেঁধে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে দুপুরের দিকে পরিবারের লোকজন বাড়িতে এলে পরিবারের সদস্যদেরকে বিষয়টি জানান ভুক্তভোগী জুম্ম কিশোরী। ঘটনা শুনে পরিবারের লোকজন স্থানীয় হেডম্যান এবং বাজার কমিটির লোকজনকে অবহিত করে। পরে ধর্ষণকারী রোহিঙ্গা মো: হাসানকে তাংকুইতাং পাড়া থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আটক করে। ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

জুরাছড়িতে এক পুলিশ কর্তৃক এক জুম্ম স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেডে কর্মরত এক পুলিশ সদস্য কর্তৃক চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক জুম্ম স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের চেষ্টা ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৭ মে ২০২৩, বিকাল আনুমানিক ৫ টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলা সদরে সোনালী ব্যাংকের পাশে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য রবিউল হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত ও আটক করে রাঙ্গামাটি জেলা সদরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা যায়। ভুক্তভোগী জুম্ম শিশুটি জুরাছড়ি উপজেলার ২নং বনযোগী ছড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের লেবার পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

গত ২৭ মে ২০২৩, বিকাল আনুমানিক ৫ টার দিকে কয়েকজন সহপাঠীসহ প্রাইভেট শিক্ষা থেকে বাড়িতে ফেরার পথে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডে কর্মরত পুলিশ সদস্য রবিউল হোসেন জুম্ম স্কুল ছাত্রীদের জোরপূর্বক জাপটে ধরার চেষ্টা

করে। এতে পুলিশ সদস্য রবিউল হোসেন উক্ত ভুক্তভোগী ছাত্রীকে ধরতে সক্ষম হয় এবং অন্য সহপাঠীরা কোনোমতে পালিয়ে যায়। একপর্যায়ে পুলিশ সদস্যটি ধরতে পাওয়া জুম্ম স্কুল ছাত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করার চেষ্টা করে এবং শিশুটির যৌনাঙ্গ ধরে চাপ প্রয়োগ করে নিপীড়ন করে।

ভুক্তভোগী শিশুটি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে গত ২৯ মে ২০২৩ চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সহকারি সার্জন ডাক্তার আসিফ খান তার রিপোর্টে ঘটনার পর থেকে শিশুটি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভুগছে বলে উল্লেখ করেছেন।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার

গত ২৯ জুন ২০২৩ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার আটারকছড়া ইউনিয়নের ডানে আটারকছড়া মুসলিম পাড়ায় ঈদের দাওয়াত খেতে গিয়ে এক জুম্ম নারী (৩৫) দুই সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণকারী দুই মুলিম সেটেলার হলো মো: মনজুর (২৬), পিতা- মো: কামাল, ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আটারকছড়া ইউনিয়ন ও (২) মো: রুবেল (২৬), পিতা-আব্বাস, ৪নং ওয়াডের বাসিন্দা, আচারকছড়া ইউনিয়ন। সেদিন মুসলমানদের কোরবানীর ঈদের দিন বিকেলের দিকে আটারকছড়া ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের কাঙারাহিয়ে গ্রামের উক্ত ভুক্তভোগী নারী তার দাদু ও দাদী এবং তার মামাসহ তাদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী আটরকছড়া মুসলিম সেটেলার পাড়ায় মো: সিদ্দিক নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে ঈদের দাওয়াত খেতে যায়।

এক পর্যায়ে অভিযুক্ত মো: মনজুর ও মো: রুবেল নামে দুই মুসলিম সেটেলারও সিদ্দিকের বাড়িতে উপস্থিত হয়। এর কিছুক্ষণ পর ভুক্তভোগী নারী তার দাদা ও দাদীসহ হেঁটে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। সাথে সাথে মো: মনজুর ও মো: রুবেলও তাদের পেছনে পেছনে অনুসরণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে উক্ত দুই সেটেলার বাঙালি ভুক্তভোগী নারী এবং তার দাদা ও দাদীকে গতিরোধ করে বয়স্ক দাদা ও দাদীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দেয়। এরপর উক্ত দুই সেটেলার বাঙালি জুম্ম নারীটিকে জোরপূর্বক পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে এবং এরপর চেতনানাশক ঔষধ খাইয়ে দিয়ে অচেতন অবস্থায় ফেলে যায়। পরে আত্মীয় ও প্রামবাসীরা ভুক্তভোগী ওই নারীকে প্রায় অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে।

সংগঠন সংবাদ

লামায় ম্রোদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও হামলার প্রতিবাদে এইচডব্লিউএফের মানববন্ধন

গত ৬ জানুয়ারি ২০২৩, রাঙ্গামাটির ডিসি অফিস ফটকে বান্দরবানে 'লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' কর্তৃক লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নে রেংইয়েন ম্রো কার্বারি পাড়ায় বারংবার অগ্নিসংযোগ ও হামলার প্রতিবাদে এবং হামলাকারীদের শাস্তির দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডব্লিউএফ)-এর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সোনারিতা চাকমার সভাপতিত্বে এবং হিরা চাকমার সঞ্চালনায় মানববন্ধনে সংহতি বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা, সাধারণ শিক্ষার্থী এলি চাকমা। মানববন্ধনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কাঞ্চনা চাকমা।

সংহতি বক্তব্যে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী এলি চাকমা পাহাড়ের ভূমিপুত্রদের নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শাস্তির আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা বান্দরবানে লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নে ম্রোদের গ্রামে রাবার কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে একের পর এক হামলা, বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ, ঝিরিতে বিষ প্রয়োগ সর্বশেষ রাতের আঁধারে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় প্রশাসনের কাছ থেকে সমাধান চান। প্রশাসনের কাছ থেকে যদি এটির সমাধান না আসে তাহলে এই প্রতিবাদ সমাবেশ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

সংহতি বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা বলেন, যারা রক্ষক তারাই ম্রোদের অধিকার হরণ করছে। যারা আইনের শাসন করতে শেখায়, যারা নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলে, তারাই ম্রোদের ভূমি দখল করতে রাবার কোম্পানিকে আশ্রয় দিয়েছে। ঘটনার ৪ দিন হওয়ার পরেও কোনো মামলা হয়নি। দোষীরা দিনে দুপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উল্টো প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্রোদের নানা ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে। যার ফলে ভুক্তভোগী ম্রোরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, গত ১লা জানুয়ারি ২০২৩, আনুমানিক রাত ১২:০০ টার দিকে লামা রাবার কোম্পানির প্রায় ২০০/২৫০ জন লোক ৬টি ট্রাকে এসে রেংয়েন কার্বারি পাড়ায় আক্রমণ করে। তারা পাড়ার প্রায় ৭ টি বাড়িতে আক্রমণ করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা পাড়ার কার্বারি রেংয়েন এর বাড়িতেও হামলা চালায়। গ্রামবাসীরা ভয়ে-আতংকে পাশের ঝোপে পালিয়ে নিজেদের রক্ষা করেছেন। তার বাড়ি তছনছ করে টাকা, ছাগল, মুরগি, ধান, সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল, মোবাইল, চালের বস্তা, কম্বল ইত্যাদি হামলাকারীরা লুট করে নিয়ে যায়।

আরো উল্লেখ্য যে, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের লাংকম ম্রো কার্বারি পাড়া, জয়চন্দ্র ত্রিপুরা কার্বারি পাড়া এবং রেংয়েন ম্রো কার্বারি পাড়ার আদিবাসীদের ৩৫০ একর জুম ভূমি, ফলজবাগান ও গ্রামীণ বনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এতে ৩৯ পরিবারের ২০০ জন গ্রামবাসীর জীবন-জীবিকা, খাদ্য ও পানীয় জলের সংকটের মুখে পড়ে। অন্যদিকে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুসহ প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভূমিদস্যু লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের অগ্নিসংযোগ, হামলা ও ষড়যন্ত্রমূলক অপকর্ম এখানেই থেমে থাকেনি। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রামবাসীদের উপর আরো কমপক্ষে ১১ বার হামলা এবং ৩টি ষড়যন্ত্রমূলক সাজানো মামলা দায়ের করা হয়।

চট্টগ্রামে ৫ দফা দাবিতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সমাবেশ ও মিছিল

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সম্মিলিত বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলুন' শ্লোগান নিয়ে গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ চট্টগ্রামে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন' এর উদ্যোগে সরকারের নিকট পার্বত্য চুক্তি দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের দাবিসহ ৫ দফা দাবিতে গণসঙ্গীত, সংহতি সমাবেশ ও মিছিল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেনের সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক শরীফ চৌহানের সঞ্চালনায় সংহতি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক রণজিৎ দে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য সৌখিন চাকমা, জাসদ কেন্দ্রীয় নেতা জসিম উদ্দিন বাবুল, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, ঐক্য ন্যাপের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারুন রশিদ ভুঁইয়া, ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মিঠুল দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের প্রতিনিধি অলিক মৃ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুমন মারমা।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাশেদ খান মেনন বলেন, দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই শান্তি প্রক্রিয়া আমরা শুরু করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি উদ্বিগ্ন। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এই পাহাড় এখন অশান্ত। শুধু তাই নয়, পাহাড়ের অশান্তিকে ঘিরে এই চট্টগ্রামে ও সারাদেশে অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আপনারা দেখেছেন, গত কয়েক মাস ধরে ওই পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জঙ্গী মৌলবাদীরা সেখানে সশস্ত্র ট্রেনিং নিচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে হামলা চালানোর জন্য। অর্থাৎ পাহাড়ের অশান্তি এখন সারাদেশের অশান্তি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পার্বত্য চুক্তির ফলে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার পান। আশা ছিল এই চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদাহরণ সৃষ্টি করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তা হয়নি।

সভাপতির বক্তব্যে কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেন, মূলধারার জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, সমর্থন, সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সহজে হবে না। দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো এ প্রশ্নে নীরব। শুধু পাহাড়ে নয়, সমতলেও আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের ভূমি হারাচ্ছে। বড় দলগুলোর এসব প্রশ্নে ভূমিকা দেখি না। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়ে নতুন জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে। যদি একটি অঞ্চলকে আমরা অশান্ত রাখি এবং স্বাভাবিক জীবনকে বানচাল করে রাখি সেই অঞ্চল অস্থিতিশীল হতে বাধ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রঁদেভূঁ শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। সংহতি সমাবেশ শেষে

গণমিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে চেরাগী পাহাড় মোড়ে এসে শেষ হয়। সমাবেশ থেকে সরকারের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ৫ দফা দাবি জানানো হয়। সরকারের নিকট উত্থাপিত ৫ দফা দাবি নিম্নরূপ-

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে চুক্তি দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. পাহাড়ে সামরিক কর্তৃত্ব ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের স্থায়ী অবসান করতে হবে।

৩. আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক করা এবং স্থানীয় শাসন নিশ্চিত করতে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক এসব পরিষদের যথাযথ ক্ষমতায়ন করতে হবে।

৪. পার্বত্য ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন করে তাদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৫. দেশের মূল স্রোতধারার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

চট্টগ্রামে পাহাড়ি শ্রমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কাউন্সিল

গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ চট্টগ্রামে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

'শ্রমজীবীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের পাহাড়ি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, বার্ষিক সম্মেলন, কাউন্সিল, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অমর কৃষ্ণ চাকমা (বাবু)-কে সভাপতি, জগৎ জ্যোতি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সন্তোষ বিকাশ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ফোরামের ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কমিটিও গঠন করা হয়।

বিকাল ৩:০০ টায় শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি অমর কৃষ্ণ চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন মুক্তার হোসেন। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা, ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জিয়াউল হক জিয়া, পিসিপি'র চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ফোরামের সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে- জেএসএসের সুবর্ণ জয়ন্তীতে সন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, প্রগতিশীল জুম্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আগামী দিনগুলোতে প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। কাজেই সব কথার শেষ কথা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বুধবার রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী ও ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রী লারমা এসব কথা বলেন।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হোন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি-২০২৩ এর উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সৌখিন চাকমা।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। এতে আরও বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অরুন ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মনি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুমন মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং দলীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে

দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জনসংহতি সমিতির সদস্য মাধবীলতা চাকমা। জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর বেলুন উড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে শ্রী লারমা আরো বলেন, সরকার চায় জনসংহতি সমিতির অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাক। কারণ পাহাড়ে একমাত্র জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বই জুম্ম জনগণের জন্য স্বাধিকার-অধিকার রক্ষায় সংগ্রাম করতে পারে, সংগ্রাম করার সাহস রাখে। শুধু সেটা নয়, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২ ডিসেম্বর জুম্ম জনগণ তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল, সেই চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কথা না বলার জন্য, সেই চুক্তি মানুষ যাতে ভুলতে পারে, ভুলে যেতে বাধ্য হয় সেই প্রক্রিয়াই এখন পাহাড়ে চলছে। সুতরাং এই বাস্তবতা আমাদের বুঝে নিতে হবে, জানতে হবে। এই বাস্তবতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এবং শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ আলোচকবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে যে ৫১ বছরে পদার্পণ করেছে তার স্মৃতিচারণ করেন এবং এই ৫১ বছরে পার্টির সংগ্রামী জীবনে সফলতা ও ব্যর্থতা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এবং অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কোনো কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে সংকল্প করেন।

পরিশেষে, উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সৌখিন চাকমার সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আলোচনা সভা শেষে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

ঢাকায় জনসংহতি সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা সভা

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে ঢাকার বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক

পরিষদের সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন, লেখক ও সাংবাদিক আবু সাইদ খান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, ঐক্য ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ তারেক, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক

নাজমুল হক প্রধান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ-সাধারণ সম্পাদক ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের স্টাফ সদস্য দীপায়ন খীসা। সংহতি বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমা প্রমুখ।

রাশেদ খান মেনন বলেন, যারা এই দলটি গঠন করেছিল তারা আজ বয়সের ভারে নুব্জ। রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সৃষ্টি। কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই পাহাড়ের তৎকালীন তরুণরা সংগঠিত হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেন তারা। এই দলটি বাংলাদেশে বাঙালি ভিন্ন অপরাপর আদিবাসীদেরও স্বীকৃতি চেয়েছেন এবং সেটা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে নয়। তারা সংবিধানের আওতার মধ্য দিয়েই এই স্বীকৃতি চেয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, জনসংহতি সমিতি চুক্তির স্বাক্ষরের পর ২৫ বছর ধরে চুক্তি বাস্তবায়নের আশা করছে। এটাও তাদের রাজনৈতিক সমাধান খোঁজারই পন্থা। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে কোনোর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এই রাজনৈতিক কর্মসূচি। এটি একটি প্রাগ্রসর রাজনৈতিক দল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জাতীয় দল হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করেন এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ।

রাঙ্গামাটিতে বিভিন্ন স্থানে জেএসএস'র সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান: বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সুবর্ণ জয়ন্তী ও ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এসব আলোচনা সভায় আদিবাসী জুম্মসহ পার্বত্য অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে জনসংহতি

সমিতির চলমান বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বাঘাইছড়ি উপজেলা

এইদিন সকাল ১০:০০ টায় বাঘাইছড়ি বটতলা কমিউনিটি সেন্টারে জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি ও সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সুশীল তালুকদারের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সুমতি রঞ্জন চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য পুলক জ্যোতি চাকমা, বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য ধন বিকাশ চাকমা।

এছাড়া এতে প্রত্যাগত জেএসএস সদস্যদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন দীলিপ চাকমা, সারোয়াতুলী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য অমূল্য রতন চাকমা, খেদারমারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জ্ঞান আলো চাকমা, বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য দীলিপ চাকমা ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্য রাশিকা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য অনিক চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য মন্তু চাকমা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি সুমতি রঞ্জন চাকমা বলেন, দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সংগ্রাম করে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে নেতাকর্মীগণকে সদা প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

লংগদু উপজেলা

সকাল ১১.০০ টায় জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির উদ্যোগে লংগদু উপজেলার বগাচতর এলাকায় এক কর্মী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলার জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্যবৃন্দ এবং থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম শাখার জেএসএস, মহিলা সমিতি ও যুব সমিতির সদস্যগণ ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন স্তরের জনগণ উপস্থিত হন।

জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনি শংকর চাকমার সঞ্চালনায় এবং ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক বিনয় প্রসাদ কার্বারির সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক যশু চাকমা। এছাড়াও সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য অয়ন্তিময় চাকমা, থানা যুব সমিতির সভাপতি তপন জ্যোতি চাকমা ও মহিলা কার্বারি নতুনা চাকমা।

বরকল উপজেলা

বরকল উপজেলা সদরে জনসংহতি সমিতির কার্যালয়ে সকাল ১০:০০ টায় জনসংহতি সমিতির বরকল থানা কমিটির সদস্য অপূর্ব মিত্র চাকমার সভাপতিত্বে এই উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য ও বরকল উপজেলা চেয়ারম্যান বিধান চাকমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরকল উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য শ্যামরতন চাকমা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সুচরিতা চাকমা। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বরকল থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রিয় জ্যোতি চাকমার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বরকল থানা কমিটির

সভাপতি কেতন চাকমা এবং অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্র নেতা নিউটন চাকমা, লক্ষীমন চাকমা প্রমুখ।

অপরদিকে বরকল উপজেলার আইমাছড়া ইউনিয়নের জনসংহতি সমিতির জগন্নাথ ছড়া, আইমাছড়া মুখ, দীঘল ছড়ি গ্রাম কমিটি ও যুব সমিতির যৌথ উদ্যোগে জগন্নাথ ছড়ায়ও এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জনসংহতি সমিতির জগন্নাথ ছড়া গ্রাম কমিটির সভাপতি ভুবন বিজয় দেওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সমিতির আইমাছড়া ইউনিয়ন শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক জ্ঞান রতন চাকমা (জ্ঞান) এবং বিশেষ অতিথি আইমাছড়া মুখ গ্রাম কমিটির সভাপতি ধন কুমার চাকমা, দীঘল ছড়ি গ্রাম কমিটির সভাপতি দয়াধন চাকমা।

চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা সভা

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিকাল ৩ টায় চট্টগ্রামের জে এম সেন হলে জনসংহতি সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী ও ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ঊষাতন তালুকদার।

'জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নই পাহাড়ে শান্তি ও সুষম উন্নয়নের একমাত্র উপায়' এই প্রতিপাদ্যকে নিয়ে আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় সম্মানিত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি কমরেড অশোক সাহা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারণ সম্পাদক নিতাই প্রসাদ ঘোষ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি তাপস হোড় ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রদীপ কুমার চৌধুরী, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক শরীফ চৌহান, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দীন বাদল, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর চট্টগ্রাম শাখার নেতা আল কাদেরী জয়, ঐক্য ন্যাপের চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশ প্রমুখ।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি দিশান তঞ্চঙ্গ্যা এবং সঞ্চালনা করেন অনিল বিকাশ চাকমা।

উক্ত আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার বলেছেন, পাহাড়ের মানুষকে দূরে ঠেলে দেবেন না, তাদেরকে বুকে আগলে ধরে রাখুন। আর চুক্তি বাস্তবায়ন করছি, সেটা শুধু মুখে বললে হবে না, তার বাস্তবিক প্রয়োগ করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি অশান্ত থাকে, এই বাংলা শান্ত থাকতে পারে না। তাই আসুন আমাদের এই অধিকারের আন্দোলনে

বাংলার ষোল কোটি মানুষকে সম্পৃক্ত করি। আপনারা পাহাড়ের মানুষকে দূরে ঠেলে দেবেন না তাদেরকে বুকে আগলিয়ে ধরে রাখতে হবে। তারা বেশি কিছু চায় না। তারা নিজ ভূমিতে জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। এই জুম্ম জনগণের বেঁচে থাকার রাস্তা যেন বন্ধ করে দেওয়া না হয়। আর কোনো বিলম্ব, কালক্ষেপণ নয়, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আপনারা সকলেই আন্তরিক হয়ে এগিয়ে আসুন।

ঊষাতন তালুকদার আরো বলেন, 'উদ্দেশ্য-লক্ষ্য পরিপূরণের হাতিয়ার হলো সংগঠন। সংগঠনের মধ্য দিয়ে কোনো দল তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইতিহাসের দাবিতে এবং বাস্তবতার কারণে এই দল গঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংগীত ও জনসংহতি সমিতির দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মূল আলোচনা সভা শুরু করা হয়। এসময় জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সংগঠন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। আলোচনা সভা শেষে রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী ও ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

রাঙ্গামাটিতে পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২৪তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল

রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২৪তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজকে সামিল হতে হবে। আজকের তরুণ-ছাত্র সমাজকে তাদের ঐতিহাসিক দায়-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট হলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে ছাত্র ও

যুব সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হউন' শ্লোগান নিয়ে আয়োজিত পিসিপি'র এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রী লারমা এসব কথা বলেন।

পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুমন মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি ম্রানু সিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা। সভা সঞ্চালনা করেন পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক টিকেল চাকমা।

জিকো চাকমাকে সভাপতি, টিকেল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রনেল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি থোয়াইক্য জাই চাক।

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ও ৫% আদিবাসী কোটার দাবি পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সোমবার, সকাল ১০ টায় রাঙ্গামাটির নিউ মার্কেটের সম্মুখে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ও সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% আদিবাসী কোটা চালু করার দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের (এইচডব্লিউএফ) যৌথ উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক জিকো চাকমার সঞ্চালনায় এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক ম্রানুচিং মারমার সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সুমন চাকমা, শহর শাখার সভাপতি মিলন চাকমা,

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা এবং সভাপতি সুমন মারমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির সহ সভাপতি থোয়াইক্যজাই চাক।

স্বাগত বক্তব্যে থোয়াইক্যজাই চাক বলেন, বাংলাদেশে বাংলা ভাষার পাশাপাশি আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের আগ্রাসী যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আদিবাসীদের ভাষাসমূহ হারিয়ে যাচ্ছে। বান্দরবানের রেংমিটচ্য ভাষার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, এ ভাষাটিও আগ্রাসনের ফলে হারিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে।

সকল জাতিসত্তার ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি চবি'র পিসিপি ও ছাত্র ইউনিয়নের

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, মঙ্গলবার, সকল জাতিসত্তার ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চবি সংসদের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা দেশের সকল আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার দাবিও জানায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের সভাপতি প্রত্যয় নাফাক এবং সঞ্চালনা করেন ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক সুদীপ্ত চাকমা। এছাড়াও মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন পিসিপির চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক নরেশ চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক অন্তর চাকমা প্রমুখ। মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিলাইছড়িতে পিসিপির সম্মেলন ও কাউন্সিল

গত ২০ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) বিলাইছড়ি থানা শাখার ১৯তম সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। সম্মেলন ও কাউন্সিলের আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে ছাত্র ও যুব সমাজকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপির বিলাইছড়ি থানা শাখার বিদায়ী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক নিকেল চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ চাকমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক টিপু চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি থোয়াইক্যজাই চাক, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক টিকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোনারিতা চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সঞ্চয় চাকমা।

চট্টগ্রামে পিসিপির ৩ শাখার সম্মেলন ও কাউন্সিল

চট্টগ্রামে 'সংকীর্ণতাবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হোন' শ্লোগান নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখা ও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখার বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩ মার্চ ২০২৩, শুক্রবার ৩:০০ টায় চট্টগ্রাম নগরস্থ প্রেসক্লাব ভবনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমন মারমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি তাপস হোড়, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক শরীফ চৌহান, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি দিশান তঞ্চঙ্গ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য উলিসিং মারমা।

সম্মেলনের সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা এবং সঞ্চালনা করেন পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখার সাধারণ সম্পাদক নরেশ চাকমা। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক অম্লান চাকমা এবং প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হ্লামিও মারমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য সুভাষ চাকমা ও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখার সদস্য উখিং সাই মারমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এযাবৎ যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা শেষে সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, হ্লামিও মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অম্লান চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে পিসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখা, নরেশ চাকমাকে সভাপতি, অন্তর চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অন্বেষ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং সেতু চাকমাকে সভাপতি, উখিং সাইন মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুমন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা ও কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এসময় শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি থোয়াক্যজাই চাক। এরপর সভার সভাপতি সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যার বক্তব্যের মাধ্যমে শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলের সমাপ্তি ঘটে।

চট্টগ্রামে আদিবাসী মহিলা ফোরামের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

গত ৮ মার্চ ২০২৩ বিকাল ৩ টায় চট্টগ্রামের ব্যারিস্টার কলেজ প্রাঙ্গণে আদিবাসী মহিলা ফোরাম, চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আদিবাসী মহিলা ফোরাম, চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার সভাপতি সোনাবি চাকমার সভাপতিত্বে এবং প্রসেনজিৎ চাকমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি ডি এস তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জগৎজ্যোতি চাকমা এবং ফোরামের দপ্তর সম্পাদক সুজন চাকমা।

রাঙ্গামাটিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র‍্যালি

গত ৮ মার্চ ২০২৩ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির উদ্যোগে রাঙ্গামাটিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রাঙ্গামাটির জেলা শিল্পকলা একাডেমিকে সকাল ৯ টায় জমায়েত ও সেখান থেকে সকাল ৯:৩০ টায় র‍্যালি শুরু হয়।

এরপর সকাল ১০ টায় 'নারী পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে ডিজিটাল নীতি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের যথাযথ ব্যবহার ও দক্ষতা অপরিহার্য' প্রতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মনি চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতৃবন্দ।

পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল

গত ৯ মার্চ ২০২৩ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্স মিলনায়তনে 'দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% আদিবাসী কোটা চালু করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে ছাত্র ও যুব সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হউন' এই দাবি ও আহ্বানকে সামনে রেখে পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার ২৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জীনিচ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন ও কাউন্সিলের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুমন মারমা। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আদিবাসী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুকুল পাহান, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের শিক্ষা সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ হাসান। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার অর্থ সম্পাদক জেন্টল চাকমা। সম্মেলনে সঞ্চালনা করেন পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক বিজয় চাকমা।

পিসিপি জুরাছড়ি থানা শাখার কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১০ মার্চ ২০২৩ জুরাছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) জুরাছড়ি থানা শাখার কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'পার্বত্য চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে ছাত্র ও যুব সমাজের বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলুন' শ্লোগান নিয়ে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল ও সম্মেলনের সভায় সভাপতিত্ব করেন সুবর্ণ চাকমা। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমিত চাকমা এবং আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জোনাকি চাকমাসহ পিসিসির জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বহু মানুষের রক্ত ও অপরিসীম ত্যাগতিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দীর্ঘ ২৫ বছরেও সরকার বাস্তবায়ন না করায় এবং উল্টো একের পর এক চুক্তি বিরোধী নানা ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই বলে উল্লেক করেন নেতৃবৃন্দ।

কাউন্সিলে সুবর্ণ চাকমাকে সভাপতি ও স্বরেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুরেন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জুরাছড়ি থানা কমিটি গঠন করা হয়।

বাঘাইছড়ির শিজক কলেজে পিসিপি'র উদ্যোগে নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ১৫ মার্চ ২০২৩ রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ির শিজক

কলেজে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) উদ্যোগে আয়োজিত নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

'নবীনের চেতনা হোক অধিকারের প্রত্যয়ে আন্দোলনের অঙ্গীকার' শ্লোগানে পিসিপির বাঘাইছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে শিজক কলেজ মাঠে কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বাঘাইছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সাংসদ উষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমন মারমা, শিজক কলেজের অধ্যক্ষ সুভাষ দত্ত চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা, পিসিপির রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি লক্ষীমালা চাকমা। এতে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি পিয়েল চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক চীবরণ চাকমা।

জুম্ম নারীর উপর চলমান সহিংসতার প্রতিবাদে এইচডাব্লিউএফের বিবৃতি

হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত আদিবাসী জুম্ম নারীর উপর হত্যা, ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা, হয়রানি ইত্যাদি সহিংসতার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও যথাযথ বিচারের দাবিতে এক প্রেস বিবৃতি দেয়।

গত ১৮ মার্চ ২০২৩ হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য উলিসিং মারমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বার্তায় এই নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং দাবির কথা জানানো হয়। প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীদের হত্যা, ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত একের পর এক জুম্ম নারীর উপর সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং ঘটনার যথাযথ বিচার ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করার কারণে বারবার এধরনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান।

রংপুরে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সংহতি সমাবেশ ও গণমিছিল

গত ২০ মার্চ ২০২৩ রংপুরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সম্মিলিত বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের উদ্যোগে বিভাগীয় সংহতি সমাবেশ ও গণমিছিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিকেল ৪টায় সংহতি সমাবেশের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাহার আলী। তাঁরই সভাপতিত্বে এবং জাসদ রংপুর মহানগর কমিটির সভাপতি গৌতম রায়ের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বজলুল রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশ জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য নাজমুল হক প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোবাইদা নাসরিন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাহীন রহমান, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য নজরুল ইসলাম হাক্কানী, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা প্রমুখ।

এছাড়া সমাবেশে রংপুরের প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, আইনজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সমাবেশ শেষে টাউন হল সংলগ্ন শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিরাট সম্মিলিত গণমিছিল বের করা হয় এবং মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এছাড়া সমাবেশ শুরুর আগে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করা হয় এবং মিছিলসমূহ রংপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে সমবেত হয়।

সমাবেশে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য ২ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য দাবিসমূহ নিম্নরূপ:

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. পাহাড়ে সামরিক কর্তৃত্ব ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের স্থায়ী অবসান করতে হবে।
৩. আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক করা এবং স্থানীয় শাসন নিশ্চিত করতে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক এসব পরিষদের যথাযথ ক্ষমতায়ন করতে হবে।
৪. পার্বত্য ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন করে তাদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৫. দেশের মূল স্রোতধারার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য দাবিসমূহ:

১. ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্তরের স্থানীয় সরকার পরিষদে সমতলের আদিবাসীদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণ এবং আদিবাসী জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২. সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।

রামগড়ে জুম্ম ছাত্রীকে ধর্ষণ ও লংগদুতে অপহরণ

খাগড়াছড়ির রামগড়ে এক আদিবাসী ছাত্রী ধর্ষণ এবং রাঙামাটির লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী জুম্ম ছাত্রীকে অপহরণ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা এবং চিহ্নিত অপরাধীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে প্রেস বিবৃতি দিয়েছে হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ)।

গত ৩০ মার্চ ২০২৩ হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য উলিসিং মারমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বার্তায় সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিবৃতিদানের কথা জানানো হয়। বিবৃতিতে অবিলম্বে উক্ত অপহরণ ও ধর্ষণ ঘটনার অপরাধীদের দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা এবং দ্রুত রোডম্যাপ ঘোষণাপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন করার দাবি জানানো হয়।

বাঘাইছড়িতে চুক্তির ২৫ বর্ষপূর্তির সভা অনুষ্ঠিত

রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ২৫ বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ

পর্যালোচনা সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, পার্বত্য চুক্তি কখনও বৃথা যেতে পারে না, আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না।

গত ২৮ এপ্রিল ২০২৩, শুক্রবার সকাল ১০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৫ বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির উদ্যোগে এই বিশেষ পর্যালোচনা সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সুমিতা চাকমার সভাপতিত্বে এবং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সুনীল বিহারী চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাচালং সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ দেওয়ান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঘাইছড়ি উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাগরিকা চাকমা এবং বাঘাইছড়ি উপজেলার ৪ ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যানগণ। এছাড়াও সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি প্রভাত কুমার চাকমাসহ স্থানীয় বাঘাইছড়ি উপজেলার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান, শিক্ষক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

‘মে দিবস’ উপলক্ষে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের চট্টগ্রামে আলোচনা সভা

গত ১ মে ২০২৩ চট্টগ্রামে ব্যারিস্টার কলেজ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে ‘মে দিবস’ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০ টায় ‘শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করে আদিবাসী শ্রমিকের সঙ্গে বৈষম্য দূর করুন’ শ্লোগান নিয়ে শ্রমিক ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি অমর কৃষ্ণ চাকমা সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য ন্যাপ এর চট্টগ্রাম জেলার যুগ্ম সম্পাদক পাহাড়ি ভট্টাচার্য। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ব্যারিস্টার কলেজ শাখার যুগ্ম সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ডি এস তঞ্চঙ্গ্যা, সাংগঠনিক সম্পাদক সন্তোষ বিকাশ চাকমা, আদিবাসী মহিলা ফোরাম এর চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার সভাপতি সোনাবি চাকমা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি পাহাড়ি ভট্টাচার্য মে দিবসের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত আদিবাসী জুম্ম জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মহান ‘মে দিবস’ তখনই সার্থক হবে যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারহারা আদিবাসী জুম্ম জনগণের মুখে হাসি ফুঁটবে।

পিসিপির উদ্যোগে লংগদু গণহত্যার স্মরণে আলোচনা সভা

রাঙামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলায় ৪ মে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় মুসলিম বাঙালি সেটেলারদের কর্তৃক সংঘটিত বর্বরোচিত গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ এবং গণহত্যায় শহীদদের স্মরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) লংগদু থানা শাখার উদ্যোগে শোক র‍্যালি ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৪ মে ২০২৩ সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপির লংগদু থানা শাখার সভাপতি রিকেন চাকমা এবং সভায় সঞ্চালনা করেন সহ সভাপতি সুদীর্ঘ চাকমা।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনি শংকর চাকমা, অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক বিনয় প্রসাদ চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির লংগদু থানা শাখার সভাপতি তপন জ্যোতি চাকমা। এছাড়াও পিসিপির লংগদু থানা শাখার নেতৃবৃন্দ এবং লংগদুর বিভিন্ন এলাকার জনগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পিসিপির লংগদু থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিন্টু মনি চাকমা। শোক প্রস্তাব শেষে শহীদদের স্মরণে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

একই দিনে সকাল ১০ টায় রাঙামাটি সদরে লংগদু গণহত্যার ৩৪ বছর ও শহীদদের স্মরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপির রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন টিকেল চাকমা। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙামাটি জেলা কমিটির সভাপতি অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়া বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক চারুলতা তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মিন্টু চাকমা। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রনেল চাকমা।

আলোচনা সভার শুরুতে লংগদু গণহত্যায় শহীদদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাঙ্গামাটিতে পিসিপির দেওয়াল লিখন মুছে দিয়েছে সেনাবাহিনী

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২৭তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল উপলক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাঙামাটি জেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত দেওয়াল লিখন সেনাবাহিনী কর্তৃক মুছে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

এব্যাপারে পিসিপি'র সূত্র জানায়, আসছে ২০ মে ৩৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাঙামাটির কুমার সুমিত রয় জিমনেসিয়াম মাঠে এক ছাত্র-জনসমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। ছাত্র জনসমাবেশ ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কর্মসূচি উপলক্ষে প্রচার ও জনসংযোগের অংশ হিসেবে রাঙামাটির বিভিন্ন এলাকায় সড়ক সংলগ্ন দেওয়ালে সংগঠনের বিভিন্ন শ্লোগান লেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ লিখিত শ্লোগানগুলো হলো- 'গৌরবময় সংগ্রামের ৩৪ বছর', 'জুম্ম নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত কর', 'প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসকারী তথাকথিত উন্নয়ন বন্ধ কর, করতে হবে', 'চুক্তি মোতাবেক স্থানীয়দের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে' ইত্যাদি।

কিন্তু গত ১৭ মে ২০২৩ ভোররাত আনুমানিক ১২:৩০ টা হতে রাঙামাটির ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৩টি সাঁজোয়া যান নিয়ে সেনাবাহিনীর একটি দল তাদের সঙ্গে কিছু সন্ত্রাসী সদস্য নিয়ে তারা প্রথমে কালিন্দীপুর এলাকায় গিয়ে এবং এরপর শহরের রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের আশেপাশের দেওয়ালে লেখা শ্লোগানগুলো মুছে দেয়। এসময় সেনা সদস্যরা পথচারী ও পার্শ্ববর্তী জেগে থাকা কোনো কোনো লোককে হয় সরে যেতে বা বাড়িতে ঢুকে পড়তে নির্দেশ দেয়। যারা জানালা দিয়ে ঘটনাটা দেখছিল তাদেরও জানালা বন্ধ করতে বলে সেনা সদস্যরা।

একাধিক এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শী, সেনাবাহিনী কর্তৃক এসব দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার কাজকে অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক এবং পিসিপির মতো বহুল পরিচিতি, জনপ্রিয় ও স্বীকৃত একটি ছাত্র সংগঠনের বাক স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন।

রাঙ্গামাটিতে পিসিপির ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২৭তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২০ মে ২০২৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের লড়াকু ছাত্র সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) তার গৌরবময় সংগ্রামের ৩৪ বছর অতিক্রম করে। এ উপলক্ষে সংগঠনটির উদ্যোগে রাঙামাটিতে ২০ মে ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২১ মে ২৭তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে এদিন সকাল ১০ টায় রাঙামাটির জিমনেসিয়াম মাঠে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজ অধিকতর সামিল হউন' শ্লোগান নিয়ে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন ও ছাত্র-জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ও ছাত্র-জনসমাবেশে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি অতুলন দাশ (আলো)। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম

মহিলা সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও আদিবাসী ছাত্র-যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র-জনসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির সভাপতি সুমন মারমা।

পরের দিন ২১ মে ২০২৩ রবিবার, রাঙামাটির সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজ অধিকতর সামিল হউন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামের অগ্রগামী ও জুম্ম ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র প্রগতিশীল ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দিনব্যাপী প্রতিনিধি সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি শ্রী ঊষাতন তালুকদার। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতি সুবীণা চাকমা।

কাউন্সিল অধিবেশনে সংগঠনের সামগ্রিক প্রতিবেদন পাঠ করেন বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা এবং আর্থিক প্রতিবেদন পাঠ করেন অর্থ সম্পাদক মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রী ঊষাতন তালুকদার বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির শত প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও পিসিপি'র প্রত্যেক নেতা কর্মী জুম্ম জনগণের অধিকারের জন্য লড়াই করে চলেছে এটাই আমাদের আশা-ভরসার জায়গা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এমন আচরণ করছে যেন জনসংহতি সমিতি বা পিসিপি নিষিদ্ধ কোনো সংগঠন।'

তিনি আরও বলেন, 'অধিকারের প্রশ্নে আমরা কতটুকু অসহায় তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। বাস্তবতা বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের প্রবীণ নেতারা ছাত্র অবস্থা থেকেই প্রগতিশীলতার সঙ্গে জুম্ম সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। বর্তমান সময়ের ছাত্র সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে।'

কাউন্সিল অধিবেশনে প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষকদের অকুণ্ঠ সমর্থনে নিপন ত্রিপুরাকে সভাপতি, থোয়াইক্য জাই চাককে সাধারণ সম্পাদক এবং সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট ২৭তম কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বিদায়ী কমিটির সংগ্রামী সভাপতি সুমন মারমা।

সন্তু লারমার ভারত গমন নিয়ে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সংবাদে জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) ভারত গমন নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে জনসংহতি সমিতি। গত ১০ মে ২০২৩ জনসংহতি সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার ভারত গমন নিয়ে Banglanews24.com, দৈনিক ইত্তেফাক ও ঢাকা পোস্টের সংবাদ জনসংহতি সমিতির দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বিশেষ করে Banglanews24.com-এ '১৫ দিনের সফরে ভারতে সন্তু লারমা' শীর্ষক সংবাদে '১৫ দিন ভারত সফরে কলকাতা, বিহারসহ আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় যাবেন সন্তু লারমা' বলে উল্লেখ করা হয়। সংবাদে উল্লেখিত 'বিহারসহ আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় যাওয়ার' খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি আরো বলা হয় যে, জনসংহতি সমিতির সভাপতি কলকাতায় কোনো সাংবাদিক বা গণমাধ্যমে কোনো ধরনের বক্তব্য প্রদান করেননি। শ্রী লারমা বরাত দিয়ে প্রকাশিত Banglanews24.com-এর সংবাদ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির ভারত গমন নিয়ে Banglanews24.com কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করায় জনসংহতি সমিতি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে।

বাঘাইছড়িতে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দাবি

রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে সুশীল সমাজের উদ্যোগে এলাকার ভারত প্রত্যাগত জুম্ম (উপজাতীয়) শরণার্থী ও

আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ভারত প্রত্যাগত জুম্ম (উপজাতীয়) শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বাসন দাবি করে এ সংক্রান্ত একটি কমিটিও গঠন করা হয়।

গত ১০ মে ২০২৩ বুধবার বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের মোরঘোনাছড়া নামক জায়গায় এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং 'ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বাসন দাবি বিষয়ক কমিটি, বাঘাইছড়ি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

৩২নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সুনীল বিহারী চাকমার সভাপতিত্বে এবং যুব নেতা মন্টু চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাঘাইছড়ি উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের হেডম্যান, কার্বারি, মেম্বারসহ সুশীল সমাজের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে চুক্তি মোতাবেক ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ সহ অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি জানান।

আলোচনা সভার শেষদিকে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে নিখিল জীবন চাকমাকে আহ্বায়ক এবং সুনীল বিহারী চাকমাকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বাসন দাবি বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ময়মনসিংহে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সমাবেশ ও গণমিছিল

গত ৫ জুন ২০২৩ বিকাল ৩ টার দিকে ময়মনসিংহে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর উদ্যোগে ময়মনসিংহের টাউন হল অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামে ময়মনসিংহ বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে একটি গণমিছিলও অনুষ্ঠিত হয়।

অ্যাডভোকেট এমদাদুল হক মিল্লাত এর সভাপতিত্বে এবং অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংহতি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ জাসদ এর নেতা ডা: মোশতাক হোসেন, বাসদ নেতা কমরেড খালেকুজ্জামান লিপন, জাতীয় শ্রমিক জোট এর সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির নেতা দীপায়ন খীসা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য ইউজিন নকরেক প্রমুখ।

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেছেন, চুক্তির দীর্ঘ ২৫ বছর অতিবাহিত হচ্ছে, আমাদের আর বসে থাকলে হবে না। আমাদের সকলকে এক হয়ে আমাদের দাবির পক্ষে লড়তে হবে। আজ আমাদের একটাই দাবি, এ চুক্তি বাস্তবায়ন করতেই হবে। তিনি বলেন, নিরাপত্তার চশমা দিয়ে দেখে বিচ্ছিন্নতার জিগির তুলে সেখানে সেনাশাসন জিইয়ে রাখা চলবে না।

তিনি আরও বলেন, আজ ময়মনসিংহে বাম প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এক দাবিতে একত্রিত হয়েছে যা আনন্দের। ১৯৭১ এর অপূর্ণতা পূর্ণতা পেয়েছিল এই চুক্তির মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজো তা বাস্তবায়ন হয়নি। এ চুক্তি বাস্তবায়ন সহজ ছিল না। কিন্তু তার ফল আসছে না। জিয়াউর রহমান ক্ষমতার এসে পাহাড়ের সমস্যা সমাধান না করে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেন, যার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। এরশাদ এর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। খালেদ জিয়া জনচাপে উদ্যোগ নিলেও চুক্তি করেননি। শেখ হাসিনার উদ্যোগে চুক্তি হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। সংঘাত জিইয়ে রাখার ফলস্বরূপ আজ সেখানে কুকি-চিন এর আনাগোনা, সেখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে দেশীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী। যা পাহাড়-সমতল সর্বত্র অশান্তির কারণ।

কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদ দিবস পালিত

রাঙ্গামাটিতে কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবসে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রতিবাদ সভায় কল্পনা চাকমা অপহরণের ২৭ বছরপূর্তিতে অপহরণ ঘটনার যথাযথ বিচার, জুম্ম নারীর নিরাপত্তাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ জুন ২০২৩ সকাল ১০ টায় সংগঠনের রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন উলিসিং মারমা এবং সঞ্চালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা।

প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা অ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান বলেন, অপহরণ ঘটনার পরপরই কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমার অভিযোগ স্থানীয় বাঘাইছড়ি থানয় মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হওয়ার প্রায় ১৪ বছর পর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মে ঘটনার বিষয়ে পুলিশের চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হলেও সেই রিপোর্টে অভিযুক্ত ও প্রকৃত দোষীদের সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এতে স্পষ্ট দেখা যায়, রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নাজুক, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য শুভ নয়। এতে দোষীরা আরো এহেন হীন কর্মকাণ্ড করতে উৎসাহ পাবে।

অপরদিকে গত ১২ জনু ২০২৩ বিকাল ৩ টায় ঢাকায় শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে আদিবাসী নারী, ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ন্যায়বিচারের দাবিতে এক সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কল্পনা চাকমা অপহরণের দীর্ঘ ২৭ বছর পার হলেও ঘটনার ন্যায্য বিচার না পাওয়ায় সংহতি সমাবেশের নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এদিকে গত ১৩ জুন ২০২৩ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম নগরের চেরাগী মোড়ে পাহাড়ের নেত্রী ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রকাশসহ চিহ্নিত অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস গং-এর বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে যোগদান

আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২২তম অধিবেশন গত ১৭-২৮ এপ্রিল ২০২৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রীতিবিন্দু চাকমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করছেন। জনসংহতি সমিতির অন্য দুইজন সদস্য হলেন অগাষ্টিনা চাকমা ও চঞ্চনা চাকমা। এছাড়া কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা, জাতিসংঘের এমরিপের সদস্য বিনতাময় ধামাই, এআইপিপি'র প্রতিনিধি হিসেবে সোহেল চন্দ্র হাজং ও চন্দ্রা ত্রিপুরা স্থায়ী ফোরামের ২২তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা, সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই, এনএসআই ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

গত ১৮ এপ্রিল ২০২৩ সকালের অধিবেশনে, জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি প্রীতিবিন্দু চাকমা আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২২তম অধিবেশনে 'আইটেম ৩: অধিবেশনের বিশেষ থিম: আদিবাসী জাতি, মানব স্বাস্থ্য, গ্রহ (প্লানেটারি) ও আঞ্চলিক (টেরিটোরিয়েল) স্বাস্থ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন: একটি অধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতি'-এর উপর তার বক্তব্য প্রদান করেন।

গত ১৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ২২তম অধিবেশনে বিকেলের সভায় এজেন্ডা আইটেম ৫(ডি) আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়র ও আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট মেকানিজম-এর সঙ্গে মানবাধিকার সংলাপকালে এক আলোচনায় জেএসএসের প্রতিনিধি প্রীতিবিন্দু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করার জন্য আদিবাসী অধিকার বিষয়ক স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিয়র এর প্রতি আহ্বান জানান।

চঞ্চনা চাকমা ১৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সকালে ২২তম অধিবেশনে এজেন্ডা 'আইটেম ৫(ফ) আদিবাসী অধিকার বিষয়ক স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিওর ও আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থার সঙ্গে মানবাধিকার সংলাপ'-এর উপর ইন্টারেক্টিভ সংলাপের বক্তব্য প্রদান করেন।

২০ এপ্রিল ২০২৩ সভায় এজেন্ডা 'আইটেম ৪: আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র এবং ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা বিষয়ে স্থায়ী ফোরামের ৬টি অর্পিত দায়িত্বের ক্ষেত্র (অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার) বিষয়ে আলোচনা' এর উপর বক্তব্য প্রদান করার সময় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি চঞ্চনা চাকমা এই আহ্বান জানান।

জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি অগাষ্টিনা চাকমা গত ২৫ এপ্রিল ২০২৩ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২২তম অধিবেশনে বিকেলের সভায় এজেন্ডা 'আইটেম ৪: জাতিসংঘের আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র এবং ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন এজেন্ডা বিষয়ে স্থায়ী ফোরামের ছয়টি এখতিয়ারাধীন ক্ষেত্র (অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার) বিষয়ে আলোচনা' এর উপর বক্তব্য প্রদান করেছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে মিথ্যাচার ও ভুল তথ্য উপস্থাপন করেন।

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org